Family Development Package - Book 3

এই আধুনিক যুগে কিভাবে

সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন করবো

আমির জামান
নাজমা জামান

Family Development Package – Book 3

এই আধুনিক যুগে

কীভাবে সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন করবো?

আমির জামান
নাজমা জামান

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

How to build a happy family life in this modern age.

সম্পাদনা পরিষদ

✍
ড. কায়সার মামুন
শিক্ষামুলক গবেষক
সিংগাপুর

✍
মেরিনা সুলতানা
আরলি চাইল্ডহুড এডুকেটর
ক্যানাডা

✍
আলী আকবর
শিক্ষামুলক গবেষক
আমেরিকা

✍
জাবেদ মুহাম্মাদ
পি.এইচ.ডি গবেষক
ইউনিভার্সিটি অব রেজাইনা, ক্যানাডা

IFD

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

এই আধুনিক যুগে কীভাবে সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন করবো?

Amir Zaman
Nazma Zaman
Toronto, Canada
Email: themessagecanada@gmail.com

© Copyright: IFD Trust

1st Edition: December 2008
2nd Edition: January 2012
3rd Edition: January 2013
4th Edition: December 2015

প্রাপ্তিস্থান

Bangladesh:

IFD Trust	**UZ Sales Centre**	**Taleb Pharma**	**Al-Maruf Publications**	**Kabir Pablishers**
Mohammadpur Dhaka	Dhaka	NurJahanRoad Dhaka	Katabon, Dhaka	Chittagong
01710219310	01712846164	01917216350	029673237	01613061653
01682711206	01675865180	01712177474	01913510991	

Canada:

TIC	**ATN Book Store**	**Proton Book Centre**
Toronto Islamic Centre	Danforth, Toronto	Danforth, Toronto
575 Yonge St. Toronto	416-686-3134	416-388-4250
647-350-4262	416-671-6382	647-346-4250

Other Countries:

New York, USA	**California, USA**	**London, UK**	**Singapore**
917-671-7334	714-821-1829	447424248674	65-938-67588
718-424-9051	714-930-6677		

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা (BDT)
Price: $7 (Seven Dollars)

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ,

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে।" তাই একে অপরকে সতর্ক করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্‌বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই হ'ল সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪) তাই মহান আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশকে পালন করতে গিয়ে এই প্রবাসে মুসলিম পরিবারগুলোকে সচেতন করার লক্ষ্যে আমরা ২০০৭ সালের জানুয়ারী থেকে The Message "দি মেসেজ" নামে একটি কুরআন ও সহীহ্‌ হাদীস ভিত্তিক নন-পলিটিক্যাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছি। এই পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রবাসে মুসলিম পরিবারগুলোকে সঠিক পথ মনে করিয়ে দেয়া। আর এই পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত কিছু ছোট ছোট features নিয়ে এই বইটিকে সাজানো হয়েছে। আশা করি এই বইটি আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে সিংগাপুরে বসবাসরত আমাদের দ্বীনি ভাই সারওয়ার কবীর শামীমের একটি বক্তৃতার মূল বিষয় বস্তু দিয়ে এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় শুরু। এজন্য আমরা তার নিকট কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তার জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধশালী করে দিন। সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ইমেইল অথবা টেলিফোনে জানালে আগামী সংস্করণে তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে সঠিক পথে থাকার তৌফিক দিন। আমীন।

জাযাকআল্লাহু খাইরন,

আমির জামান
নাজমা জামান
টরন্টো, ক্যানাডা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করছি।

সূরা আত-তাহরীমের ৬নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁও।"

আমরা আমাদের বইগুলো প্রকাশ করেছি মূলতঃ আমাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে পারিবারিক উন্নয়নের লক্ষ্যে।

এই ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের বইগুলো প্রকাশ এবং প্রচারে সহযোগীতার জন্য আমরা আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা তাদের সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে দু'আ করি। মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের মেধা, শ্রম ও সকল প্রকার সহযোগীতা কবুল করুন এবং দ্বীন ইসলাম বুঝে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ আমাদের সমস্যা ও সমাধান

আমাদের চাওয়া-পাওয়া	১২
আমাদের সমস্যা	১৩
ভারসাম্যের অভাব	১৪
সমাধান	১৫
উন্নত জীবনের সন্ধানে	১৭
ইবলিস শয়তানকে চেনার চেষ্টা করি	১৯
সংসার সুখের হয় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গুণে	২০
নিজেকে নিজে কিছু প্রশ্ন করি	২৪
জীবনের অসুন্দর পরিণতি	২৭
সমস্যা সমাধানের চেষ্টা	২৮
কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন	২৯
সাবধানতাস্বরূপ কিছু পরামর্শ	৩১
স্বামী-স্ত্রীর জন্য কিছু টিপ্‌স	৩২

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নিজেকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করি

সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন করতে চাইলে আগে নিজের পরিবর্তন প্রয়োজন	৩৫
সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে আত্মসমালোচনা	৩৬
সুখী পরিবার গঠনে কুরআন বুঝা জরুরী	৩৭
শয়তানের পলিসি হতে সাবধানতা অবলম্বন	৩৮
ঘরে ঢুকে স্ত্রী-সন্তানদেরকে সালাম দেই	৪১
দেয়ালে মানুষ বা প্রাণীর ছবি টানালে এবং ঘরে মূর্তি রাখলে শান্তি বিনষ্ট হয়	৪২
ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নারী ও পুরুষের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?	৪২
মু'মিনের জীবনের যে সাতটি গুণ	৪৫
টেনশন ও স্ট্রেস থেকে দূরে থাকা	৪৭
হতাশ হওয়া যাবে না	৪৮
ভুল করলে ভুল স্বীকার করে নেয়া	৪৮
ঘরের কথা বাইরে না বলাই উত্তম	৪৯
স্বামীর বদনাম অন্য ভাবীদের নিকট না করা	৪৯
কোনো মহিলা তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দেয়া নিষেধ	৪৯

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সুখী পরিবার গঠনের উপায়

বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী বাছাই বা নির্বাচন পদ্ধতি	৫২
পাত্রের গুণাবলী	৫২

পাত্রীর গুণাবলী ৫৩
ধর্মপরায়ণা নারী বিয়ে করা ৫৪
বর্তমানের বিয়ের অনুষ্ঠানাদি ও কার্যক্রম অনৈসলামিক ৫৫
বাসর রাতের আদব ৫৬
নারী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ৫৭
মুসলিম নারী হিসেবে আমার করণীয় ৫৮
স্বামীর সাথে সম্পর্ক মজবুত করবো কিভাবে? ৫৯
একজন আদর্শ মা ৬১
সন্তান মানুষ করা নারীর একটি প্রধান কাজ ৬২
স্ত্রীর অধিকার ৬৩
স্ত্রীর সাথে যা করা যাবে না ৬৫
স্বামীর যেসব গুণাবলীর কারণে স্ত্রীরা তাদের ভালোবাসেন ৬৬
যে বিষয়গুলো দাম্পত্য জীবনকে অশান্তিময়, দুর্বল এবং অকার্যকর করে ৬৭
স্বামী-স্ত্রীর একান্ত মুহূর্ত ৬৮
স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের নিকট আকর্ষণীয় করে রাখা ৭৩
স্বামী-স্ত্রীর জিদ্ মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ ৭৪
ক্রোধ বা রাগ জীবনে নিয়ে আসতে পারে বড় ধরণের ক্ষতি ৭৬
অবাধ মেলামেশা অশান্তির সূচনা ৭৮
বেপর্দার লাইসেন্স ও দাইয়ুসী সার্টিফিকেট ৭৯
রূপ-সৌন্দর্য হচ্ছে নারীর মহামূল্যবান সম্পদ ৮১
পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা নিষেধ ৮২
মহিলাদের চাকুরী ৮২
স্বামীর আনুগত্য ৮৪
বন্ধুত্ব করবো কার সাথে? ৮৯
অর্থপূর্ণ পারিবারিক দাওয়াত ৯২
শিরক মুক্ত জীবনযাপন করা ৯৪
অমুসলিমদেরকে বিয়ে করা ৯৬
পর্দার উপকারিতা ৯৭
সমাজ ও দাম্পত্য জীবনে পর্দার গুরুত্ব ৯৮
স্বামীর সামর্থ্যের অতিরিক্ত দাবি ১০০
অভাব ও দারিদ্রতায় স্বামীকে অবমূল্যায়ন করা ১০১
স্বামীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন না করা ১০৩
ছোটখাট জিনিস ধরা ও তর্ক-বিতর্ক করা ১০৩
একে অপরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝি ১০৪
স্বামী স্ত্রী একে অপরের সাথে পরামর্শ না করা ১০৫

নিজের বাবার বাড়ির বড়াই না করা ১০৫
দাম্পত্য সম্পর্কের ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১০৬
চতুর্থ অধ্যায় ঃ আমাদের মৌলিক দুর্বলতা এবং সমাধান
আসুন নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি ১১১
গীবত (পরনিন্দা) এবং বাক সংযমের নির্দেশ ১১২
গীবত (পরনিন্দা) হারাম ১১৩
যে সব কারণে গীবত বৈধ ১১৪
চুগলী করা হারাম ১১৫
দু'মুখোপনার নিন্দাবাদ ১১৬
পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছেদন এবং শত্রুতা পোষণ করার নিষেধাজ্ঞা ১১৭
চুগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি ১১৭
যে সব কারণে গীবত চর্চা হয় ১১৮
কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি-গালাজ করা নিষেধ ১১৯
অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান করা, অপরের অপছন্দ সত্ত্বেও তার কথা কান পেতে শোনা নিষেধ ১২১
কোন মুসলিম ভাই বা বোনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হারাম ১২২
চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা ১২৩
জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজি হারাম ১২৩
শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কারো বংশে খোঁটা দেয়া হারাম ১২৪
'রিয়া' (লোক-প্রদশর্নমূলক কার্যকলাপ) হারাম ১২৪
কাউকে কিছু দান করে তা অন্যের কাছে প্রকাশ বা প্রচার করা নিষেধ ১২৫
গর্ব ও বিদ্রোহাচরণ করা নিষেধ ১২৬
মুনাফিকী স্বভাব মানুষের সৎ আমল নষ্ট করে দেয় ১২৬
কৃত্রিম মর্যাদা প্রদর্শন ও চর্চা থেকে দূরে থাকি ১২৮
"আমি অনেক জানি" এই ভাব না দেখাই ১৩০
দৃষ্টি অনিয়ন্ত্রণের কুফল ১৩১
নেতৃত্বের প্রতি লোভ ১৩২
আমাদের চরিত্রের মান ১৩৪
তাড়াহুড়া না করা ১৩৪
অন্যের দোষ অনুসন্ধান না করা ১৩৫
অন্যের প্রশংসা করা ও আত্মপ্রশংসা না করা ১৩৫
চাকুরী নিয়ে হতাশা? ১৩৬
কেন কিছু লোকের চেহারা কুৎসিত হয়? ১৩৭
লজ্জাশীলতা ও শালীনতা ১৩৯

নিজের অন্তত দশটি দোষ খুঁজে বের করি ১৪১
পঞ্চম অধ্যায় ঃ মানুষের অধিকার আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না
মানুষের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ১৪৩
মাতাপিতার ভরণপোষণ ১৪৪
হঠাৎ করে একজন নারীর জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন ১৪৫
বউ শাশুড়ী সমস্যা ও তার সমাধান ১৪৬
একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৫৩
সন্তানদেরকে সমানভাবে গুরুত্ব দান ১৫৪
একজন ইয়াতীমের দায়িত্ব নেই ১৫৪
বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়া সমস্যা ও সমাধান ১৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল ইনকাম
হালাল ইনকাম কেন ফরয? ১৬০
রিযিক একমাত্র আল্লাহর হাতে? ১৬১
ইনকাম ট্যাক্স সরকারের হক ১৬২
সম্পদের প্রকৃত মালিকানা কে? ১৬৩
পরহেজগারী ১৬৩
কখনও কখনও বৈধ কাজ অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ১৬৪
অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না ১৬৫
অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ জীবনে নিয়ে আসতে পারে অশান্তি ১৬৫
কার জন্য এই এতো কষ্ট? ১৬৬
অবৈধ ইনকামের বিশ্লেষণ ও সমাধান ১৬৬
যে আমলে রিযক বাড়ে ১৬৭
দান-সদাকার গুরুত্ব ১৬৮
অর্থ উপার্জনে সতর্কতা ১৬৯
অর্থ ব্যয়ের কিছু শর্ত ১৭২
সপ্তম অধ্যায় ঃ সুদ বা রিবার উপর কিছু কথা
সুদ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ ১৭৭
সুদ সম্পর্কে রসূল ﷺ এর নির্দেশ ১৭৮
সুদ একটি সুস্পষ্ট কবীরাহ গুনাহ ১৭৯
শয়তানের প্ররোচনা ১৮০
ইসলামিক ব্যাংক এবং নন-ইসলামিক ব্যাংক ১৮১
সেভিংস একাউন্টস ১৮২
ক্রেডিট কার্ড ১৮৩
ফিক্সড ডিপোজিট ১৮৩
স্টক এক্চেঞ্জ এবং শেয়ার মার্কেট ১৮৩

সুদ গ্রহণের কারণ ১৮৪
সুদের ক্ষতিকারক দিক ১৮৫
সবশেষে পরামর্শ ১৮৫
অষ্টম অধ্যায় ঃ ইসলামের সাথে আমাদের সম্পর্ক কতটুকু?
আমাদের ইসলামের জ্ঞান কতটুকু ১৮৮
আমাদের বিপর্যয়ের কারণ ১৯১
দুনিয়ার অনুরাগ মন থেকে দূর করার উপায় ১৯২
হাশরের ময়দানে আমার কী অবস্থা? ১৯২
আমরা কি কবরে প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত আছি? ১৯২
আসুন আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই ১৯৩
ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হই ১৯৪
কোন বিপদে পড়লে কি করবো? ১৯৫
কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেকে নিজে মূল্যায়ণ করি ১৯৭
আল্লাহর কাছে কি কি চাওয়া উচিত? ১৯৯
নবম অধ্যায় ঃ দাওয়াতী কাজ নিয়ে আসতে পারে পরিবারে শান্তি
একজন মু'মিনের দায়িত্ব কী? ২০১
মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা ২০২
দাওয়াতী কাজ করা সকল মুসলিমের জন্য সার্বক্ষণিক ফরয ২০৩
দাওয়াত কাদেরকে দিব? ২০৫
অমুসলিম দেশে থাকতে হলে দাওয়াতী কাজের বিকল্প নেই ২০৭

Appendix 1 ঃ একটি মুসলিম দেশ থেকে একটি অমুসলিম দেশে এসে নতুন করে ইসলাম গ্রহণ ২১৬
Appendix 2 ঃ কিছু বাস্তব চিত্র থেকে শিক্ষাগ্রহণ ২২২
Appendix 3 ঃ উন্নত দেশ থেকে কিছু শিক্ষণীয় ২৩২

প্রথম অধ্যায়

আমাদের সমস্যা ও সমাধান

আমাদের চাওয়া-পাওয়া

আমাদের সকলের চাওয়া-পাওয়া কী? আমাদের জীবনকে সফল করার জন্য যে চারটি অপরিহার্য উপাদান প্রয়োজন তা হলো ঃ

১. উচ্চ শিক্ষা বা Higher education;
২. প্রতিশ্রুতিশীল পেশা বা Promising profession;
৩. সম্পদ অর্জন বা Earn money/wealth
যেমন ঃ বাড়ি, গাড়ি, জমি, ফ্যাক্টরী, ব্যাংক ব্যালেন্স, শাড়ি-গহনা ইত্যাদি;
৪. একটি সম্মান আদায়কারী টাইটেল বা Honorable designation
যেমন ঃ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, ডাক্তার সাহেব, মেজর সাহেব, প্রফেসর সাহেব ইত্যাদি ।

আমরা সকলেই চাই আমাদের সন্তানেরা ভাল স্কুলে পড়বে, ভাল কলেজে পড়বে, ভাল ভাল টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়বে, মাস্টার্স করবে, পিএইচডি করবে, পৃথিবীর ভাল ভাল ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করবে। আমরা নিজেরাও আমাদের নিজেদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে চাকুরী-প্রমোশন, ব্যবসার উন্নতি ইত্যাদির প্রচেষ্টায় রত। আবার ডিগ্রি অর্জনের পর একটি সম্মান আদায়কারী টাইটেলও হচ্ছে। সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে বাড়ি, গাড়ি, এপার্টমেন্ট, জমি, ফ্যক্টরী, ব্যাংক ব্যালেন্স, শাড়ি-গহনা ইত্যাদি হচ্ছে। অতঃপর একটি ভাল, সুন্দর, উচ্চ বংশের ছেলে বা মেয়ে দেখে বিয়ে-শাদীও হচ্ছে। অবশেষে সমাজে প্রতিষ্ঠাও হলো। লোকজন আমাকে বিভিন্ন সম্মানজনক উপাধিতে ডাকছে। মুসলিম-অমুসলিম সকল সমাজের এই একই চিত্র। এই চাওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। এই চাওয়াটা সকল সমাজের একটা

common চাওয়া জীবনে সফলতা আনার জন্যে, জীবনকে সুন্দর করার জন্যে। এখন, এই চারটিই আমরা যারা অর্জন করতে পেরেছি তারা কি জীবনে সুখী? এই চারটি অর্জনের পরও কি আমরা জীবনে সত্যিই সুখী?

আমাদের সমস্যা

এতো কিছু দিয়ে জীবনকে সাজানোর পরও, এতো কিছু পাওয়ার পরও নিম্নের তিনটি জিনিস আমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

১. সর্বক্ষেত্রে অতৃপ্তি বা Dissatisfaction;
২. হতাশা বা Frustration;
৩. মনের বিক্ষিপ্ততা বা Restlessness of mind.

এর একটা সমাধান বের না করলে আমরা যতোই সলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ আর কুরআন তিলাওয়াত করি না কেন, প্রকৃত তৃপ্তি আসবে না। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, যেমন ঃ সলাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে? অর্থাৎ আমরা অনেকেই সলাত আদায় করছি ঠিকই কিন্তু আল্লাহর কথার সাথে ঠিক মিলছে না।

সূরা আনকাবুত-এর ৪৫ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ জোর দিয়ে বলছেন ঃ *"নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপ কার্য হতে বিরত রাখে।"*

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আমাদের সমাজে সলাত আদায়কারীর সংখ্যা বাড়ছে ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী গুণ বাড়ছে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের সংখ্যা। তার মানে, সলাতের প্রকৃত ফল আমরা পাচ্ছি না এবং আমাদের গতানুগতিক সলাত কেনো জানি আল্লাহর দরবারে পৌঁছাচ্ছে না, আর সলাতে আমরা তৃপ্তিও পাচ্ছি না।

এখানে দু'টি দিক। আমাদের জীবনে যা চাওয়ার ছিল তা পেয়েছি এবং সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত সবই করছি বা তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে কপালে দাগ ফেলে দিচ্ছি কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি! কোথায় যেন একটা শূন্যতা! তা হলে এই তৃপ্তির সন্ধানে কী করা যায়? এই অতৃপ্তি আসে কেন? তার সমস্যাগুলো কোথায়? তার কারণগুলো খুঁজে বের করা দরকার।

ভারসাম্যের অভাব

উদাহরণ ১ ঃ বিশেষজ্ঞরা কোন সমস্যার সমাধান কিভাবে করেন? তাঁরা সাধারণতঃ সমস্যাটাকে আলাদা করে কোন ল্যাবরেটরিতে নিয়ে তার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধান বের করেন। যেমন একজন রোগীর হার্টের সমস্যা। ডাক্তার রোগীর হার্টকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাই পাওয়ারের ঔষধ দিয়ে দিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে ঐ রোগীর শরীরে আরো অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। হার্টের চিকিৎসার সময় ডাক্তার রোগীর অন্যান্য শারীরিক সমস্যার কথা চিন্তাও করেননি। যার কারণে হার্টের অপারেশন করার পর তার শরীরের অন্যান্য সমস্যার সাথে কনফ্লিক্ট করে আরো বড় ধরনের সমস্যার ফলে রোগীটি শেষে মারা গিয়েছে। আবার দেখা গেছে জ্বর সারাতে অতিরিক্ত ডোজের এন্টিবায়োটিক সেবনে কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে ডাক্তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করেননি যার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং রোগী মারা গেছে। এক্ষেত্রে ডাক্তার রোগীর আরো যে শারীরিক সমস্যা আছে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেননি, শুধু একটিমাত্র সম্যসার কথা ভেবে চিকিৎসা দিয়েছেন যার কারণে শরীরে side effect হয়ে অর্থাৎ ভারসাম্যহীনতা হয়ে রোগী মারা গেছে।

উদাহরণ ২ ঃ আমাদের দেশে বেশীরভাগ বাবা-মায়েরা সন্তানদের নিয়ে one way চিন্তা করে থাকেন। তারা সন্তানের লেখাপড়ায় এতো বেশী মনোযোগ দেন যে সকালে এক টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়া, বিকালে আরেক টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়া, এই কোচিং, ঐ কোচিং, ভাল স্কুল, ভাল কলেজ ইত্যাদি। যার কারণে একদিকে অত্যধিক মনোযোগ দিতে গিয়ে সন্তানের অন্যদিক অবহেলিত হয়ে যায়। তারা ভুলে যান যে তার সন্তান একজন মানুষ। তার শরীরে আত্মা বলতে একটা জিনিস আছে এবং সেই আত্মারও এক প্রকারের খাদ্যের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রেও বাবা-মা সন্তানের দেহ ও আত্মার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছেন না যার কারণে পরবর্তীতে সন্তানের ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

উদাহরণ ৩ ঃ উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায় যে তারা সকল সমস্যার মূলে অর্থনীতিকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা মনে করে অর্থই সকল সমস্যার সমাধান। তারা মানুষকে একরকম অর্থ কামানোর মেশিনে পরিণত করে ফেলে। মানুষও ঐ একই বিশ্বাসে দিনরাত অর্থের পিছনে দৌঁড়াতে থাকে। সকলেই

একই সাইকেলে ঘুরতে থাকে; অর্থ কামানো আর মাস শেষে বিল পরিশোধ। সে যে একজন মানুষ, তার আত্মার খোরাক চাই তা সে ভুলে যায়। এভাবে তারা আস্তে আস্তে জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে থাকে।

বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র ঃ এবার আমরা বাংলাদেশের একটা চিত্র দেখি। এই ভারসাম্যহীনতা বা balancing-এর অভাবে ২০১০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতে ৫০,০০০ ডিভোর্স এপ্লিকেশন জমা পড়ে আছে এবং এর ৭০% হচ্ছে স্ত্রীর পক্ষ থেকে। এদের বেশীর ভাগই হাই সোসাইটির। মধ্যবিত্ত ও গরিবদের কথা তো বাদই দিলাম।

সবচেয়ে বড় যুলুম ঃ আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুলুম যেটা করছি তা হচ্ছে আমরা ভুলে গেছি যে আমাদের দু'টি জিনিস ঃ

(১) দেহ বা Body
(২) আত্মা বা Soul

এই দু'টি নিয়েই আমাদের গোটা অস্তিত্ব। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দেহের প্রতি এতো বেশী যত্ন নেয়া হয়েছে যে আত্মার দিকে নজরই দেয়া হয়নি। যার কারণে দেহের অত্যধিক যত্ন নিয়ে আধ্যাত্মিকতার চরম অবজ্ঞা করে মন ও আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে।

সমাধান

১. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ সত্য-সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী জীবন ব্যবস্থা এবং বিনা দ্বিধায় একথা মেনে নেয়া।
২. ইসলামের দাবীগুলো মেনে চলা যার মাধ্যমে অন্যান্য দাবী মানা সহজ।
৩. সীমালংঘন ব্যতীত একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন এবং এর অনুসরণ।
৪. দেহ ও রূহের চাহিদা পূরণে ইনসাফের আচরণ।

দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক করার গুরুত্ব

একটি মতবাদ ঠিক করে জীবন পরিচালনা জরুরী। জীবন সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই একে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে। আমার প্রতিটি ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর পরিচালিত হবে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে। আমার পরিবার পরিচালনা, সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি প্রায় সব

কাজেই তার প্রভাব দেখা যাবে। এ ধরনের একটি মত ও পথ ঠিক না করে যে জীবন পরিচালিত করা হয় তা অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে ধরনের জটিলতা সৃষ্টির উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। খাদ্যাভ্যাস, জৈবিক চাহিদা পূরণ, লেনদেন, শিক্ষাগ্রহণ, বিনোদন, কর্মস্থল, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সব বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পেয়ে তারই আলোকে জীবন পরিচালিত করা উচিত। হতাশা, বিড়ম্বনা, ক্ষোভ, অস্থিরতা ইত্যাদির মধ্যেও জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। এবার আমরা জীবন ও জগত সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ ও মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি মতবাদের খোঁজ করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করবো।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ মতবাদ

জীবন ও জগত সম্পর্কে পৃথিবীর যাবতীয় সব মতবাদেই কিছু জিনিস ভালো পাওয়া যায়। এমন কোন বড় মতবাদ পাওয়া যাবে না যার সবটাই খারাপ। কিন্তু আমরা মনে করি সব ভালোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মতবাদ হলো ইসলাম। সবগুলি মতবাদই কোন না কোন সম্প্রদায়ের নামে বা কোন ব্যক্তির নামে পরিচিত। যেমন ঃ খ্রিষ্টান ধর্মের নাম যিশু খ্রিষ্টের নামানুসারে হয়েছে, বৌদ্ধ মতবাদের নাম এসেছে গৌতম বুদ্ধের নামানুসারে, ইহুদী ধর্মের নাম হয়েছে ইহুদী জাতির নামানুসারে, হিন্দু ধর্মের নাম হয়েছে ইন্দুস নদী হতে। কিন্তু ইসলামই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ইসলাম কোন স্থান, নেতা, পন্ডিত, নাবী, রসূল, গুরু, ব্যক্তিত্ব বা দার্শনিকের নাম অনুসারে জন্মলাভ করেনি। এর নামেই ইসলামের মূলমন্ত্র ও অর্থ নিহিত আছে যা একান্তই আদর্শগত। ইসলাম অর্থ নিজের সত্তা ও দেহকে সম্পূর্ণভাবে স্রষ্ঠার পছন্দ অপছন্দের নিকট সমর্পণ করে দেয়া। ইসলামের অন্যতম মূলমন্ত্র হলো ঃ যাবতীয় বিষয়ে ও জীবনের সবক্ষেত্রেই ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

মানুষের কর্ম ও এর দায়-দায়িত্ব

মানুষ এমন একটি প্রাণী যা এক চলমান মেশিনের মত তৎপর। মানুষ কোন না কোন বিষয় নিয়ে চিন্তারত, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর অথবা অন্য কোন মানুষের সাথে বিনিময় বা আদান-প্রদানে ব্যস্ত। মানুষের মধ্যে সর্বদা দু'টি সত্তা কাজ করে। একটি তার মানবীয় সত্তা আরেকটি তার পশু সত্তা। মানবীয় সত্তা দিয়ে মানুষ তার চরিত্রের উৎকৃষ্ট রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় আর পশু সত্তা দিয়ে মানুষ যাবতীয় ক্ষতিকর কাজ করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য

ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে। এ উভয় সত্তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করে মানবীয় গুণাবলীকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য মানুষকে যদি কোন বিশেষ নিয়ম কানুন ও Code of Conduct ঠিক করে না দেয়া হয় তা হলে পশু সত্তা তার মানবীয় সত্তার উপর জয়ী হয়ে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। পশু সত্তার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

মানুষের কর্ম ও তার দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছে। এটি একটি বাস্তব ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক ঠিক হয়ে যায়। কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াতে এ বিষয়টির সুস্পষ্ট ফায়সালা রয়েছে ঃ

কোন [পাপের] বোঝা বহনকারী অন্য কোন লোকের [পাপের] বোঝা বহন করবে না। মানুষের জন্য তা-ই যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। তার প্রচেষ্টা খুব শীঘ্রই দেখা যাবে। (সূরা নাজম ঃ ৩৮-৪০)।

ইসলাম যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান অর্থাৎ 'সাওয়া আস্‌সাবিল'এই কথাটা কুরআনে ৬ জায়গায় এসেছে। এখন এই জীবনবিধানটা কিভাবে মানলে আমরা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবো এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনটা খুব সহজ হবে তার একটা approach কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখবো, ইনশাআল্লাহ।

Approach

- ১ নম্বর কাজ ঃ সংঘবদ্ধভাবে ইসলামী জীবনযাপন করা।
- ২ নম্বর কাজ ঃ ইসলামের উপর নিয়মিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা।
- ৩ নম্বর কাজ ঃ নিয়মিত ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা।
- ৪ নম্বর কাজ ঃ হালাল ইনকাম থেকে নিয়মিত সদাকা করা।

উন্নত জীবনের সন্ধানে

প্রতিদিন প্রতি বছর মানুষ নানা দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে সুখের সন্ধানে, নতুন জীবনের সন্ধানে। আসলে কি সবাই প্রকৃত অর্থে উন্নত জীবনের সন্ধান পাচ্ছেন? অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের জানা প্রয়োজন এই উন্নত জীবনের সংজ্ঞা কী? উন্নত জীবন মানে কি উন্নত দেশে বসবাস করা, উন্নত ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, উন্নত

ব্যাংকিং সিস্টেম, উন্নত টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম, উন্নত শপিং সিস্টেম, উন্নত বিজনেস সিস্টেম, উন্নত এডুকেশন সিস্টেম ইত্যাদি? নাকি সেইসাথে টাকা ইনকাম, আলিশান বাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি, সন্তানদের ভাল ইউনিভার্সিটি, নিজেদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি? নাকি জীবনে এর বাইরেও আরো কিছু রয়েছে? আসলে এগুলো চাওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। তবে আমাদের মনে হয়, আমরা আমাদের জীবনকে উন্নত করার জন্য one-way চিন্তা করছি। বস্তুত উন্নত জীবনের জন্য উপরের এসব চাহিদা ছাড়াও আরো কিছু রয়েছে যার অভাবে উন্নত জীবনের সন্ধান পেয়েও কারো কারোর ব্যক্তিগত জীবনে এবং পারিবারিক জীবনে ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এই ভারসাম্যহীনতার কারণে জীবনের একদিকের চাহিদা পূরণ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে সংসারে প্রকৃত সুখ আসছে না বা পূর্বে যতটুকু ছিল তা দিন-দিন অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

যেসব পরিবার তাদের জীবনের শুরুতে খুব সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করছিলেন কিন্তু কিভাবে যেন আস্তে আস্তে তাদের অনেকের পরিবারেই আজ নেমে এসেছে অশান্তির ছায়া। স্বামী একদিকে, স্ত্রী আরেক দিকে এবং সন্তানরা দিশেহারা। কেউ কারো কথা শুনছে না, যে যার মতো চলছে। অনেক ছেলেমেয়েরাই আবার পিতা-মাতার কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে যেখানে সন্তানদেরকে সঠিকভঅবে শাসন না করার কারণে সন্তান খারাপ দিকে চলে গেছে। আবার স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা না হওয়াতে স্বামী-স্ত্রীতে ঘটেছে বিচ্ছেদ এবং সন্তানেরা হচ্ছে অবহেলিত, আর মাঝখান থেকে লাভবান হচ্ছে আইন ব্যবসায়ী বা পুলিশ। কী করুণ পরিণতি!

আমরা টরন্টো ইসলামিক সেন্টারের মাধ্যমে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াতী কাজ ও আল-কুরআনের গবেষণা করে থাকি। এই সেন্টারটি কমিউনিটি সার্ভিসের অংশ হিসেবে মুসলিম ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশন এবং ফ্যামিলি কাউন্সেলিংও করে থাকে। আমরা ফ্যামিলি কাউন্সেলিং-এর অংশ হিসেবে মাঝে মাঝে কিছু ফোন কল পেয়ে থাকি যা সাধারণতঃ মহিলারাই বেশী করে থাকেন। তাদের কলের মূল বিষয় হচ্ছে divorce solution অর্থাৎ অনেক মুসলিম মহিলাই divorce-এর জন্য আমাদের পরামর্শ চান। কী দুঃখের বিষয়! আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে আমরা সুদূর আমেরিকা-ক্যানাডা এসেছি সুখের সন্ধানে। কিন্তু কিসের অভাবে আজ সেই সুখের পরিবারটির মধ্যে নেমে আসছে দুঃখের ছায়া! কেনইবা স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যাচ্ছেন? কেনইবা সন্তান

ভাগাভাগি নিয়ে হাজির হতে হচ্ছে কোর্টে? দীর্ঘ দিনের সংসার যাচ্ছে ভেঙ্গে! বিদেশ আর দেশ বলে কোন কথা নয়, সব জায়গাতেই একই ঘটনা আর ঘটনার পিছনে একই কারণ।

খুব গভীরভাবে চিন্তা করি, কোথায় এর সমাধান? আসলে এর সমাধান দিতে পারে একমাত্র আল কুরআন। আমরা প্রতিদিন সলাতে সূরা ফাতিহার মধ্যে বলছি 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে সহজ-সরল সঠিক পথ দেখাও'। আর সলাতের পরে আমি চলছি অন্য পথে। অর্থাৎ নিজের মনমতো মনগড়া পথে। আর এটিই হচ্ছে মূল সমস্যা। কেননা আল কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। আল কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলই হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্যে। আল কুরআনে সকল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে। তাই কুরআনের অর্থসহ তাফসীর পড়ি এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে এবং নিজ পরিবারকে গাইড করার চেষ্টা করি। ইসলামিক মাইন্ডেড লোকদের সাথে উঠাবসা করি; সম্পর্ক রক্ষা করে জীবনযাপন করতে চেষ্টা করি। ইনশাআল্লাহ দেখবো পরিবারে পারিবারিক শান্তির ধারা অব্যাহত রয়েছে। মহান স্রষ্টা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন, আমীন।

ইবলিস শয়তানকে চেনার চেষ্টা করি

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসের সারমর্ম এমন যে ইবলিস শয়তানদের মধ্যেও জবাবদিহিতা বা accountability হয়। ইবলিসের দল সারা দিন যত কাজ করে দিন শেষে তা তাদের লীডারের কাছে রিপোর্ট দিতে হয়। এক এক করে সবাই যে যা খারাপ কাজ করেছে লীডারের কাছে তার বর্ণনা দিতে থাকে এবং লীডার মোটামুটি বা কোন রকম সন্তষ্ট হয়। যখন কোন শয়তান রিপোর্টে বলে যে সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে তখন লীডার সবচেয়ে বেশী খুশি হয় এবং যে শয়তান এই কাজ ঘটিয়েছে তাকে পুরষ্কার দেয়া হয়। শয়তান সবার পেছনে ২৪ ঘণ্টা লেগে আছে। সে আপ্রাণ চেষ্টায় থাকে কিভাবে কোন সংসার ভেঙ্গে দেয়া যায়। আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর তালাককে হালাল করেছেন ঠিকই কিন্তু এই বিষয়টি আল্লাহ অপছন্দ করেন। সূরা আল আ'রাফ-এর ১৭ নম্বর আয়াতে শয়তান open declaration দিয়ে বলেছে ঃ

"আমি মানবজাতির ডান দিক দিয়ে আসব, বাম দিক দিয়ে আসব, সামনের দিক দিয়ে আসব, পেছন দিক দিয়ে আসব"।

অর্থাৎ সে সর্বপ্রকারে মানুষের ক্ষতি সাধন করতে বদ্ধপরিকর। একথা আমাদের মোটেই অজানা নয়। সুতরাং সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ইবলিসের পাতা ফাঁদে পড়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই।

সংসার সুখের হয় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গুণে

"সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে"– এটা একটি অতি-প্রাচীন বাংলা প্রবাদ। এই প্রবাদের আক্ষরিক অর্থে সংসারে পুরুষের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ নারীর ভূমিকা মুখ্য অর্থাৎ সব দায়দায়িত্ব নারীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা মোটেও ঠিক নয়। আসলে সংসারে সুখ আনার জন্য শুধু রমনী নয় শুধু পুরুষ নয় তাদের (স্বামী-স্ত্রী) দু'জনেরই ভূমিকা রয়েছে। এখানে কারো চেয়ে কারো ভূমিকা কম নয়। তবে গোড়াতেই স্বীকার করে নিতে হবে যে মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখ দু'টি আপেক্ষিক এবং দৃষ্টিভংগিজনিত ব্যাপার। তাই একজন যাতে সুখী অন্যজন তাতে সুখী না-ও হতে পারে। অন্যদিকে একজন যেটাকে দুঃখজনক বলে মন খারাপ করে বসে থাকে অন্যজন সেটাকে কিছুই মনে করেন না। বিষয়টার একটা তৃতীয় দিকও রয়েছে, আর সেটা হলো নারী ও পুরুষের মানসিক গঠন– কেউ স্বভাবতঃই আশাবাদী (optimistic), আবার কেউ স্বভাবতঃই নিরাশাবাদী (pessimistic)। বিবাহিত জীবনে সুখ অথবা দুঃখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে উপরোক্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীতে ভালোবাসার চাষ করা, একে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতিযোগিতা নয়। মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে সংসার জীবনে শুরু থেকেই ইসলামী শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে দু'জনকেই। কুরআন, হাদীস এবং রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনী পাঠ করলে আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার উপযোগী সব উপকরণই হাতের কাছে পাওয়া যাবে, অপেক্ষা শুধু যথাসময়ে সেগুলোর সদ্ব্যবহার। স্বামীকে মনে রাখতে হবে যে পরিবারের কর্তা হিসেবে স্ত্রীর উপর তার অধিক মর্যাদা যেমন আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, পাশাপাশি তেমনি ভারী দায়িত্বও দিয়েছেন যা অবহেলা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, সংসারেও অশান্তি দেখা দেবে যার ফলে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সুখী পরিবার গড়ে তোলার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ -এর প্রদর্শিত ইসলামী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। অন্য যে কোন model-ই কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হোক না কেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য কারণ সেসব model-এ ইসলামী ঈমান ও আকীদা, পবিত্রতা ও ভারসাম্যের অভাব। মুসলিম স্বামী-স্ত্রীকে সদাসর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুনিয়াদারী দ্বীনদারীরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই বিবাহিত জীবনের সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর ইবাদতের আওতায় পড়ে এবং ইবাদত তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার-ই জন্যে যাতে আখিরাতে পুরষ্কার লাভ করা যায়।

এবার মানবিক ও মানসিক দিকগুলো পর্যালোচনা করা যাক। স্বামী ও স্ত্রী দু'জন মানুষ, তাদের মানবিক চাহিদা আছে এবং সেটা নিয়মিত মিটাতে হবে। একে অন্যকে অকপট ভালোবাসা দিতে হবে, মনোরঞ্জণকারী কথায়, কাজে ও ব্যবহারে, উপহার দেয়া-নেয়ার বাস্তব উদাহরণ দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে।

সংসারের জন্যে উপার্জন প্রধানত স্বামীর দায়িত্ব কিন্তু সংসার চালানোর দায়িত্বটা প্রধানত স্ত্রীর উপর বর্তায়, তবে সেটা হবে দু'জনে পরামর্শ করে। রান্না ঘর, ঘরবাড়ি গোছানো, অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্বটা স্ত্রী নেবেন, কিন্তু স্বামীর সাহায্য-সহযোগিতা স্ত্রী প্রত্যাশা করবেন। সন্তান পালনের দায়িত্বটা মা হিসেবে স্ত্রী অবশ্যই নেবেন, কিন্তু আনুসংগিক সাহায্য-সহযোগিতা স্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্ত্রীকে দেবেন।

স্ত্রীর মেজাজ-মরজিটা, সময় বিশেষের প্রয়োজনটা যেমন monthly menstrual cycle, childbirth জনিত সাময়িক শারীরিক অসুস্থতা ও moodswing ইত্যাদির গুরুত্ব স্বামীকে সহৃদয়তার সংগে বুঝতে হবে এবং স্ত্রীর সংগে cooperate করতে হবে। অবিবেচক হলে চলবে না, তখন স্ত্রীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা হারাতে হবে। স্ত্রীর সাময়িক অপারগতায় সন্তানদের দেখাশোনার ভার স্বামীকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে। এতে বাবার সংগে সন্তানদের হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ়তর হবে, স্ত্রী-ও আনন্দিত হবেন।

যৌথ পরিবারে নূতন পরিবেশে স্ত্রীকে খাপ খাইয়ে নিতে স্বামীর সহযোগিতা অতি প্রয়োজন। পারিবারিক কোন্দল থেকেও স্ত্রীকে বাঁচাতে হবে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনলেই স্ত্রীকে দায়ী না ভেবে প্রকৃত বিষয়টা অনুসন্ধান করে তবে যথাযথ action নিতে হবে।

লোকসমক্ষে স্ত্রীকে কিছুতেই চেঁচামেটি করে অপদস্ত-অপমানিত করা চলবে না। পরিবারে বহুক্ষেত্রেই কানকথা বলে জটিলতার সৃষ্টি করে, স্ত্রীকে সেই ধরণের যন্ত্রণা ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হবে।

স্বামীর কর্মক্ষেত্র ঘরের বাইরে যেখানে অন্য পরিবেশ, সেখানে অন্য নারীরাও কাজ করে, হয়ত সেখানে পার্টিতে ড্রিংকস সার্ভ করা হয়, নারীপুরুষের মিলিত নাচগান হয়। সেই পরিবেশের খবর পেলেই স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করে তাকে প্রশ্নজর্জরিত করা স্ত্রীর পক্ষে খুবই একটা অনুচিৎ ব্যবহার হবে। তবে যদি সত্যি কোন involvement-এর খবর বিশ্বস্তসূত্রে স্ত্রীর কানে এসে পৌঁছে তখন অবশ্যই সরাসরি প্রশ্ন করে সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করাটা অন্যায় হবে না। বাইরের লোকের কাছে বলে চোখের পানি ফেলাতে কোন লাভ হবে না। ঠিক তেমনি স্ত্রীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু শুনলেই রেগে আগুন হওয়া, তার সংগে দুর্ব্যবহার করাটাও একটা মারাত্বক ভুল। একে অন্যের বিরুদ্ধে অহেতুক সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই ঠান্ডা মাথায়, সবদিক বিচার-বিবেচনা করে স্বামী-স্ত্রীকে এগুতে হবে। মনে রাখতে হবে এজগতে কিছু দুষ্ট লোকের কাজই হচ্ছে মিথ্যা রটনার সৃষ্টি করে মানুষের ঘর ভাংগানো। Never wash your dirty linen in public. ঘরের গোপন কথা বাইরের লোককে জানার সুযোগই দেয়া যাবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভাংগন সৃষ্টির বড় একটি কারণ হচ্ছে breakdown in communication অর্থাৎ সামান্য কথা কাটাকাটি হলেই, অথবা একে অন্যের বিরুদ্ধে আপত্তিকর একটা কিছু শুনলেই যাচাই না করেই অপর পক্ষকে সরাসরি প্রশ্ন না করে কথা বলা বন্ধ করে দেয়া। মনে রাখতে হবে এতে ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে থাকে, যা এক পর্যায়ে এসে জমাটবদ্ধ হয়ে point of no return-এ পৌঁছে দেয়। ফিরে তাকাবার মনোবৃত্তি তখন একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। আর তৃতীয় পক্ষের উস্কানি পেলে তো আর কথাই নেই। তখন তালাক পর্যন্ত পৌঁছতে আর দেরী হয় না। দুই পক্ষকেই তাই line of communication-টা open রাখার চেষ্টা করতে হবে। এক পক্ষকে একটু নতি স্বীকার করে হলেও, কারণ বিচ্ছেদে নয় মিলনেই সুখ। একে অন্যকে বিশ্বাসের মাঝেই সুখশান্তি নিহিত, অবিশ্বাসে বা সন্দেহের মাঝে নয়। মামলা-মোকদ্দমা করে lawyer-কে মোটা ফী দিয়ে নিজেরা ফতুর হওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

একে অন্যকে ক্ষমা করতে শিখতে হবে, উদারতা দেখাতে হবে এবং কৃপণতা ত্যাগ করতে হবে। কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখতে হবে, রাগে/মেজাজে

লাগাম পড়াতে হবে ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কৃপণতা ত্যাগ করতে জানতে হবে। একে অন্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। স্ত্রী একজন নারী বলে তাকে কিছুতেই হেয় বা নীচ নজরে দেখা উচিৎ নয়। এটা অমানবিক ব্যবহার।

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর একে অন্যের রূপের ও গুণের ত্রুটি অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যে বিষয় বা প্রসংগ অন্যজনকে বিরক্ত করে বা কষ্ট দেয়, সেই প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করা বর্জন করতে হবে। সদাসর্বদা স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা সংসারে অশান্তি ও ভাংগনের সৃষ্টি করে। একথাটা মনে রাখতে হবে।

সংসার জীবনটা একটা বোঝা, বেশ monotonous (একঘেয়ে)। এর বাইরে মাঝেমাঝে যাওয়া দরকার fresh air-এর জন্যে, একে অন্যকে একান্তভাবে পাশে পাওয়ার জন্যে, দু'জনে মিলে একান্তে কিছু fun activities-এর মাধ্যমে দু'জনের মাঝে ভালোবাসাটাকে renew করার জন্যে। স্বামীকে এ বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে।

অপর যে বিষয়টি গুরুত্ব রাখে সেটা হলো শান্তির জন্যে স্বার্থত্যাগ (sacrifice) করা শিখতে হবে। ঘরের বাইরে গেলে ফোন করে স্ত্রীর সংগে যোগাযোগ বজায় রাখাটা খুবই প্রয়োজন। অন্যদিকে স্ত্রী ফোন করলে বিরক্ত না হয়ে তার প্রয়োজনের কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তার প্রয়োজনটা মিটানো দু'জনের মাঝে সুসম্পর্কটা বজায় রাখতে খুবই সহায়ক। প্রয়োজন না থাকলে স্ত্রী এবং সন্তানদের ঘরে রেখে দীর্ঘক্ষণ ধরে বাইরে বন্ধুদের সংগে আড্ডা দেয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। এটা দায়িত্ব এড়ানোর লক্ষণ।

সংসারের কাজ স্ত্রীর সংগে share করাটা অতি জরুরী। Sharing করলে সব কাজ অতি সহজে সমাধা হয়, কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় না। স্ত্রীর legitimate চাহিদা অবশ্যই সময়মত পূরণ করতে হবে। অন্যদিকে স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে স্ত্রীকে অবশ্যই যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে যাতে স্বামীর মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হতে না পারে যে স্ত্রী তাকে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করছেন। স্বামী যেমন স্ত্রীর বিশ্বাসের ও নির্ভরশীলতার commitment চান স্ত্রীও তদ্রূপ স্বামী তার প্রতি committed and sincere সেই আশ্বাস পেতে চান, প্রমাণও পেতে চান। মনে রাখতে হবে, স্বামী ও স্ত্রীকে হতে হবে একে অন্যের বেস্টফ্রেন্ড যেখানে মিথ্যার বা ছলনার ছায়া মাত্রও থাকবে না।

স্বামীর যদি কোন অপচয়মূলক স্বভাব থেকে থাকে, যেমন সিগারেট খাওয়া, জুয়া খেলা, লটারী খেলা, মদ খাওয়া, ক্লাবে যাওয়া ইত্যাদি সেগুলো অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এতে সংসারে সচ্ছলতা বাড়বে, অশান্তি দূর হবে, স্ত্রী খুশী হবেন, সন্তানেরা তাদের বাবাকে একজন উত্তম মানুষ পেয়ে তারই আদর্শে গড়ে উঠবে। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা মিলে বাইরে ঘুরে বেড়ানোটাও সংসার জীবনে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সহায়ক। সন্তানদের লেখাপড়া কি হচ্ছে সেই বিষয়েও বাবাকে সদাসতর্ক থাকতে হবে, সব ভার মায়ের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। সন্তানদের বুঝতে দিতে হবে যে তাদের মাথার উপর একজন গার্জিয়ান আছেন। এতে ওদের চরিত্রগঠন সুন্দর হবে।

কোন বিষয়ে ঠোকাঠুকি লাগলে conflict resolution-এর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে প্রথমতঃ নিজেদের মাঝে, না হলে পারিবারিকভাবে, সফল না হলে যোগ্য কোন family counselor-এর সাহায্য নিতে হবে। যে কোন মূল্যে সংসারটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে, শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

খৃষ্টানদের মাঝে একটা চমৎকার কথা চালু আছে যা অতি প্রশংসনীয় ঃ The family that prays together stays together. মুসলিম পরিবারেও এই একই নীতি চমৎকার ফলপ্রসূ হতে পারে। বাসায় স্বামী ইমাম হয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে নিয়মিত সলাত আদায় করা একটা অতি উৎকৃষ্ট পন্থা। শুক্রবার দিনে সম্ভব হলে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে মসজিদে জুমার সলাতে যাওয়াও প্রশংসনীয় কাজ। এছাড়া রমাদান মাসে সপরিবারে একসাথে ইফতার করা ও তারাবী পড়া খুবই আনন্দের ব্যাপার। দুই ঈদে সপরিবারে সবচেয়ে বড় ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করা, ছুটির দিনে সবাই মিলে ইসলামিক ভিডিও দেখার অভ্যাস করাটাও staying together-এর বিষয়ে সাহায্য করবে। এমন একটা পরিবার আল্লাহর রহমত লাভ করবে এবং তারা সুখে ও শান্তিতে বাস করবে, ইনশাআল্লাহ। আমীন।

নিজেকে নিজে কিছু প্রশ্ন করি

১. আমি কি অবৈধ ইনকামের সাথে জড়িত?
২. আমি কি অলস জীবনযাপন করি?
৩. আমার কি মিথ্যে বলার অভ্যাস আছে?
৪. আমি কি গোপন কথা চেপে রাখতে পারি না?

৫. আমার কি ধৈর্য বা সহ্য ক্ষমতা কমে গেছে?
৬. আমার কি রাগ খুব বেশী?
৭. আমি কি আমার রাগ কন্ট্রোল করতে পারি না?
৮. আমি কি ঝাজালো সুরে কথা বলি?
৯. আমি রেগে গেলে কি আমার হুস থাকে না?
১০. আমার কি অন্যের ভাল দেখলে হিংসা লাগে?
১১. আমার কি অন্যের গীবত করার অভ্যাস আছে?
১২. আমার কি সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত লোভ আছে?
১৩. আমি কি অনেক সময় লোভ সামলাতে পারি না?
১৪. আমি কি অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া করি?
১৫. আমি কি অপচয় করি?
১৬. আমি কি আমার ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাই?
১৭. আমি কি পারিবারিক অশান্তিতে ভুগছি?
১৮. আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি বনিবনা হচ্ছে না?
১৯. আমাদের মধ্যে কি সারাক্ষণ খিটমিট লেগেই থাকে?
২০. আমি কি আমার স্বামীকে সন্দেহ করি?
২১. আমার স্বামীর কি কোন বাজে অভ্যাস আছে?
২২. আমার স্বামী কি আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে?
২৩. আমার স্বামী কি আমাকে নির্যাতন করে?
২৪. আমার স্বামী কি আমাকে আন্ডারএস্টিমেট করে?
২৫. শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কি আমাকে মানসিক চাপে রাখে?
২৬. আমাদের মধ্যে কি ভালোবাসা কমে গেছে?
২৭. আমাদের মধ্যে কি আকর্ষণ কমে গেছে?
২৮. আমার স্ত্রী কি আমাকে রেসপেক্ট করে না?
২৯. আমার স্ত্রী কি অন্য লোকের প্রতি আসক্ত?
৩০. আমি কি শ্বশুর-শাশুড়ীকে অপছন্দ করি?
৩১. আমি কি তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি?
৩২. আমার কি এখন আর স্ত্রীকে ভাল লাগে না?
৩৩. আমার কি এখন আর স্বামীকে ভাল লাগে না?
৩৪. আমরা কি মাঝে মধ্যেই আলাদা বিছানায় ঘুমাই?
৩৫. আমরা কি একসাথে বসে একই টেবিলে আহার করি না?
৩৬. আমরা কি মাঝে মধ্যেই একে অপরের সাথে কথা বলা বন্ধ রাখি?

৩৭. আমি কি চাকরি বা ব্যবসা নিয়ে হতাশ?
৩৮. আমি কি ফ্যামিলি নিয়ে সমস্যাগ্রস্ত?
৩৯. আমি কি সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছি?
৪০. আমার কি বাবা-মাকে লুকিয়ে টাকা দিতে হয়?
৪১. আমরা স্বামী-স্ত্রী কি আলাদা আলাদা ব্যাংক একাউন্ট মেনটেন করি?
৪২. আমি কি আমার সন্তানদেরকে যথেষ্ঠ সময় দেই?
৪৩. আমি কি সন্তানদের গায়ে হাত তুলি?
৪৪. আমি কি আজেবাজে ভাষায় গালিগালাজ করি?
৪৫. আমি কি অন্যের কান কথা শুনে স্বামীকে দূরে ঠেলে দেই?
৪৬. আমি কি অন্যের কান কথা শুনে স্ত্রীকে দূরে ঠেলে দেই?
৪৭. আমি কি অন্যের বুদ্ধিতে চলি নাকি নিজের বুদ্ধিও খাটানোর চেষ্টা করি?
৪৮. আমি আমার সন্তানকে নিয়ে কি শুধু একপেশি (one way) চিন্তা করি?
৪৯. আমার সন্তানকে কি আমি ইসলামী পরিবেশে বড় করতে চাই?
৫০. আমি কি চাই আমার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক (প্রফেশনাল) হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?
৫১. আমি কি আমার স্বামীর কথাকে কম গুরুত্ব দেই?
৫২. আমি কি আমার স্ত্রীর কথাকে কম গুরুত্ব দেই?
৫৩. যে কোন কাজ আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে পরামর্শের ভিত্তিতে কি করি?
৫৪. আমরা স্বামী-স্ত্রী কি সবসময় দু'জনের ভাল দু'জনে চাই?
৫৫. আমরা স্বামী-স্ত্রী কি একে অপরকে সবচেয়ে বড় বন্ধু ভাবি?
৫৬. অন্যেরা যা করে বাছবিচার না করে আমিও কি তাই করার চেষ্টা করি?
৫৭. আমার স্বামীর বদনাম অন্য কেউ আমার কাছে এসে করলে আমি কি তাকে প্রশ্রয় দেই বা ভাল বোধ করি?
৫৮. আমরা স্বামী-স্ত্রী কি আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেই?
৫৯. আমার কি ইবাদতে অনিহা আছে? ইবাদতে কি আলসেমি লাগে?
৬০. আমার কি ইবাদতে মন বসে না? ইবাদতে কি তৃপ্তি পাই না?

প্রায় প্রতিটি পরিবারেই এই সমস্যাগুলো কমবেশী দেখা যায়। অনেক পরিবারই আবার সমস্যা কোথায় তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অনেকের কাছে এই সমস্যাগুলো দেখতে ছোট হতে পারে বা কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কিন্তু এই সমস্যাগুলোই একসময় পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং পরে তা সংসারে ভাঙ্গনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জোর করে কারো উপর কিছু চাপিয়ে দিয়ে কোন সমস্যার সঠিক সমাধান করা যায় না, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। গাছের

আগায় পানি না ঢেলে গোড়ায় ঢালতে হয়, তাতে ফল ভাল হয়। সব কিছুর মূলে হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি, তাই প্রতিদিন এই তাকওয়া অর্জন করতে হবে এবং সেই সাথে ঈমানকে মজবুত করতে হবে।

আমরা বেশীর ভাগ মুসলিমরাই আংশিক বা ভুল ঈমান নিয়ে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করছি, ঈমান সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। আমার ঈমান যখন মজবুত হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে এই দুনিয়ার সকল কঠিন কাজই আমার নিকট অতি সহজ হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে যে যদি আমি ইসলামী পরিবার গঠন করতে চাই, তাহলে সকল সমস্যার গোড়া হলো মজবুত ঈমানের অভাব, আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসার অভাব। যার ভেতর ঈমানের আলো যত বেশী, যিনি আল্লাহকে যত বেশী ভয় পান, তিনি তত পরিপূর্ণ মানব বা মানবী। সুতরাং একজন ব্যক্তি যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে আল্লাহর হুকুমগুলি সে শোনা মাত্রই মানার চেষ্টা করবে। তাকে খুব বেশী তাগাদা দেয়ার প্রয়োজন নেই। এভাবে আস্তে আস্তে আমরা সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবো ইন্‌শাআল্লাহ।

জীবনের অসুন্দর পরিণতি

জীবনে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় রত বহু ভাইবোন প্রাচুর্য আনতে সক্ষম হয়েছেন। যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে পরিবারগুলি বহুক্ষেত্রে নিজেদের জীবনকে এলোমেলো করে ফেলেন। কোন সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনার অভাবে এসব পরিবারের সন্তানগণ একেবারে পাল্টে যেতে পারেন না, আবার নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদি ধরে রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ফলে এ পরিবারগুলো খুব শীঘ্রই হতাশা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এক দুর্যোগের সম্মুখীন হন। আর এর পরিণতি হয় আরো করুণ। পিতামাতারা সন্তানদের আচরণে দারুণ ব্যথা পান। আফসোস করে বলেন, যাদের কল্যাণের জন্য এতো কিছু করলাম তারা আমাদের মুখে চুনকালি মেখে দিল।

কোন কোন দুর্ভাগা পরিবারের সন্তানরা নিজেদের জগাখিচুড়ি মার্কা সংস্কৃতি পালন করতে গিয়ে পিতামাতার পক্ষ হতে বাঁধার সম্মুখীন হন। এতে নতুন সংস্কৃতির ধারক এই তথাকথিত আধুনিক সন্তানেরা অস্বস্তি অনুভব করে। দেশের বর্তমান লাগামহীন স্বাধীনতার উম্মাদনা এসব সন্তানদের মাথা গুলিয়ে দেয়, শুরু হয় এই স্বাধীনতার অপব্যবহার। এসব সন্তানরা নিজের ইতিহাস,

ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে আপত্তিকর কাজকর্ম শুরু করে দেয় যা পিতামাতার পক্ষে সহ্য করা মোটেও সম্ভব হয় না ।

জীবনসংগ্রামে ভুল নীতিমালা গ্রহণের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীরা স্ত্রীদের উপর চরম যুলুম করেন, আবার একই কারণে স্ত্রীগণও স্বামীদের উপর যুলুমের স্টীমরোলার চাপিয়ে দেন । এর প্রভাবে পরিবারের উপর কেবল অশান্তিই নেমে আসে না, বরং পরিবার ভেঙ্গে যায় । এর এমন পরিসমাপ্তি ঘটে যার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয় বলে ভুক্তভোগীরা মনে করেন ।

সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

কোন সমস্যাই আল্লাহর অগোচরে আসে না । আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না ।

“আসমান জমীনের কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে সংঘটিত হয় না এবং তাঁর ক্ষমতা-সার্বভৌমত্ব প্রত্যেকটি বস্তুকেই ঘিরে আছে ।”
(সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ২৯-এর অংশবিশেষ) ।

অতএব নিজের মন ও মস্তিষ্ককে এ ধরনের একটি কুফরী চিন্তা হতে পবিত্র করে নিতে হবে । তারপর নিজেকে এ বুঝ দিতে হবে যে সকল কল্যাণের উৎস মহান আল্লাহ । তিনি যদি আমার কল্যাণ রাখেন কেবল তাহলেই আমার সমস্যার সমাধান হবে । আর যদি তিনি কল্যাণ না রাখেন তাহলে কোন অবস্থাতেই কল্যাণ লাভ সম্ভব হবে না । সুতরাং উন্নতি ও কল্যাণের বিশ্বাসটি বাংলাদেশ, আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, সিঙ্গাপুর বা সউদি আরবে বসবাসের মধ্যে নয় । বরং সবকিছুর মালিক আল্লাহর হাতেই সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে । আসল মালিকের উপর নির্ভর না করে নকল ও ঠুনকো কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন এক ধরনের কুফরী । এতে মূল মালিক আল্লাহ তা’আলা অসন্তুষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যদিও তিনি অসীম করুণার আধার ।

আমরা যারা মনে করেছিলাম যে সন্তানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার জন্য উন্নত ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা বা প্রচুর অর্থ উপার্জন ইত্যাদি তারাও ভ্রান্ত চিন্তা মধ্যে আছি । নিজের চিন্তা ও নীতিকে আগে শুদ্ধ করে নিতে হবে । সারা দুনিয়ার মালিক আল্লাহ । তাঁর সৃষ্টি হিসেবে আমি কোন্ দেশে থাকবো তাতে কিছু যায় আসে না । স্রষ্টা আমাদের কর্ম বিচার করেন । সর্বাবস্থায় আমরা তার পরীক্ষার

সম্মুখীন। আমাদের জীবনপদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিচার্য বিষয়। বাংলাদেশ, ক্যানাডা, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, জাপান যে দেশেই আমরা থাকি না কেন আল্লাহর হুকুমগুলি কে কত বেশী পালন করছি তা গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন

আমরা অনেকেই জীবনের শুরুতে সতর্কতার অভাবে কিছু ভুল করে ফেলি। যেমন ঃ

১) শুধু নিজেদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে চিন্তা করি।
২) সন্তানদের একাডেমিক ক্যারিয়ার নিয়ে অর্থাৎ ভাল স্কুল, ভাল কলেজ বা ভাল ইউনিভার্সিটি নিয়ে চিন্তা করি।
৩) প্রথমে স্ত্রীর পার্টটাইম চাকুরী তারপর ফুলটাইম চাকুরী অথবা ফুলটাইম পড়াশোনা ইত্যাদি।
৪) বিশেষ করে মহিলারা আশেপাশের পরিবেশ থেকে নানাভাবে নানারকম পরামর্শের দ্বারা বিভ্রান্ত হতে থাকেন, যেমন ঃ

ক. বাচ্চা স্কুলে দিতে গিয়ে যখন বিভিন্ন রুচির কিছু মহিলা একসাথে হন; গল্প করেন;
খ. অফিসে কলিগদের পরামর্শের দ্বারা;
গ. বিভিন্ন প্রোগ্রামে মহিলাদের পারিবারিক আড্ডা থেকে;
ঘ. প্রতিবেশী ভাই বা ভাবীর দ্বারা;
ঙ. অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে দূরের অন্য কারো দ্বারা।

পরামর্শের কিছু নমুনা

- ভাবী, আপনার স্বামী তো দেখি আপনার দিকে খেয়ালই করেন না!
- ভাবী, আপনার স্বামী তো দেখি আপনার পেছনে খরচই করতে চান না!
- ভাবী, আপনার স্বামী তো দেখি আপনাকে নিয়ে তেমন কোথাও বেড়াতে যান না!
- ভাবী, আপনার স্বামী তো দেখি আপনার কষ্টে আয় করা টাকা সংসারের জন্য খরচ করে ফেলেন!
- ভাবী, আপনার আয়ের টাকা তো সম্পূর্ণরূপে আপনার, এই টাকা আপনি কেন সংসারে খরচ করেন!

- ভাবী, আপনাদের ব্যাংক একাউন্ট জয়েন্ট অর্থাৎ এক সাথে কেন? আমারটা তো আলাদা!
- ভাবী, আমার টাকার খরর তো আমার স্বামী জানেই না, আমি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে খরচ করি!
- ভাবী, আপনার স্বামীর কথা মতো আপনি চলেন কেন? আপনার নিজের ইচ্ছে মতো চলবেন!
- ভাবী, এই আধুনিক যুগে কেউ কাউকে পরোয়া করে না, যে যার মতো চলতে পারে!
- ভাবী, এটা মহিলাদের যুগ!
- ভাবী, ডিভোর্স হয়ে গেলেও চিন্তার কোন কারণ নেই!
- ভাবী, আজকাল একজন মহিলা একাই চলতে পারে!
- ভাবী, আজকাল দু'জনে চাকুরী না করলে হয় না!
- ভাবী, আপনাদের ঘরের ফার্নিচার পরিবর্তন করেন না কেন?
- ভাবী, আপনার শাড়ি-গহনা এতো কম কেন?
- ভাবী, আপনার স্বামী আপনার শ্বশুর-শাশুড়ীকে এতো ঘনঘন টাকা-পয়সা দেয় কেন?
- ভাবী, আমি তো আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনদেরকে বেশী পাত্তা দেই না!
- ভাবী, এখনকার সমাজে টিকতে হলে আরো বেশী স্মার্ট হতে হবে!
- ভাবী, আপনারা গাড়ি কিনেন না কেন? অথবা আপনাদের গাড়ির মডেল এতো পুরনো কেন?
- ভাবী, আপনারা একটি ফ্লাট/এপার্টমেন্ট কিনেন না কেন?
- ভাবী, আপনি জীবনটা এভাবে ঘর-সংসার করে নষ্ট করছেন কেন?
- ভাবী, আপনি একা রান্না-বান্না করেন কেন, আপনার স্বামীকেও বলবেন সপ্তাহে অন্তত তিনদিন রান্না করতে!
- ইত্যাদি ইত্যাদি ।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করি

স্বীকার না করে উপায় নেই যে উপরের এই পরামর্শগুলো স্ত্রীদের মনে বিষক্রিয়া করে চলে অনুক্ষণ, অথচ স্বামী-সংসার-সন্তান এগুলো নিয়েই আমাদের সুখের জীবন। উপরের পরামর্শ অনুযায়ী কোন মতেই জীবনের ব্যাল্যান্স হারিয়ে ফেলা

যাবে না। একবার জীবনের ব্যাল্যান্স হারিয়ে ফেললে যারা পরামর্শ দিচ্ছেন তারা আমাদের পারিবারিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন না, আর আসলেও কোন সমাধান তারা দিতে পারবেন না।

একটিবার চিন্তা করে দেখি, যখন আমরা বৃদ্ধ হয়ে যাবো তখন এই স্বামী-স্ত্রীই একে অপরের পরম বন্ধু, তখন এই যৌবনের রাগ-অভিমান কোনই কাজে আসবে না। চারিদিকে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাই তারা কতো অসহায়! অনেকের সন্তান থেকেও তাদের দেখার মতো কেউ নেই, আজকাল অনেকে একাকী জীবন কাটাচ্ছেন ওল্ড এইজ হোমে (বৃদ্ধাশ্রমে)। সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন ছাড়া একজন মানুষ কখনোই মানসিকভাবে পরিপূর্ণ সুস্থ থাকতে পারে না। আবার মানসিক অসুস্থতার কারণে শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। আমাদের জীবনটা খুবই সীমিত, এই সীমিত জীবনে আমরা সংসার ভেঙ্গে কেন মিছেমিছি সমাধান চাচ্ছি অন্যভাবে। আরো গভীরভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখবো যেকোন সময় যেকারো ডাক এসে যাবে পরপারের। চলে যেতে হবে কবরে, শুধু দুই টুকরো কাফনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই যাবে না সাথে, যাবে শুধু কৃত আমল। তখন কোথায় যাবে আমার রাগ-অভিমান, অহংকার, আয়-রোজগার, জমানো টাকা, এতো জামা-কাপড়, গহনা!

সাবধানতাস্বরূপ কিছু পরামর্শ

- কারো বাসায় temporary ভাবে দ্বীর্ঘদিন না থাকা।
- অন্য কোন ফ্যামিলির সাথে একই বাসা শেয়ার করে ভাড়া না থাকা।
- পারত পক্ষে কারো থেকে টাকা ধার না নেয়া এবং কাউকে ধার না দেয়া।
- সুদে লোন নিয়ে গাড়ি-বাড়ি না কেনা এবং কোনভাবেই সুদের মধ্যে না যাওয়া।
- ক্রেডিট কার্ড অথবা কোন সমিতি থেকে সুদে টাকা না নেয়া।
- ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে প্রতি মাসে ক্রেডিট কার্ডের মিনিমাম বিল না দিয়ে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা।
- কারো সাথে শেয়ার করে বাড়ি না কেনা। এবং অন্যের গাড়ি না চালানো।
- Work at home এই ধরণের চিটিং ব্যবসা থেকে দূরে থাকা।
- ভালভাবে feasibility study না করে কোন ব্যবসা শুরু না করা বা কারো সাথে শেয়ারে না যাওয়া।

- অল্প পুঁজিতে অনেক লাভ এই ধরনের ব্যবসা থেকে দূরে থাকা।
- Stock market/share market-এ invest করে অতিরিক্ত লোভ না করা।
- হালাল-হারাম না দেখে কোন কাজ-কারবারে না ঢোকা।
- ক্যাশ ইনকাম করার পর সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি না দেয়া।
- সর্টকাটে বড়লোক হওয়ার চিন্তা না করা।
- দুইনাম্বারী লোকদের সাথে উঠাবসা না করা।
- ইসলামী পরিবেশের মধ্যে থাকা এবং ইসলামী মনমানসিকতার পরিবারের সাথে বন্ধুত্ব করা।

স্বামী-স্ত্রীর জন্য কিছু টিপ্স

১. ঘরে ঢুকেই স্বামী বা স্ত্রী একে অপরকে অন্তর থেকে সালাম দেই। সালাম হচ্ছে দু'আ, একে অপরের জন্য সত্যিকার অর্থে শান্তি কামনা করা।

২. স্বামী বা স্ত্রী যখনই বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসেন, তখন একে অপরের কর্তব্য হচ্ছে হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করা।

৩. স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যে কোন বিষয়ে জিদ করা বা ক্রোধ থেকে বিরত থাকতে হবে। জিদ বা ক্রোধ এসে গেলে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং মনে করতে হবে ইবলিস শয়তান পেছন থেকে এই কাজ করাচ্ছে, তাই তাকে কোন ক্রমেই কৃতকার্য হতে দেয়া যাবে না।

৪. স্বামী-স্ত্রীতে একটু-আধটু ঝগড়া-ঝাটি হতেই পারে সেজন্য চিৎকার চেঁচামেচি করা উচিত নয়, জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারা ঠিক নয় এবং ভাঙ্গচুর করা ঠিক নয়।

৫. কোনো ব্যাপারে উভয়ের মর্জি ও মন-মেজাজের বিপরীত ঘটলেই আগুনের মতো জ্বলে উঠা যাবে না।

৬. ছোট-খাটো বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক এবং গন্ডগোল না করে হাসিমুখে এড়িয়ে যেতে হবে। কখনো একে অপরকে ছোট করে দেখা যাবে না।

৭. একজন রেগে গেল অন্যজন ঐ মুহূর্তে অবশ্যই রাগা যাবে না এবং চুপ থাকতে হবে। একজন আরেকজনকে কখনো কোন বিষয়ে খোঁটা দেয়া যাবে না।

৮. মনকে সারাক্ষণ তিক্ত-বিরক্ত করে রাখা যাবে না। কুরআন পড়া, নফল সলাত আদায় করা, ইসলামী বই পড়া, ডিভিডি দেখা ইত্যাদিতে ইন্‌শাল্লাহ মন ভাল হয়ে যাবে।

৯. অপরিহার্য কোনো ব্যাপার ঘটলে স্ত্রীর কর্তব্য অপরিসীম ধৈর্য সহকারে স্বামীকে বোঝানো অথবা স্বামীর উচিত স্ত্রীকে বোঝানো।

১০. ঐ মুহূর্তে যদি বোঝানোর মতো পরিবেশ না থাকে তাহলে চুপ থাকতে হবে এবং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

১১. স্বামীকে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ দেখতে পেলে যথাসম্ভব শান্ত ও নরম হয়ে যাওয়া স্ত্রীর কর্তব্য, কারণ মহান আল্লাহ স্ত্রীদেরকে কিছু স্পেশাল ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সময় সুযোগ মতো কোন একদিন বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হবে।

১২. স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্বামীর খুব সতর্কতার সাথেই কাজ করা ও কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্বামীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা নিজের সম্ভ্রম-মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে ফেটে পড়া কোনোভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। স্ত্রীকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়।

১৩. মানুষ মাত্রই ভুল করে। তাই সারাক্ষণ একে অপরের ভুল ধরে বেড়ানো যাবে না।

১৪. একজন আরেকজনকে কখনোই ঘৃণা করা যাবে না। আর কখনোই যেন দু'জনের মধ্যে communication gap অর্থাৎ বোঝার ভুল না হয়।

১৫. একজন আরেকজনকে সম্মান করতে হবে। একে অপরকে মাঝে মধ্যেই বলা উচিত I love you, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিজেকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করি

সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন করতে চাইলে আগে নিজের পরিবর্তন প্রয়োজন

আমাদের চলার যে রাজপথ মহান আল্লাহ তার নাবীদের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন সেটিই সঠিক পথ। সে পথেই রয়েছে মুক্তির ঠিকানা। মহান আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ রহমত পাঠিয়েছেন তাঁর শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমে। এখানে জীবন সমস্যার এমন সমাধান রয়েছে যা ১৪শ বছর আগে মানুষের জীবনে প্রশান্তি এনেছে, আজ ১৪শ বছর পরেও মানুষের সকল জটিল সমস্যার জট খুলে দিচ্ছে। ইসলামী মতবাদের তুলনায় মানুষের সৃষ্ট মতবাদ খুব বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি, ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ এর উদাহরণ।

আমাদের জীবনের শেষ গন্তব্য আখিরাত। ইহজীবনকে আল্লাহর দেয়া আধুনিক Code of Conduct (আচরণ বিধি) দিয়ে সাজিয়ে তোলার মাধ্যমে আখিরাতের সফল প্রস্তুতি। আল কুরআনে রক্ষিত এসব Code of Conduct দিয়ে চলি এবং নিজেদের চরিত্র গঠন করি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাই, চেষ্টা সাধনা করি, পারস্পরিক লেনদেন করি, মেলামেশা, পরিবার গঠন ও লালন করি, আমাদের সৃষ্টা মহান আল্লাহকে খুশী করার চেষ্টা করি।

আত্মগঠন মানে নিজেকে আল্লাহর দেয়া Code of Conduct দিয়ে ভেতর ও বাইরের অবয়ব আগাগোড়া পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালানো। জীবনের সকল কাজ এই কোডের অনুকরণে চালালে আমাদের সকল কাজ মহান আল্লাহর খুশীর কারণ হবে।

একজন ঈমানদারের জন্য আত্মগঠনের কাজটি বিরামহীন একটা অ্যাসাইনমেন্ট। আত্মগঠনের চেষ্টা হতে ঈমানদারের শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, অহঙ্কার নিয়ন্ত্রিত থাকে। আল্লাহর অপরাপর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও কল্যাণ কামনা তার সহজাত। জ্ঞান যেখানে যার নিকটই থাকনা কেন ঈমানদার সেখানেই দ্রুত এগিয়ে যাবে।

সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে আত্মসমালোচনা বা নিজের সমালোচনা

ইসলামী জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যক্তির নিজের পরিবর্তন। নিজেকে পরিবর্তন না করে অন্যকে উপদেশ দেয়ার অভ্যাস এমন একটি কর্ম যা দেখে আল্লাহ রাগান্বিত হন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা নিজেরা করো না? আল্লাহর নিকট এটা ঘৃণা উদ্রেককারী যে তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না।" (সূরা সফ ঃ ২-৩)

দেখা যায় যে কর্তা ব্যক্তিরা পরিবারের উপর আরোপিত আদেশ নিষেধের অধিকাংশ নিজেই মানেন না। ভাসা-ভাসা জ্ঞান আর লোক মুখে শোনা কিছু নীতিবাক্যকেই আদেশ নিষেধের বলয়ে নিয়ে তা পরিবারের উপর চাপিয়ে দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি হয় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ বিষয়ে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন, তখনো সেই ব্যক্তি তার নিজের অতি সীমিত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক জ্ঞানকে বলিষ্ঠ মনে করে প্রতিপক্ষের আন্তরিক সংশোধনী প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেন।

সুতরাং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাকে নিজে আগে জ্ঞানার্জন করতে হবে। যদি আমি জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারী হয়ে থাকি তাহলে তা ইসলামের আলোকে জেনে নিতে হবে। আমার চরিত্রের আপত্তিকর দিকগুলো আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে। আত্মসমালোচনা করে সেগুলির সংশোধনের পন্থা বের করতে হবে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করো কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাকো অথচ তোমরা কুরআন পড়ো। তোমরা কি ভাবো না?" (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)

সুখী পরিবার গঠনে কুরআন বুঝা জরুরী

আল কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ আসমানী কিতাব। জীবন পরিচালনার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন। এর পরিপূর্ণ ব্যবহারই প্রকৃত সুফলের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। আংশিক অনুসরণ ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাবের সংবাদ প্রদান করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে ঃ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল (জাযা) পার্থিব জীবনে হীনতা, এবং কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত [বেখবর] নহেন।" (সূরা বাকারা ঃ ৮৫)

এধরণের সুস্পষ্ট কঠোর হুঁশিয়ারী থাকা সত্ত্বেও শুধু অজ্ঞতার কারণে আমরা ক্রমাগত আল্লাহর কিতাবের প্রতি হাস্যকর আচরণ করেই যাচ্ছি। এ কিতাবকে সবীনা খতম আর সূরা ইয়াসীন পাঠ করার জন্য ব্যবহার করে যাচ্ছি। যে কিতাব আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সফলতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে পারত, সেই মহান কিতাবকে আমরা শুধু সামান্য সওয়াব আদায়ের জন্য আর মৃতের কুলখানির জন্য ব্যবহার করছি। অথচ এটি বিস্তারিত অর্থসহ পড়ে আমাদের জেনে নেয়া উচিত কিভাবে আমরা একটি সোনালী সমৃদ্ধিশালী জীবন গড়তে পারি যা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুস্পষ্ট সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে। আল্লাহ তাঁর নাবীকে বলেছিলেন ঃ

"হে নাবী! আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে আমি এই কিতাব নাযিল করিনি।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ২)

আসুন আমরা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল কুরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করি, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত বিস্তারিত পড়ে জেনে নিই কিভাবে একটি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন সুখীসমৃদ্ধ পরিবার ও সমাজ গড়তে পারি। আল্লাহ আমাদের

তার দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে জেনে এর পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দিন। ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আজাব হতে পরিত্রাণ দিন। যথেষ্ট পরিমাণ অধ্যয়নের পর সওয়াবের উদ্দেশ্যে বা কুরআনের মর্মবাণী হতে উপকারের উদ্দেশ্যে, কুরআনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা এবং এর উপলব্ধি করে যদি তিলাওয়াত করতে চাই তাহলে কোন দোষ নেই।

শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না থাকি, অর্থ বোঝার চেষ্টা করি। অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেন তা হাজার বার পড়লেও (অর্থাৎ তিলাওয়াত করলেও) কি আমার অসুখ সারবে? মোটেও না। আমাকে ঐ ঔষধগুলি কিনে খেতে হবে, তবেই কেবল আমি রোগমুক্তির আশা করতে পারি। কুরআন হলো জীবনের সকল সমস্যার কার্যকরী প্রেসক্রিপশন। এটা অধ্যয়ন করে, অনুধাবন করে এর শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য কুরআন পাঠানো হয়েছে। আমি যদি অর্থ ছাড়া এটা কেবল রিডিং পড়ে যাই তাহলে এটা কুরআন পাঠানোর মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যও ব্যর্থ করে দেবে এবং আমিও অজ্ঞদের দলের একজন থেকে যাবো, ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই আসুন আজই অর্থসহ কুরআনের তাফসীর সংগ্রহ করি এবং প্রতিদিন অন্ততঃ ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা নিয়মিত অধ্যয়ন করি এবং কুরআনের আলোকে জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি।

শয়তানের পলিসি হতে সাবধানতা অবলম্বন

ইবলিস (শয়তান) সূরা আ'রাফের ১৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল ঃ

"আমি এদের (মানবজাতির) সামনে থেকে আসবো, পিছন থেকে আসবো, ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।"

শয়তানের প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশোধের অংশ হিসেবে সে মানুষকে সবসময় খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ঈমানদারগণ শয়তানের প্রধান টার্গেট। শয়তানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এসকল কৌশলের মধ্যে সবচাইতে বড় কৌশল ও মিশন হলো মানুষকে কুরআনের কাছে ঘেঁষতে না দেয়া।

এ মিশনে শয়তান ঈমানদারদের ঈমানের মান অনুযায়ী বিভিন্ন ডৌজ দিয়ে থাকে। যারা শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করেন তাদের জন্য এক ধরণের প্রেসক্রিপশন, এবং যারা সলাত আদায় করেন এবং সৎভাবে জীবনযাপন করেন তাদের জন্য আবার অন্য ধরণের প্রেসক্রিপশন। শয়তানের common strategy হলো আল কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর পড়তে না দেয়া। শয়তানের এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে ঈমানদারদের মনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে, বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই দেখা যায় যে কেউ খুব আবেগের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করেন কিন্তু তার অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করেন না। যে সূরা ইয়াসীন বা আয়াতুল কুরসী ছোটকাল হতে মুখস্থ করার তীব্র অনুভূতি সকল মুসলিমের মনে প্রকট, যা এখনো পাঠ করে আপদবিপদ দূর করা হয় এবং ঈমানদারদের বিশ্বাস যে এ সূরা পাঠ করে তারা অনেক উপকার পেয়েছেন, সেই আয়াতুল কুরসীর অর্থ-ব্যাখ্যা ও এর তাৎপর্য কি এটা জানার আগ্রহ যদি জীবনে একবারও মনে উদয় না হয়, তাহলে সবচাইতে বেশী লাভবান হবে ইবলিস (শয়তান), এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলিমগণ।

আসুন, চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করি। সারা জীবন অনেক ইবাদত বন্দেগী করেছি, বিদ্যা শিক্ষা করেছি, ডিগ্রীধারীও হয়েছি। এবার নিজের বিবেককে একবার জিজ্ঞেস করি, সারা জীবন কুরআন বুঝার চেষ্টা না করে যদি আল্লাহর নিকট হাযির হই তাহলে আমার মান কোন পর্যায়ে রয়ে গেলো? ক্লাশের ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে সবাই ছাত্র। যাদের ক্রমিক নম্বর মেধা অনুসারে ১ থেকে ৫ তারাও ছাত্র, আর যাদের ক্রমিক নম্বর ৪৫ থেকে ৫০ তারাও ছাত্র। তবে মানগত পার্থক্যই এখানে বিবেচনার যোগ্য। তাই নয় কি? আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত মনে কুরআন বুঝার দায়দায়িত্ব হতে নিজেদের নিস্কৃতি দিতে পারি? আমাদের বিবেক কি এখনো শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে কুরআনকে সীমিত রাখার জন্য সায় দেয়? আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলতেন ঃ 'ঈমানের লক্ষণ হচ্ছে কুরআন বুঝা'।

আল কুরআনে বারবার মানুষকে চিন্তা-গবেষণা (তাফাক্কুর-তাদাব্বুর) করতে বলা হয়েছে। সূরা সাদ এর ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"ইহা এক বহু বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমরা নাযিল করেছি যাতে লোকেরা এটার আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরাই এটা হতে শিক্ষাগ্রহণ করে।"

যারা এ যুগেও প্রচার করে বেড়ান যে কুরআন তিলাওয়াত করলে এত পরিমাণ সওয়াব হবে বা বেশীবেশী কুরআন তিলাওয়াত করা দরকার, অর্থ বোঝার কোন দরকার নেই ইত্যাদি, তারা আল্লাহর কাছে এ অজ্ঞতার কি জওয়াব দেবেন? কারণ মানুষ তিলাওয়াত বলতে বুঝে সুর করে মাথা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে শুধু রিডিং পড়ে যাওয়া। এতেই ঈমানদারগণ খুশী। কেউ কেউ বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াই ঃ আমার খতম ২৫শে রমাদানেই শেষ হয়েছে; আর হিসাব-নিকাশ করি কত পরিমাণ সওয়াব অর্জিত হলো। ধারণাটি এমন যে শুধু সওয়াব কামানোর জন্যই মুসলিম জাতির সৃষ্টি, শুধু তিলাওয়াতের জন্যই আল কুরআন নাযিল হয়েছিল। এটাতো বরং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের একধরণের অপব্যবহার। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, 'কুরআন অধ্যয়নে কোন লাভ নেই যদি তা নিয়ে ভাবা না হয়, চিন্তা করা না হয়'।

আমরা দুনিয়ার সব ডিগ্রী, মাষ্টার্স, ডক্টরেট নিয়েও শয়তানের এ কুমন্ত্রণাতেই কাবু হয়ে যাই যে ওস্তাদ ছাড়া কুরআনের অর্থ বুঝা যাবে না বা কুরআন বুঝা আমাদের জন্য নয় অথবা এটা শুধু মাদ্রাসা-শিক্ষিতদের জন্য ইত্যাদি। অথচ বাস্তবতা হলো জীবনের ৪০/৫০/৬০ বছর পার হয়ে গেলো, এখনো ওস্তাদও খোঁজা হয়নি, আর নিজেও সাহস করে শয়তানকে পরাজিত করে আল্লাহর উপর ভরসা করে কুরআনের তাফসীর পড়া হয়নি। আবার কেউ কেউ কুরআনের তাফসীর এজন্য পড়তে চাই না যে যদি পরিবর্তন হয়ে যাই? এসব শয়তানী হিসাব-নিকাশ চুকাতে চুকাতেই জীবনের ফাইনাল হিসাবের দ্বারপ্রান্তে এসে যাই। ঈমানদারদের কুরআন ও সহীহ্ হাদীস জানা হতে দূরে রাখার শয়তানী এগুলো হচ্ছে শয়তানের কৌশল।

শয়তানের ফাইনাল মিশন হচ্ছে আমি যেন শুধু কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি যাতে কুরআনের ব্যাখ্যা না বুঝি এবং তাফসীর স্টাডি প্রোগ্রামে না যেতে পারি। সেজন্য সে শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়, এবং এ ব্যাপারে সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সিন্‌সিয়ার। যেমন প্রতি মাসে একবার ২ ঘন্টার ফিক্‌স্ট প্রোগ্রাম। কিন্তু দেখা যায় ঠিক ঐদিনই শয়তান নানারকম কাজ দিয়ে আমাদেরকে ব্যস্ত রাখে। যেমন ধরি ঐদিনই কারো বাসায় দাওয়াত খেতে যেতে হবে অথবা কেউ দাওয়াত খেতে আমার বাসায় আসবে। অথবা শপিংয়ে যেতে হবে। অথবা ঠিক ঐদিনই সন্তানদের নিয়ে বাইরে যেতে হবে। অথবা ঠিক ঐদিনই বাড়িঘর পরিষ্কার করতে হবে অথবা গাড়ি সার্ভিসিংয়ে নিয়ে যেতে হবে অথবা কারো সাথে দেখা করতেই হবে। যতো জরুরী কাজ ঠিক

ঐদিন ঐ একই সময়ে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আমাদের কাজের priority নির্ধারণ করতে হবে আখিরাতের কথা স্মরণে রেখে, দুনিয়াকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে নয়।

ঘরে শান্তির জন্য কিছু ইসলামী নিয়ম মেনে চলা খুবই জরুরী

ঘরে বা বাসায় ঢোকার সময় বিসমিল্লাহ বলে ঢুকতে হয় এবং তারপর সালাম দিতে হয়। অতঃপর দু'আ পড়তে হয়, তা না হলে সাথে সাথে শয়তানও ঘরে ঢুকে যায়। কোন কিছু খাওয়ার সময় ডান হাত দিয়ে খেতে হয়। বাম হাত দিয়ে খেলে তার সাথে সাথে শয়তানও তা খায় এবং এতে বরকতও পাওয়া যায় না। খাওয়ার শুরুতে দু'আ বলতে হবে। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে, খাওয়ার মাঝে "বিসমিল্লাহী ফি আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি" বলতে হয়। খাওয়ার শেষে দু'আ পড়তে হয়। বাথরুমে প্রবেশের সময় দু'আ পড়ে ঢুকতে হয়। বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময়ও দু'আ পড়তে হয়। ঘুমানোর সময় দু'আ পড়তে হয়।

ঘরে ঢুকে স্ত্রী-সন্তানদেরকে সালাম দেই

আমরা জানি সালামের অর্থ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটি একটি উত্তম দু'আ। আমাদের দেশে সাধারণতঃ আমারা বাসায় ঢুকে স্ত্রীকে সালাম দেই না, এছাড়া সন্তানদেরকে তো সালাম দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এটি আমাদের দেশের দীর্ঘ দিনের প্রচলন। স্বামী তার স্ত্রীকে সালাম দেয় না বা স্ত্রী তার স্বামীকে সালাম দেয় না এবং বাবা-মায়েরা তার সন্তানদেরকে সালাম দেয় না। এতে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানরা নিয়মিত একটি উত্তম দু'আ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একই পরিবার কিন্তু ইসলামী নিয়মানুযায়ী প্রতিদিন কেউ কারো মঙ্গল কামনা করছে না। আমরা নিজ স্বামীকে সালাম দিতে লজ্জাবোধ করি, নিজ স্ত্রীকে সালাম দিতে লজ্জাবোধ করি, নিজ সন্তানদেরকে সালাম দিতে লজ্জাবোধ করি। অর্থাৎ একই পরিবারের একে অপরের জন্য দু'আ করতে লজ্জাবোধ করি।

আমাদেরকে এই ট্রেডিশন থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে পরিবারের জন্য উত্তম উপায়ে দু'আ করতে হয়। এখানে লজ্জার কিছু নেই। প্রথম প্রথম একটু লজ্জা ও অস্বস্থি লাগবে কিন্তু আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। তখন মনে হবে এতো দিন

এই দু'আর বরকত থেকে পরিবারের সকলেই বঞ্চিত হয়েছি, তখন আফসোস হবে। তাই আজ থেকেই এই প্রাকটিস শুরু করা উচিত।

দেয়ালে মানুষ বা প্রাণীর ছবি টানালে এবং ঘরে মূর্তি রাখলে শান্তি বিনষ্ট হয়

আমরা অনেকে ঘরের দেয়ালে নানারকম ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রাখি। যেমন ঃ বিয়ের ছবি, নিজ পিতা-মাতার ছবি, পারিবারিক ছবি, রবীন্দ্র-নজরুল, নেতা-নেত্রীর ছবি, পীরের ছবি, বিভিন্ন স্টারদের ছবি বা পশু-পাখির ছবি ইত্যাদি। আবার অনেকে আর্ট-কালচার-এর মনে করে শোপীচ হিসেবে ঘরে নানারকম মূর্তিও রাখি। আমরা মূর্তি মানে হয়তো সাধারণতঃ বুঝে থাকি মাটির তৈরী বা সিমেন্টের তৈরী কিছু। কিন্তু যুগের সাথে অনেক কিছুরই পরিবর্তন এসেছে, তাই আজকাল কাঁচের তৈরী, প্লাস্টিকের তৈরী, রাবারের তৈরী, ফোমের তৈরী, কাপড়ের তৈরী, উলের তৈরী নানারকমের পুতুল, পশু-পাখি ইত্যাদি বিভিন্ন বাসায় দেখা যায় যা সবই শিরকের অর্ন্তভুক্ত।

মনে রাখতে হবে ঘরে যে কোন ধরনের মূর্তি এবং কোন প্রাণীর ছবিই রাখা নিষেধ। রসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের সর্বপ্রথম সকল প্রকার মূর্তি এবং ছবি ধ্বংস করেছিলেন। কারণ যে ঘরে ছবি এবং মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আর আমার ঘরে যদি রহমতের ফিরিশতাই প্রবেশ করতে না পারেন তাহলে সেই ঘরে রহমত-ইবা আসবে কী করে? তাই আমি কি চাই না আমার ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করুক? বাইরে থেকে বাসায় ফিরে খালি ঘরেও সালাম দিতে হয় কারণ ঘরে রহমতের ফিরিশতা থাকে এবং তারাও আমাদের সালামের জবাব দিয়ে থাকেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নারী ও পুরুষের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই যেমন সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত মর্যাদায় ভূষিত করেছে তেমনি নারী ও পুরুষের মধ্যে বিশেষ কতগুলো গুণের উপস্থিতিও ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য। এ গুণগুলোই তাদের পূর্ণ আদর্শবাদী বানিয়ে দেয় এবং এ আদর্শবাদ চিরউজ্জ্বল ও বাস্তবায়িত রাখতে পারলেই

ইসলামের দেয়া সে মর্যাদা নারী ও পুরুষ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন ঃ

"আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর দিকে মনোযোগদানকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক – আল্লাহ তা'আলা এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোকের জন্যে – আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ভাবে ফয়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে তার বিপরীত কিছুর ইখতিয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার অধিকার কোন মু'মিনের নেই। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে, সে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৫-৩৬)

এই আয়াত থেকে যেসব গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে সেসব গুণাবলী নর-নারীর মধ্যে বর্তমান থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে – তা এখানে খানিকটা ব্যাখ্যাসহ সংখ্যানুক্রমে উল্লেখ করা যাচ্ছে, যেন আমরা সকলে সহজেই সে গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। আসুন এবার আমরা আমাদের নিজেদের চরিত্রের সাথে উপরের আয়াতের সাথে মিলাতে চেষ্টা করি।

১) মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম স্ত্রীলোক। 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণকারী, অনুগত, বাধ্য। আর কুরআনী পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য। ব্যবহারিকভাবে আল্লাহর আইন পালনকারী, অর্থাৎ আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা করবো আরা যা করতে নিষেধ করেছেন তা করবো না।

২) মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক। 'মু'মিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈমানদার। আর কুরআনী পরিভাষায় কুরআনের উপস্থাপিত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়সমূহকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে নেয়াই হচ্ছে ঈমান। এই অনুযায়ী মু'মিন হচ্ছে সেসব পুরুষ ও স্ত্রী, যারা কুরআনের উপস্থাপিত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাসী। মুসলিম-এর পরে মু'মিন বলার তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ার মানুষকে কেবল

আল্লাহর বাহ্যিক আইন পালনকারী হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে তাঁর প্রতি মন ও অন্তর দিয়ে ঐকান্তিক বিশ্বাসী ।

৩) আল্লাহর দিকে মনোযোগকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যাদের মন ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর বিধান পালনে সতত মশগুল ।

৪) সত্য ও ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। এর অর্থ সেসব লোক, যারা সর্বপ্রকার মিথ্যাকে পরিহার করে আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর হুকুম পালন করে চলে। ফলে তাদের আমলে কোনো প্রকার রিয়াকারী বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে না ।

৫) সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। মূল শব্দ সবর অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করা। এখানে সেসব পুরুষ-স্ত্রীলোককে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর দ্বীন পালন ও তাঁর বন্দেগী অবলম্বন করতে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট অকাতরে সহ্য করে, তার উপর দৃঢ় হয়ে অটল থাকে। শত বাধা-প্রতিকূলতার সঙ্গে মুকাবিলা করেও দ্বীনের উপর মজবুত থাকে এবং কোনক্রমেই আদর্শ বিচ্যুত হয় না ।

৬) আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা অন্তর, মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কিছু দিয়ে আল্লাহর বিনীত বন্দেগী করে। মূল শব্দটি হচ্ছে ‘খুশূয়ূন’, অর্থ প্রশান্তি, স্থিতি, প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিনয়, ভয় মিশ্রিত ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ ।

৭) দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অন্তরে দয়া অনুভব করে উদ্বৃত্ত মাল ও অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্ত লোকদের দেয় ।

৮) সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সিয়াম পালন করে, যে সিয়ামের ফল হচ্ছে তাকওয়া পরহেযগারী লাভ এবং যার মাধ্যমে ক্ষুৎপিপাসার জ্বালা ও যন্ত্রণা অনুভব করা যায় প্রত্যক্ষভাবে ও তার জন্যে ধৈর্যধারণের শক্তি অর্জন করতে পারেন ।

৯) লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা নিজেদের লজ্জাস্থান অন্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে না– তাতে লজ্জাবোধ করে এবং নিজেদের লিঙ্গস্থানকে হারামভাবে ও হারাম পথে ব্যবহার করে না। ঢেকে রাখার যোগ্য– দেহের কোনো অঙ্গকে ভিন-পুরুষ বা স্ত্রীর সামনে উন্মুক্ত করে না ।

১০) আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা আল্লাহকে কস্মিনকালেও এবং মুহূর্তের তরেও ভুলে যায় না, সে তার নিত্যদিনের কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখে।

মু'মিনের জীবনের যে সাতটি গুণ

প্রত্যেক মানুষ সফলতা অর্জন করতে চায়। যে যে কাজই করুক, তার ফলাফল যদি ভালো হয়, তবে সে সফলতা লাভ করল। আর যদি তার বিপরীত হয় অর্থাৎ তার কর্মফল যদি ভালো না হয়, তা হলে সে সফলতা লাভ করতে পারল না। এই দুনিয়া দুঃখ ও কষ্টের জায়গা। দুনিয়ায় পূর্ণাঙ্গ সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এমনকি নাবী-রসূলরাও নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। সূরা 'আল আসর'-এ আল্লাহ বলেন ঃ

"সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং একে অপরকে তাকিদ করে সত্যের এবং তাকিদ করে ধৈর্যের।"

এ সূরাটিতে উল্লিখিত চারটি কাজ যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে, তাকে আল্লাহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। আমরা সকলে পরকালের যাত্রী। পরকালীন সাফল্য লাভ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। পূর্ণাঙ্গ সফলতা একমাত্র পরকালেই লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দুনিয়াকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো; অথচ পরকাল উত্তম এবং চিরস্থায়ী।' সুতরাং চিরস্থায়ী সাফল্য হচ্ছে জান্নাত লাভ। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সাতটি গুণ অর্জন করতে বলেছেন। আর যে মু'মিন এই সাতটি গুণে গুণান্বিত হবে সে জান্নাত লাভ করবে।

অবশ্যই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের সলাতে বিনয়ী ও ভীত থাকে। যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে। যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়। যারা তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তাদের স্ত্রীদের ও ডান হাতের অধিকারী দাসীদের কাছে ছাড়া। এদের ব্যাপারে তাদের দোষ ধরা হবে না। অবশ্য যারা এর বাইরে আরও কিছু চায় তারাই সীমা লংঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে। যারা তাদের সলাতের হিফাযত করে। এসব লোকই ঐ ওয়ারিশ, যারা ফিরদাউস নামক জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা মু'মিনুন ঃ ১-১১)

প্রথম গুণ ঃ 'খুশয়ু'-এর সাথে সলাত আদায় করা। সলাত মু'মিনের প্রথম মৌলিক ইবাদত। সলাতে 'খুশয়ু' অর্থ আল্লাহকে উপস্থিত ভেবে অন্তরকে স্থির রেখে সঠিকভাবে সলাত আদায় করা। সলাতে অস্থির ও চঞ্চল হওয়া মুনাফিকের লক্ষণ। আবুজর গিফারি (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সলাতের সময় আল্লাহ তা'আলা সলাত আদায়কারীর প্রতি সারাক্ষণ দৃষ্টি রাখেন, যতক্ষণ না সলাত পড়ার সময় সলাত আদায়কারী কোনো দিকে দৃষ্টি না দেয়। যখন সে অন্য দিকে দৃষ্টি দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন (আবু দাউদ)। সলাতে সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং ডানে-বামে তাকানো যাবে না। যদি সলাত আদায়কারী সলাত আদায়ে তাড়াহুড়া করে, তাহলে 'খুশয়ু'-এর সাথে সলাত আদায় হবে না এবং তার সলাতও শুদ্ধ হবে না।

দ্বিতীয় গুণ ঃ সলাত আদায়ে অত্যন্ত যত্নবান হওয়া। সলাতে যত্নবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের জন্য ভেবে নিজের জীবনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতকে সব সময় চালু রাখা। সলাতের ব্যাপারে কখনো অবহেলা না করা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফল যে সলাতই হোক, সব সলাতকে একাগ্রচিত্তে যথাসময়ে আদায় করা। কখনো চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতের অধিবাসী হতে হলে উল্লিখিত সাতটি গুণের অধিকারী হওয়া একান্ত কর্তব্য। যিনি এই গুণাবলির অধিকারী হবেন, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতুল ফেরদাউস দানের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা সত্য।

তৃতীয় গুণ ঃ অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। একজন পূর্ণ ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য হলো সে নিজেকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে রক্ষা করবে। যেসব কথায় দ্বীনের কোনো উপকার নেই, সেসব কথা থেকে নিজেকে দূরে রাখা অবশ্য কর্তব্য। অহেতুক কথাবার্তায় গুনাহ্ হওয়ার আশঙ্কা বেশী। প্রয়োজনীয় কথা বলতে দোষ নেই। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে চুপ থাকা ভালো।

চতুর্থ গুণ ঃ যাকাত প্রদান করা। যাকাত ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের একটি। যাকাত প্রদান করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা সলাত আদায়ের সাথে যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক মু'মিন যাকাত প্রদান করতে গড়িমসি করে থাকেন। এটা আসলে পূর্ণ ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকাত আদায় করা প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি যাকাত প্রদান না করে, তা হলে কিয়ামতের দিন তার ওই সম্পদ একটি বিষধর সাপ হয়ে তাকে দংশন করতে থাকবে।

পঞ্চম গুণ ঃ ওই সব লোক যারা স্ত্রী ছাড়া অন্যসব পরনারী থেকে গোপনাঙ্গকে সংযম রাখে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার গোপনাঙ্গকে হিফাজত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হয়ে যাবো। সুতরাং একজন সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি পরনারীর এবং পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং সে আল্লাহর ভয়ে নিজেকে সংযত রাখবে।

ষষ্ঠ গুণ ঃ আমানত সম্পর্কে সতর্ক থাকা। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যবহ। আমানত দুই প্রকার। প্রথমত, আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত; দ্বিতীয়ত, মানুষের হক সম্পর্কিত আমানত। শরিয়ত নির্দেশিত সব ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করা হচ্ছে আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত। আর বান্দার হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে কেউ কারো কাছে ধনসম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে ফেরত দেয়া, কারো গোপন কথা অন্যের কাছে প্রকাশ না করা। রাষ্ট্রের কোনো গোপন তথ্য অন্য দেশের কাছে প্রকাশ না করা।

সপ্তম গুণ ঃ ওয়াদা পূর্ণ করা। ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব। একজন মু'মিন ব্যক্তি কোনো ওয়াদা করলে সে ওয়াদা পালন করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। সেটা যেকোনো ওয়াদাই হোক না কেন। কেউ যদি ওয়াদা করে সেটা রক্ষা না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। মু'মিনের কথা ও কর্ম এক ও অভিন্ন থাকবে। কথা বলবে ভেবে-চিন্তে আর কর্মে থাকবে স্বচ্ছতা।

টেনশন ও স্ট্রেস থেকে দূরে থাকা

কম বেশী টেনশনে ভুগি আমরা সবাই। এই ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষে কোনো তফাৎ নেই। আমরা উভয়েই টেনশন নৌকার যাত্রী। টেনশন সৃষ্টি স্ট্রেস্-এর কথায় বলি I am straised out, life is miserable. রাত পোহালেই আবার ছুটি দৈনন্দিন কাজের পেছনে, আবার টানাপোড়েন চলে টেনশন ও স্ট্রেস্-এর। তাহলে এর থেকে মুক্তির উপায় কী? টেনশন হওয়ার বড় কারণ দুশ্চিন্তা অথবা বলা যায় অহেতুক দুশ্চিন্তা। সহজভাবে জীবনের সমস্যাগুলোকে গ্রহণ করার মনমানসিকতা গড়ে তুলতে পারলে এবং তদনুযায়ী চললে টেনশন ও স্ট্রেস-এর হাত থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া যায়। So take it easy. একটা কথা মনে রাখা দরকার যে "Worry casts a long shadow of a small cause."

হতাশ হওয়া যাবে না

কখনো হতাশ যেন না হই। কখনো না। মু'মিনের জীবনে হতাশ বলতে কোন শব্দ নেই। হতাশা জীবনে পরাজয় ডেকে আনে। প্রথম চেষ্টায় হতাশ হলে অন্যত্র চেষ্টা করতে হবে, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সাফল্য না আসা পর্যন্ত চেষ্টা বা সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে,

"If the door is shut, look around and you may find a window open." And "When one door closes, another one opens."

তাই হতাশ হওয়ার কারণ নেই, উদ্যমটা বাঁচিয়ে রাখা চাই, সফলতার মুখ দেখা যাবেই, ইনশাআল্লাহ। "A winner never quits and a quitter never wins." কাজেই জীবন চলার পথে হতাশা নয়। নিজেকে একজন winner বলে বিশ্বাস করি, নিজের উপর আস্থা রাখি। সে জন্য চাই আত্মবিশ্বাস।

ভুল করলে ভুল স্বীকার করে নেয়া

ভুল করলে ভুল স্বীকার না করাটা দ্বিতীয় ভুল। সবচেয়ে বড় ভুল এই যে, ভুল করেও মনে করা যে, আমি ভুল করিনি। ভুল করে বসা এক অভিজ্ঞতা, কিন্তু দ্বিতীয়বার করা বোকামী। যদি ভুল করেই ফেলি, তবে তা সংশোধনের জন্য বিলম্ব ও লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। ভুল-ভ্রান্তি নিয়েই জীবন। অতএব সেই ভুলকে প্রাধান্য দিয়ে বাকী জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোন যুক্তি নেই। ভুল হয়ে গেলে সেই ভুলের মোকাবিলা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ঃ

১. দ্রুত ভুল স্বীকার করে নেয়া।
২. ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা চাওয়া ও তাওবা করা।
৩. ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা।
৪. ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকা।
৫. নিজের ভুলের জন্য অন্য কাউকে দোষ না দেয়া।
৬. ভুলকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য কোন অজুহাত তৈরী না করা।
৭. ভুলকে সঠিক বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা না করা।
৮. ভুল করে অযথা তর্ক না করা।

ঘরের কথা বাইরে না বলাই উত্তম

আমরা অনেক সময় নিজের ঘরের কথা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যার কথা অন্যের কাছে অতি সহজেই বলে ফেলি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এতে মূল সমস্যার সমাধানের চেয়ে পরিবারের ক্ষতি-ই বেশী হয়েছে। আর এই ভুলটা সাধারণতঃ আমরা স্ত্রীরাই বেশী করে থাকি। আসলে পারিবারিক সমস্যার সমাধান একান্তই নিজেদের এবং এই সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদীসের আলোকে নিজেদেরই করা উচিত। বাইরের লোক খুব কমই পারিবারিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন, তার চেয়ে বেশী পারেন দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়াতে। এতে পরিবারের ক্ষতি ছাড়া ভাল কিছু হয় না। তবে পরিস্থিতি যদি দিন দিন খুবই খারাপের দিকে যেতে থাকে তাহলে এদিক সেদিক না বলে কোন ভাল ইসলামিক স্কলার বা উপযুক্ত ইসলামিক ফ্যামিলি কাউন্সেলরের সাথে পরামর্শ করা উচিত। সবসময় মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সকল সমস্যার উপযুক্ত সমাধান তিনিই দিয়ে রেখেছেন, প্রয়োজন শুধু উদ্যোগ নিয়ে সেই সমাধানটা খুঁজে বের করা।

স্বামীর বদনাম অন্য ভাবীদের নিকট না করা

আমরা কোন পাবিারিক অনুষ্ঠানে মহিলারা যখন এক সাথে হয়ে গল্প-গুজব করি বা অন্য কোন সময় মহিলারা এক সাথে বসে আড্ডা দেই তখন গল্পের তালে তালে নিজের স্বামীর গল্পও শুরু হয়ে যায়। এক সময় দেখা যায় যে ভাল গল্পের পাশাপাশি স্বামীর দোষ-ত্রুটিগুলোও অন্য মহিলাদের নিকট অনায়াসেই বলে ফেলছি। এভাবে যখন একজন শুরু করেন তার সাথে তাল মিলাতে গিয়ে অন্যরা এক এক করে স্বামীর বদনাম করতে থাকেন। কিন্তু নিজেরা এটা বুঝতে পারেন না যে তারা নিজেরা নিজেদের কত বড় ক্ষতি করে ফেলছেন। তাই এই বিষয়ে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

কোনো মহিলা তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দেয়া নিষেধ

কোনো মহিলা কর্তৃক তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলাদের দৈহিক বর্ণনা বা তার ধৈর্য, সহ্য ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া অনুত্তম। কেননা নারী পুরুষের আকর্ষণ

শরীয়াতসম্মত চিরন্তন। এ কারণেই জগতের স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সাথে মুহব্বত ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করে থাকে। এ অবস্থায় অন্য কোনো নারীর শারীরিক গুণাবলী ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ কোনো পুরুষের কাছে বলা হলে সে পুরুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছা উভয়ভাবেই নিজ স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে। যা শরীয়াত সমর্থিত নয়। তাইতো ইসলাম কোনো মহিলাকে তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার সৌন্দর্য ও গুণাবলী বর্ণনা করতে নিষেধ করেছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোনো নারী অপর মহিলার সাথে একত্রে থাকার পর তার স্বামীর নিকট এমনভাবে তার দৈহিক বর্ণনা পেশ করবে না যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে। (সহীহ আল বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোনো স্ত্রীলোক যেন অপর কোনো স্ত্রীলোকের খালি শরীর স্পর্শ না করে, যাতে সে তার শরীরে কমনীয়তা ও লাবণ্যতা সম্পর্কে তার স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে পারে। যার ফলে তার স্বামী তাকে দেখার জন্য আকৃষ্ট হতে পারে। (আবু দাউদ)

তৃতীয় অধ্যায়

সুখী পরিবার গঠনের উপায়

বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী বাছাই বা নির্বাচন পদ্ধতি

পাত্রের গুণাবলী

ইসলাম কন্যার পিতা বা অভিভাবকদের তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়ার জন্য সৎ ও আদর্শবান পাত্র নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছে। কোনোভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ নামে খ্যাত কন্যাদের পাত্র হিসেবে যে কাউকে নির্বাচন করা এবং পরবর্তী জীবনে তাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি দ্বন্দ্ব-কলহ সংঘটিত হওয়া মানবতার শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম সমর্থন করে না। তাই তো বিশ্ব নাবী মানবতার শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ কন্যাদের জন্য পাত্র নির্বাচনে নিম্নোক্ত গুণাবলীসমূহের প্রতি খেয়াল রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার দ্বীনদারী ও নৈতিক সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট সে যদি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তা না করো তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (জামে আত তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট সে যদি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে (তোমাদের পাত্রীর) বিয়ে দাও। যদি তা না করো তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। যদি তা না করো তবে সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তার মধ্যে কিছু (ত্রুটি) থাকলেও? তিনি বলেন। যার যার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্র তোমাদের মনঃপূত হয় সে যদি

তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিয়ে দাও। (রাবী বলেন) তিনি একথা তিনবার বললেন। (জামে আত তিরমিযী)

পাত্রীর গুণাবলী

অভিভাবক এবং পাত্র উভয়ে মিলে পাত্রী খুঁজতে ব্যস্ত। এখানে ঐখানে সর্বত্রই পাত্রের উপযোগী পাত্রী খুঁজে হয়রান। দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না। এ অবস্থায় অনেকেই মন্তব্য করে থাকে এমনিতে পাত্রী তো অনেক কিন্তু বিয়ের সময় যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্রী খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হলো কেমন পাত্রী খুঁজে বেড়ান অভিভাবক বা সম্ভাব্য পাত্ররা? আর নারীদের কেমন যোগ্যতা থাকা উত্তম? এ প্রসঙ্গে ইসলামের কোনো বক্তব্য আছে কী? হ্যাঁ ইসলাম যেহেতু মানবজাতির পরিপূর্ণ জীবনবিধান তাই মানবজাতির আদর্শ জীবন ধারায় এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা থাকবে না তাতো হতে পারে না। তাইতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে পুণ্যবতী স্ত্রীলোকের চাইতে অধিক উত্তম কোনো সম্পদ নেই। (সুনান ইবনে মাজাহ, সুনান আন নাসাঈ)

সওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সোনা-রূপা (মূল্যবান সম্পদ) পুঞ্জীভূত করে রাখার সমালোচনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হলে সাহাবায় কিরাম বলেন, তাহলে আমরা কোন সম্পদ ধরে রাখবো ঃ উমার (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন আমি তা জেনে তোমাদের বলে দিবো। অতঃপর তিনি তার উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন। আমিও তার পিছনে গেলাম। তিনি বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করবো? নাবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন অর্জন করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা এবং আখিরাতের কাজে তাকে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী। (সুনান ইবনে মাজাহ)

নাবী ﷺ বলতেন ঃ কোনো মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহভীতির পর উত্তম যা লাভ করে তা হলো পুণ্যময় স্ত্রী। স্বামী তাকে কোনো নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে; সে তার দিকে তাকালে (তার রূপ-সৌন্দর্য) তাকে আনন্দিত করে এবং সে তাকে শপথ করে কিছু বললে সে তা পূর্ণ করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সম্ভ্রম ও স্বামীর সম্পদের হিফাযত করে। (সুনান ইবনে মাজাহ)

একদা রসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো, কোন মহিলা উত্তম? তিনি বললেন ঃ যে মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। সে আদেশ করলে তা সম্পন্ন করে এবং তার বাড়ির ও তার সম্পদের ব্যাপারে যা অপছন্দ করে, সে তার বিরোধিতা করে না। (সুনানু নাসাঈ শরীফ)

এই হাদীস অনুসারে সর্বোত্তম নারীর যে কয়টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা হলো ঃ

১. পুণ্যবতী এবং আল্লাহভীতিসম্পন্ন নারী পৃথিবীর সকল সম্পদের চেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

২. যে সকল নারী শরীয়াত সম্পন্ন আদেশ নির্দেশ মেনে চলার মতো মনোভাব পোষণ এবং আত্মমর্যাদা তথা নিজের ইজ্জত সম্ভ্রম সংরক্ষণে সোচ্চার সে সকল নারী উত্তম।

৩. স্বামীর পছন্দের মূল্যায়ন এবং কোনো কিছুর ব্যাপারে বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা করে না, কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সে বিষয়ে কথা বলে না সে সকল মহিলাই উত্তম।

৪. যে সকল নারী ঈমানদার এবং আখিরাতকে সামনে রেখে দুনিয়ার জীবনে যখন যা পায় তাতেই শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তারা উত্তম।

ধর্মপরায়ণা নারী বিয়ে করা

ইসলাম পুরুষদের পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রীর যে দিকটি বেশী গুরুত্ব দেয়ার প্রতি তাকিদ দিয়েছে তা হলো পাত্রীদের ধর্মপরায়ণতা। কেননা ইসলাম মনে করে যে সকল পাত্রীরা মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে সে সকল নারীরা স্বামীর প্রতিও হবে কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্য-সবরকারী। তারা ইসলামী জীবনবিধান মেনে জীবনধারণ করার চেষ্টা করে ফলে তাদের সংস্পর্শে পরিবার অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়। এ জন্যেই রসূল ﷺ ধর্মপরায়ণা নারীকে বিয়ে করার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ চারটি বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীদের বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার ধর্মপরায়ণতা। অতএব তুমি ধর্মপরায়ণা নারীর সন্ধান করো। অন্যথায় তোমার দুই হাত ধূলি ধুসরিত হোক। (সুনান ইবনে মাজাহ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শুধু রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নারীদের বিয়ে করো না। এই রূপ-সৌন্দর্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণও হতে পারে। তোমরা শুধু সম্পদের মোহেও নারীদেরকে বিয়ে করো না। হয়তো এই সম্পদই তাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। অতএব ধর্মপরায়ণতা বিবেচনায় তোমরা তাদের বিয়ে করো। চেপ্টা নাকবিশিষ্ট কুৎসিত দাসীও অধিক উত্তম যদি সে হয় ধর্মপরায়ণা। (সুনান ইবনে মাজাহ)

বর্তমানের বিয়ের অনুষ্ঠানাদি ও কার্যক্রম অনৈসলামিক

বিয়ের অনুষ্ঠানসহ বিয়ের আগে ও পরে নানা ধরণের শরীয়াত বিরোধী কার্যক্রম আজ সমাজে চালু হয়ে আছে। সমাজে পর্দা প্রথা যথাযথভাবে চালু না থাকার কারণে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও মিডিয়ার উন্নতির কারণে ফটোগ্রাফী ও ভিডিও ব্যবস্থার প্রচলনে আরো নতুন নতুন বহু প্রথা আজ প্রতিনিয়ত চালু হচ্ছে। বিয়ের পূর্বে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের নামে পাত্র ও পাত্রীর বাড়িতে যে সমস্ত কর্মকান্ড ঘটে থাকে তা রীতিমত শরীয়াতের বিধি-বিধানকে বলি দেয়ার শামিল। সেই সাথে বিয়ের এক/দুইদিন পূর্বে পাত্রীর বাড়িতে পাত্রীর গায়ে হলুদের নামে হলুদ সরঞ্জামাদি ও শাড়ি কাপড় ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার মহড়া অনুষ্ঠানে যেভাবে যুবক-যুবতী ও বাড়ির বউ তথা পাত্রের ভাবীদের সম্মিলন ঘটানো হয়; বিভিন্ন প্রেম-ভালোবাসার গান গাওয়া হয়, তা রীতিমত অনৈসলামিক।

এখানেই শেষ নয়। এমন মাখামাখি দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি ভিডিওতে ধারণ করে বিয়ের পরও বহুদিন পর্যন্ত সবাই এক সাথে বসে এসব প্রোগ্রাম টেলিভিশনের পর্দায় দেখে আর আনন্দ উপভোগ করে। এবার গায়ে হলুদের এ পর্ব শেষ হলে আসে বিয়ের দিন। বিয়ের দিন পাত্রীর বাড়িতে প্রবেশ পথে গেট সাজানো এবং গেটে যুবক ও যুবতীদের ফ্রী মিক্সিংয়ে বরের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। তারপর তাদের দাবি পূরণ তথা টাকার বিনিময়ে বরকে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। এখানেও ঠিক তাই এক শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা একথা ওকথাসহ ছবি উঠানোর ধুম আর ভিডিও করার হিড়িকে ইসলামী শরীয়াতের বিধি-বিধান যেন বাধাগ্রস্ত।

বাড়ির প্রধান বা মুরব্বীদের দাবি ছেলে-মেয়েরা একটু আনন্দ ফুর্তিতো করবেই। কিন্তু এ আনন্দ ফুর্তির নামে ছেলে-মেয়েরা যে পাপ কাজে জড়িয়ে

পড়ছে তাতে তাদের খেয়াল নেই- যা দুঃখজনক। এবার বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর বর দাঁড়িয়ে বিয়ের মজলিসে উপস্থিত সকলকে সালাম দেয়া এবং সবার সাথে মুসাফাহা করা এটা ইসলামী শরীয়াতে ভিত্তিহীন একটি প্রথা। যা কুসংস্কার হিসেবেই পরিত্যাজ্য।

এরপর নতুন বধূর মুখ দেখার উদ্দেশ্যে তার কক্ষে গমণ ও ভিডিওগ্রাফীর দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের অবাধ বিচরণ ইসলাম ও নৈতিকতা বিরোধী। এভাবে পর পুরুষসহ সবাই মিলে নতুন বধূর মুখ দেখা শরীয়াতের স্পষ্ট লঙ্ঘন। সেই সাথে বেপর্দা ও অবাধ মেলামেশার কারণে নারী পুরুষের বৈধ বিয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে আজ বিলীন হতে চলছে। যখন কোনো জিনিস সহজেই হাতের নাগালে পাওয়া যায় তখন সে জিনিসের প্রতি যে দুর্বার আকর্ষণ থাকার কথা তা কমে যাওয়া স্বাভাবিক। সে কারণেই যুবক-যুবতী বিয়ের বন্ধনের চেয়ে মুক্ত জীবনে যৌন অনাচারে লিপ্ত হতে বেশী উদ্যোগী ও উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। ফলে এতকিছু রীতি-নীতি ও কু-প্রথার আড়ালে স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ে-শাদী হয়ে পড়ছে বাধাগ্রস্ত। আজকের সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কারণে বিয়ে মানে অনেক খরচ, অনেক ভারী বোঝা- যা সম্পূর্ণ ইসলামের বিপরীত।

বাসর রাতের আদব

যখন একটি ছেলে এবং মেয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তারা সাধারণতঃ বাসর রাতের আদব সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে না। এই নতুন জীবনের শুরুটি হওয়া উচিত রসূল ﷺ -এর সুন্নাহ মোতাবেক এবং সুখী জীবনযাপনের জন্য সেখানে মহান আল্লাহ তা'আলার রহমত অবশ্যই আশা করা উচিত।

বাসর রাতে শরীয়ত সম্মত কাজ হচ্ছে, নববধুর কপাল ধরে এই দু'আ পাঠ করা। নাবী কারীম ﷺ বলেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো নারীকে বিবাহ করে (তার সাথে প্রথম মিলনের প্রারম্ভে) তখন সে যেন এই দু'আ পাঠ করে-

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খইরহা-ওয়া খইরমা- জাবালতাহা- 'আলাইহি ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ শাররিহা-ওয়া মিন্ শাররিমা-জাবালতাহা 'আলাইহি।

"হে আল্লাহ! আপনার কাছে এর কল্যাণ এবং একে যে স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় কামনা করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং একে যে স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে।" (আবু দাউদ)

এরকম করলে স্ত্রী ভীত হবে বা অপছন্দ করবে এমন আশংকা থাকলে তার নিকটবর্তী হওয়ার ভান করে আলতো করে কপালে হাত রাখবে এবং তাকে না শুনিয়েই চুপে চুপে উক্ত দু'আটি পাঠ করবে। কেননা ইসলামী জ্ঞানে অজ্ঞ থাকার কারণে কোন কোন নারী এরকম মনে করতে পারে যে, আমার মধ্যে কি অকল্যাণ আছে? এতে সে বিষয়টিকে অন্য খাতে নিতে পারে। সুতরাং ঝামেলা এড়ানোর জন্য নিরবে ও না জানিয়ে এই দু'আ পাঠ করাই ভাল।

নোট ঃ বাসর রাতে দু'রাকআত সলাত আদায় করার যে নিয়ম প্রচলিত আছে এ সম্পর্কে কোন হাদীস নেই।

নারী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

পুরুষ এবং নারী সমাজের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামাজিক এবং সামষ্টিক জীবনের সুষ্ঠুতা এবং উন্নতি একান্তভাবে নির্ভর করে এদের সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। নারী যেমন পুরুষ হতে পারে না তেমনি পুরুষও কখনও নারী হতে পারে না। উভয়ের রয়েছে পরস্পর বিরোধী দেহাবয়ব, আকার-আকৃতি, শক্তি ও যোগ্যতা। একই স্থানে, একই আবহাওয়া ও একই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও নারী এবং পুরুষের স্বভাব প্রকৃতি মনস্তাত্বিক দিক থেকে পার্থক্য এতবেশী, যত না পার্থক্য দুনিয়ার দু'প্রান্তে বসবাসকারী পুরুষের মধ্যে। কারণ gender বা লিঙ্গের পার্থক্য অত্যন্ত মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা এই পার্থক্য অতিক্রম করা কখনো সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নারী এবং পুরুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণেই প্রত্যেক স্ব স্ব যোগ্যতা এবং প্রতিভা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র বাছাই করে নেবে এটাই ইনসাফের দাবী। এজন্যেই প্রকৃতি নারী এবং পুরুষের মধ্যে তাদের যোগ্যতা এবং স্বভাব অনুযায়ী কর্মবন্টন করে দিয়েছে। একজন ইঞ্জিনিয়ারকে যেমন রোগীর চিকিৎসা করতে দেয়া হয় না, তেমনই একজন ডাক্তারকেও কোন শিল্পকারখানার কাজে লাগানোর চিন্তা

অবাস্তব। একজন ডাক্তার বড় না একজন ইঞ্জিনিয়ার বড় এ প্রশ্নও অযৌক্তিক। এখানে যে যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ।

নারী এবং পুরুষ মিলেই গঠিত হয় সমাজ। সমাজে এক অংশের প্রতিনিধি নারী, অন্য অংশের প্রতিনিধি হচ্ছে পুরুষ। শুধু পুরুষ যেমন একটা সমাজ গড়তে পারে না তেমনি শুধু নারীর পক্ষেও সম্ভব নয় একটা সমাজ গড়া। স্বয়ং স্রষ্টাই নারী ও পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক ও মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। এই মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরতা সামাজিক, যৌন, মনস্তাত্বিক সবদিক দিয়েই। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠুতা ও উন্নতি-অগ্রগতি একান্তভাবে নির্ভর করে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সুষ্ঠু ও সঠিক হওয়ার উপর। আর এ সম্পর্ক যদি ভারসাম্যহীন হয় তাহলে সমাজ সর্বাত্মকভাবে ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

আল্লাহ এই নারী এবং পুরুষ জাতি সৃষ্টি করে তাদের জন্যে জীবন চলার বিধি-বিধানও দিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ম লংঘন করলে মঙ্গলতো কখনও আসবেই না, বরং ডেকে আনবে সমূহ বিপদ। পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই কিছু অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি রয়েছে যা নারী সংগ ছাড়া পূর্ণ হবার নয়। অনুরূপভাবে নারীর ত্রুটিসমূহের সম্পূরক কেবলমাত্র পুরুষই। এজন্যেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

"তারা (স্ত্রীগণ) হচ্ছে তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) হচ্ছ তাদের জন্যে পোশাক।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

মুসলিম নারী হিসেবে আমার করণীয়

যে ব্যক্তি ডাক্তার হবার সিদ্ধান্ত নিল সে এ উদ্দেশ্যে সফল হবার জন্য যা দরকার সবই করবে। তেমনি যে মুসলিম হিসেবে চলার সিদ্ধান্ত নিল সে অবশ্যই এর জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা করবে। যদি তা না করে তাহলে একথা বুঝা যাবে যে সে মুসলিম হবার ইচ্ছা রাখে বটে কিন্তু এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। আর সিদ্ধান্ত না নিলে বুঝতে হবে যে তার ঈমান এখন চরম দুর্বল অবস্থায় আছে।

প্রথম ঃ মুসলিম হিসেবে প্রথম করণীয় কাজই হলো এ শপথ নেয়া যে, আমি আল্লাহর হুকুম ও রসূল ﷺ -এর তরীকার বাইরে চলব না। সব ব্যাপারেই আল্লাহ ও রসূল ﷺ যা পছন্দ করেন তা-ই করব এবং যা তাঁরা অপছন্দ করেন তা করব না। আমরা যে কালেমা তাইয়েবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" উচ্চারণ করি এর আসল মর্ম কিন্তু এটাই।

“সেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।” (সূরা আল মায়িদা ঃ ৪৪)

দ্বিতীয় ঃ দ্বিতীয় কর্তব্য হলো প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহর হুকুম ও রসূল ﷺ -এর তরীকা কী তা জানতে চেষ্টা করা। আমার খাওয়া-পরা ও চলাফেরা থেকে শুরু করে সব বিষয়েই আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর পছন্দ কী আর অপছন্দ কী তা জানতে হবে। না জানলে মুসলিম জীবন কী করে যাপন করব?

তৃতীয় ঃ তৃতীয় কর্তব্য হলো কোন ইসলামী মহিলা অর্গানাইজেশনের সাথে মিলে নিজের জীবনকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করা। একা একা এ পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যারা নিজেকে গড়ে তুলছে তাদের সাথে মিলে কাজ করেই এ পথে এগুতে হবে। যেমন ডিগ্রী নিতে হলে কলেজে ভর্তি হতে হয়। একা একা করা যায় না। তেমনি কোন সংগঠনের মাধ্যমেই মুসলিম জীবন গড়ে তুলতে হয় এবং এতে কাজটি আরো সহজ হয়ে যায়।

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

স্বামীর সাথে সম্পর্ক মজবুত করবো কিভাবে?

আমরা যারা বিবাহিতা তার সর্বপ্রথম সম্পর্ক হচ্ছে স্বামীর সংগে। স্বামীর সাথে আমাকে আমার জীবনের অর্জিত সমস্ত ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী কাজে লাগাতে হবে, তাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে স্বামীর হৃদয় জয় করতে হবে, তার সুখে দুঃখে সমভাগী হওয়া আমার একান্ত কর্তব্য।

মনে রাখতে হবে আমার স্বামীই হচ্ছেন আমার প্রথম লক্ষ্য। আমার দায়িত্ব তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। তিনি যদি আগে থেকেই সঠিক পথের অনুসারী হয়ে থাকেন তবে তাকে তার পথে অবিচল থাকাতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগানো আমার এ মুহূর্তের প্রধান কাজ। মনে রাখতে হবে, আমি চাইলে আমার স্বামীকে সহজেই সুপথে আনতে পারি কিংবা তাকে সুপথে রাখতে পারি। আমি যদি তাকে আমার বিলাস দ্রব্য, দামী শাড়ী, সোনা-গয়না ও অন্যান্য প্রসাধনীর জন্যে বাধ্য না করি, তাহলে স্বভাবতঃই আমার স্বামী হালাল রোজগারে উৎসাহ পাবেন। যদি আমি সর্বদা এসব জিনিসের জন্যে তাকে

উত্যক্ত করি তাহলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার স্বামী অন্যায় পথে পা বাড়াতে পারেন, আর এধরনের কিছু করলে তার দায়িত্ব সর্বাংশে কিন্তু আমাকেই বহন করতে হবে। সুতরাং সর্বপ্রথম আমি শপথ নেবো যে, আমি আমার স্বামীকে সুপথে রাখার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। কোনো স্বামীকে সুপথে রাখার জন্যে প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে তার স্ত্রী যে কাজটুকু করতে পারে, অন্য কারো পক্ষে তার শতাংশও করা সম্ভব নয়।

আমি আমার স্বামীর চিন্তাধারা বদলানোর ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা না করুন, তেমন কোনো স্বামী যদি ভাগ্যে থাকে তাহলেই আমাকে এ কাজ করতে হবে। আমি আমার যুক্তি প্রমাণ ও চরিত্র দিয়ে যদি একবার স্বামীর সামনে যথার্থভাবে ইসলামী আদর্শের ছবি তুলে ধরতে পারি তাহলে আমার পক্ষে এ কাজ করা অনেকটা সহজ হবে।

অনেক সময় এমনও দেখা গেছে, স্বামী বেচারা বিয়ের আগে থেকেই ভালো, সৎ ও দ্বীনদার, বিয়ে হয়েছে হয়তো কোনো তথাকথিত আধুনিকা নারীর সাথে। অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেলো স্বামীর দ্বীন, ঈমান, ধর্মকর্ম সবই শেষ হয়ে গেছে। আধুনিকা স্ত্রীকে খুশী রাখার জন্যে তিনি তার দ্বীন-ধর্ম সবই বিসর্জন দিয়েছেন।

আবার এমনও দেখা গেছে যে, স্বামী বিয়ের আগে ছিলো নিতান্ত বৈষয়িক, ধর্ম বিমুখ- ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মবিরোধীও। কিন্তু ন্যায়পরায়ণা সতী-সাধ্বী স্ত্রীর সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যেই তার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিলো। এ সবই সম্ভব একজন নারীর সাহায্যে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নারী স্বামীকে যেমন খারাপ করতে পারে তেমনি তাকে ভালো মানুষও বানাতে পারে। তাই আমাকে প্রতি মূহুর্তেই এ মৌলিক কথাটি স্মরণ রাখতে হবে।

অনেক পরিবারে দেখা যায় স্ত্রী কোন ইসলামিক প্রোগ্রামে যাক সেটা স্বামী পছন্দ করেন না। আবার স্বামী নিজেও কোন ইসলামিক প্রোগ্রামে যান না। অনেক স্বামীই আছেন অবসর পেলেই ঘরে বসে সারাক্ষণ হিন্দি মুভি আর নাটক দেখতে থাকেন। মনে রাখতে হবে সারাক্ষণ এই ধরনের আজেবাজে মুভি-নাটক দেখে ধীরে ধীরে আমাদের ব্রেইনে এক ধরনের অসুস্থতা ঢুকে যাচ্ছে যা একসময়ে গোটা পারিবারিক জীবনে নিয়ে আসবে অশান্তি। এক্ষেত্রে আমি স্ত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব আরো অনেক বেশী। আমাকে যে করেই হোক আস্তে আস্তে বাসায় একটা ইসলামী পরিবেশ তৈরী করতে হবে। ইবলিস (শয়তান)-কে বাসা থেকে তাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে ঘরে কোন ইসলাম

বিরোধী কাজ-কারবার হয় সে ঘরে আল্লাহর রহমত ও বরকত থাকতে পারে না। আসুন চেষ্টা করি স্বামীকে কিভাবে নামাজী বানানো যায়, তাকে নিয়মিত মসজিদে পাঠানো যায়। আসুন মাঝে মাঝে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে ঘরে জামাতের সাথে সলাত আদায় করি, নিয়মিত ইসলামিক ডিভিডি দেখি, কুরআন- হাদীসের আলোচনা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের নিয়তের কথা জানেন। কেউ যদি এভাবে জীবনকে সাজাতে চায় তাহলে অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য আসবে ইনশাআল্লাহ। ঘরে প্রকৃত শান্তি ফিরে আসবে।

একজন আদর্শ মা

একটি শিশু এসে একটি নারীর জীবনকে ধন্য করে তোলে। একজন মহিলা আর এক জীবনে পদার্পণ করেন মাতৃস্নেহ নিয়ে। প্রকৃত মা সেই, যে সঠিকভাবে সন্তান প্রতিপালন করেন। মা হওয়ার জন্য কেবল জন্মদাত্রী হওয়াই যথেষ্ট নয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন একজন মহিলা প্রেগন্যান্ট হন তখন তিনি এই বিষয়ের উপর কোন প্রকার পড়াশোনা করেন না। কিন্তু বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক। প্রেগন্যান্ট মা শুধু খাওয়া-দাওয়া নিয়েই চিন্তিত থাকেন আর কোন বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। নর্থ-আমেরিকায় প্রেগন্যান্ট মহিলাদের জন্য নানারকম কোর্স রয়েছে। যেমন ঃ Prenatal course, Post-natal course, Parenting course, Childcare course ইত্যাদি। এই বিষয়ের উপর বাজারে অনেক বই এবং ডিভিডি পাওয়া যায় যা প্রেগন্যান্ট হওয়ার আগ থেকেই পড়া ও দেখা শুরু করা উচিত। এছাড়া ইন্টারনেটে এ বিষয়ে প্রচুর সাইট রয়েছে যেখান থেকে ঘরে বসেও পড়াশোনা করা যেতে পারে। এতো গেল একজন সাধারণ মা'র কথা।

কিন্তু একজন মুসলিম মায়ের দায়িত্ব অন্যান্য মায়েদের চেয়ে আরো অনেক বেশী। সে ঐসকল পড়াশোনার পাশাপাশি আরো অতিরিক্ত পড়াশোনা করবেন কিভাবে তার সন্তানকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবেন, কিভাবে তার সন্তানের অন্তরে সঠিক দ্বীনের আলো ঢুকাবেন। সেজন্য প্রয়োজন ইসলামী শিশু সাহিত্য পড়া, আল কুরআনের তাফসীর পড়া, রসূল ﷺ -এর জীবনী পড়া, সাহাবাদের জীবনী পড়া। এছাড়া এখন ইসলামিক প্রচুর ডিভিডি পাওয়া যায় এবং ইন্টারনেট থেকেও আমরা অনেক ভিডিও দেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন

করতে পারি। প্রেগন্যান্ট অবস্থায় মায়েরা সাধারণতঃ অনেক সময় পান বা চাকুরীরত মায়েরা সন্তান জন্মের পর সাধারণতঃ বাসাই থাকেন। এই সময়ে মায়েরা ইসলামের উপর উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এতে অনেক মানসিক শান্তিও পেতে পারেন।

মায়ের গর্ভে সন্তান নাভীর মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণ করে তিল তিল করে বড় হতে থাকে। তাই মায়ের চরিত্রের যথেষ্ট প্রভাব সন্তানের উপর পরে। কোন মা যদি সলাতে নিয়মিত হয়ে না থাকি তাহলে এসময় থেকেই সলাতে নিয়মিত হয়ে যাওয়া উচিত। আমার মধ্যে যেসকল দোষ-ক্রটি রয়েছে সেগুলো এসময় থেকেই আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসা উচিত।

সন্তান মানুষ করা নারীর একটি প্রধান কাজ

সন্তান মানুষ করা বাবা ও মা দু'জনেরই দায়িত্ব। এখানে মায়ের ভূমিকাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথম ঃ ছেলেমেয়েরা বড় হবার সাথে সাথে তাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দানের চেষ্টা করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী না হওয়ায় এ দায়িত্ব আমাকে ঘরের ভেতরেই ব্যবস্থা করতে হবে। সন্তানের প্রথম বয়সেই আল্লাহ, রসূল, পরকাল ও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার একটি আন্তরিক আগ্রহ তার মনে সৃষ্টি করতে হবে। যদি বাল্য বয়সেই আমি এসব কথা তাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করাতে পারি, তাহলে সারাজীবন সে এর সুফল ভোগ করবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় ঃ ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করার সাথে সাথে তার জীবনেও ইসলাম প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে যেতে হবে। তাকে প্রথম বয়সেই সলাত, সিয়াম ও শরীয়তের অন্যান্য অনুশাসন মেনে চলার তাগিদ দিতে হবে। প্রথম বয়সে তাকে কুরআন শুদ্ধ করে তিলাওয়াতের শিক্ষা দিতে হবে এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাকে প্রতিদিন কুরআনের তাফসীর (অর্থসহ ব্যাখ্যা) এবং কিছু কিছু করে সহীহ হাদীসও পাঠ করাতে শুরু করতে হবে। এগুলোকে তার জীবনে যথাযথ প্রতিফলিত করার জন্যে আমাকেই সচেষ্ট হতে হবে।

তৃতীয় ঃ আমার ছেলেমেয়েদের সত্যিকার একজন মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে আমি তাদেরকে নাবী রসূলদের জীবনী, সাহাবাদের জীবনী, আখিরাতের

দৃশ্যসম্বলিত কথাবার্তা, অতীত মুজাহিদদের জীবন ও কর্ম শোনাতে পারি। এসব ইতিহাসের মাধ্যমে তাদের সত্যিকার মুসলিম করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তাদের বয়স, যোগ্যতা ও অনুধাবন শক্তিকে অবশ্যই সামনে রাখা দরকার। আমি যদি সাবধান ও সচেষ্ট হই তাহলে এভাবে নিয়মিত শিক্ষার মাধ্যমে তাকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছুই শিক্ষা দিতে পারবো, ইনশাআল্লাহ। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা, শঠতা ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করার অশুভ প্রতিক্রিয়াও আমি তাদেরকে জানাতে পারি।

চতুর্থ ঃ প্রতি মুহূর্তেই আমাকে একথা মনে রাখতে হবে যে 'আমার সন্তানের চিন্তা চেতনা, চরিত্র, আমার সন্তানের কাজকর্ম, আচার আচরণ, চালচলন উত্তম হওয়ার উপরই আমার নারী জনমের সবটুকু সার্থকতা নির্ভর করছে। আমি নিশ্চয়ই মহানাবী ﷺ -এর সে হাদীসটির কথা শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'মানুষ মরে গেলে তার আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়। যে তিনটি বিষয়ের সুফল তার মৃত্যুর পরও জারী থাকে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সু-সন্তান'। সু-সন্তান পৃথিবীতে রেখে গেলে মৃত্যুর পরও আমার কবরে আমার সন্তানের নেক আমলের সমপরিমাণ নেকী পৌঁছাতে থাকবে। আমার রেখে যাওয়া সু-সন্তান যতোগুলো ভালো কাজ করবে, তাদের দেখাদেখি আরো যারা তাদের অনুসরণে ভালো কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব আমিও পাবো।

ঠিক এভাবে যদি কেউ কু-সন্তান রেখে যান তাহলে তার পরিণামও একইভাবে তাকে ভোগ করতে হবে। আমার জান্নাতে যাওয়া-আমার জাহান্নামে যাওয়া থেকে মুক্তি লাভ করা বহুলাংশে নির্ভর করছে আমার সু-সন্তান অর্থাৎ খাঁটি মুসলিম সন্তান রেখে যাওয়ার উপর। শত চেষ্টা করার পরও যদি সন্তান মানুষ না হয় সেটা আল্লাহ দেখবেন তবে আমাকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যেতে হবে, হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না।

স্ত্রীর অধিকার

"**হে** মুসলিম জনতা! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহর কালামের সাহায্যে তাদের ভোগ করাকে নিজের জন্য হালাল করে নিয়েছ"। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

স্ত্রী তার স্বামীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু, জীবনসঙ্গিনী। তিনি স্বামীর শরীরের অংশ হয়ে গেছেন। তার সকল দায়দায়িত্ব এখন স্বামীর হাতে। তিনি স্বামীর শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাত্রী। বিপদে-আপদে স্বামী যখন দিশা হারিয়ে ফেলেন ঠিক তখনই স্ত্রী স্বামীকে প্রশান্তি দানে সহায়ক শক্তি। স্বামী তার রক্ষক (সূরা আল মায়িদা ঃ ৫)। বিয়ের মাধ্যমে দু'জনে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করলেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা। (সূরা নিসা ঃ ২৫)। স্বামী পছন্দ করেন আর না করেন কোন বিষয়ই আর একান্ত তার থাকবে না। একজন জীবনসঙ্গীনি এখন হতে স্বামীর বিভিন্ন বিষয়ে বৈধ অধিকারেই নাক গলাবেন। স্বামীর সুখ-দুঃখ সব কিছুতেই তিনি অংশীদার। তাকে এড়িয়ে চলার মধ্যে স্বামীর কোন কল্যাণ নেই। স্ত্রী সুন্দরী না কুৎসিত বিয়ের পর তা হিসাব করার কোন সুযোগ নেই, তিনি দ্বীনদার না বেদ্বীন তা না দেখে কিভাবে দু'জনে একটি দ্বীনদার পরিবার গঠন করতে পারা যায় সে প্রচেষ্টায় সময় ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার সাথে ভাল ব্যবহার। তিনি স্বামীর একান্ত নিকটজন এবং সবচাইতে ভাল ব্যবহারের হকদার। তার সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণে রেখে দুর্বলতাগুলোকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখাও তার অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। স্ত্রী স্বামীর সন্তানদের বুনিয়াদী শিক্ষিকা। স্বামী যখন রুজি-রোজগারে ব্যস্ত থাকবেন তখন সন্তানদের শিক্ষা, নৈতিকতা, দ্বীনসহ সকল মৌলিক বিষয়ের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন স্ত্রী। তাহলে বুঝতে পারছি যে কি পরিমাণ গুরুত্বের অধিকারী স্ত্রী। স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে অন্যতম হলো তাকে স্বামীর যাবতীয় বিষয়ে অংশগ্রহণ করানো। অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাকে অন্ধকারে না রাখা। বিশেষ করে সামাজিক, পারিবারিক, চাকুরী, পদোন্নতি, অবনতি, চাকুরীচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে তাকে অবহিত করা। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সময়গুলি যেন ভাল কাজে কাটে সে ব্যবস্থা করা। কুরআনের তাফসীর, হাদীসগ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য, শিক্ষণীয় গল্পের বই, সাহাবাদের জীবনী, শিশু শিক্ষার উপর বিভিন্ন বই, ইসলামিক সিডি-ডিভিডি ইত্যাদি দিয়ে নিজ ঘরে একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। অবসরে স্ত্রী যেন জ্ঞানার্জন করতে পারেন।

স্ত্রীর জন্য স্বামীর পিতামাতার স্নেহ ও ভালোবাসা নিশ্চিত করা উচিত। ইসলাম শ্বশুর-শাশুড়ীদের কোনভাবেই ছেলের বউয়ের সাথে খারাপ আচরণের অনুমতি দেয় না। স্বামীর পিতামাতা তার নিজ সন্তানকে যা ইচ্ছা তা বলার অধিকার রাখেন। তাদের সকল বৈধ নির্দেশ শুনতে ছেলে বাধ্য। কিন্তু গায়ের জোরে

স্বামীর পিতামাতার কোন অবৈধ নির্দেশ শুনতে স্ত্রী বাধ্য নন। সুতরাং সকলে তার নিজস্ব সীমার মধ্যে থেকে ভূমিকা পালন করলে শান্তি বজায় থাকে। স্ত্রীগণ যদি স্বামীর পিতামাতাকে নিজের পিতামাতার মত সম্মান করেন তা সকলের জন্য সুখকর। এতে সংসার একটি সুন্দর বাগানে পরিণত হবে। এতে সবচাইতে বেশী খুশী হবেন স্বামী। সুতরাং স্ত্রীগণও বিষয়টি বুঝে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনা করবেন।

স্ত্রীর পিরিয়ডকালীন সময় ঃ প্রকৃতগতভাবে এই সময় স্ত্রীর শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা ভাল থাকে না। এই সময় অনেক ভাল কিছুও ভাল লাগে না। মেজাজ থাকে খিটমিটে। তাই স্বামীর উচিত সেদিকে খেয়াল রাখা।

স্ত্রীর সাথে যা করা যাবে না

জীবন চলার পথে যদি কেবল সুখই আমাদের সাথী হয় তাহলে আমাদের জীবন ছন্দহীন, দীর্ঘ ও গতিহারা শুষ্ক নদীর মত রসকষহীন জীবন সেটা, কোন সুস্থ মানুষই সেটি চায় না। মানুষের এই ঘটনাবহুল জীবনে চড়াই উৎরাই আছেই। চলার পথে হোঁচট খাওয়া এবং উঠে দাঁড়ানো ইত্যাদিই আমাদের জীবনকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের রাজ্যে যখনই কোন দুর্যোগ দেখা দেয় তখন স্বামীকেই কান্ডারীর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতেই হবে। স্বামীকে প্রথমে জেনে নিতে হবে তার স্ত্রীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি। তিনি কি কি গুণের অধিকারিণী? তার সীমাবদ্ধতাগুলি কি কি? তার সহ্য ক্ষমতা কতটুকু? তিনি কী বেশী পছন্দ করেন? কী অপছন্দ করেন? ইত্যাদি। স্বামীকে এ বিষয়গুলি ভালভাবে জেনে নিতে হবে ও দুর্যোগের সময় একজন চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে এটাও একটি যে স্বামী তাকে কখনো শারীরিক আঘাত করবেন না। গালাগাল দেবেন না। তার দ্বারা যদি কিছু ভুল হয়ে যায় তাহলে ষাঁড়ের মত চিৎকারে কোন কল্যাণ নেই। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত নয়, সুযোগ খুঁজতে হবে। স্থান, সময় ও মেজাজ নাগালে পেলেই সুন্দর কিন্তু গভীর মেজাজের সাথে বলে দিতে হবে তিনি কি ভুল করেছেন। তিনি যদি নিজেকে শোধরে চলেন তাহলে সবার জন্য বিষয়টা ভাল। আর যদি ভুলটাই চালিয়ে যেতে চান তাহলে এটা কারো জন্যই মঙ্গলকর নয়। তবে আশা করতে হবে যে তিনি তার ভুল শোধরে নেবেন। এভাবে সমস্যাটার যুক্তিযুক্ত সমাধান

হয়ে যাবে, কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকবে না, ইনশাআল্লাহ। কখনো তাকে চ্যালেঞ্জ দিতে যাওয়া উচিত হবে না অথবা তার কোন চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করা যাবে না। স্ত্রীকে নিয়মিতভাবে বলা উচিত যে তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি। এবং সেই ভালোবাসার প্রকাশও থাকতে হবে সময়ে-অসময়ে স্ত্রীকে নানা গিফ্ট (উপহার) দান করে। স্ত্রীদেরও উচিত স্বামীকে এমনি উপহার দেয়া। এ কথার মধ্যে এমন যাদু আছে যা অন্য কোন টেকনিক অবলম্বনে সফল হওয়া যায় না।

স্বামীর যেসব গুণাবলীর কারণে স্ত্রীরা তাদের বেশী ভালোবাসেন

আমরা জানি, আমাদের মাঝে সে ব্যক্তি ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো। একজন পুরুষ ভালো জীবনসঙ্গী হিসেবে তার স্ত্রীর কাছে ভালো স্বামী হতে পারেন নানান উপায়ে। স্ত্রীর কাছে স্বামীরা যেসব গুণাবলীর কারণে ভালো হয়, তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়, তার মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু গুণ হলো ঃ

১. স্ত্রীর প্রতি তিনি সুন্দর ব্যবহার করেন। উত্তম শব্দ ব্যবহার করে কথা বলেন। তার প্রতি তিনি নম্র ও দয়ার্দ্র থাকেন।
২. জীবনসঙ্গিনীর অধিকারের বিষয়গুলো তিনি অবহেলা করেন না, তা পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে চেষ্টা করেন।
৩. বাইরে নানান কাজে থাকলেও অন্য কোন মহিলার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হন না। দৃষ্টিকে সংযত রাখেন, হৃদয়কেও অত্যন্ত সচেতনভাবে সতর্ক রাখেন।
৪. নিজে ইসলাম শিখেন নিয়মিত, স্ত্রীকে নিয়ে শিখেন এবং তাকে উৎসাহিত করেন। দু'জনে মিলে ইসলাম পালনের চেষ্টা করেন।
৫. জীবনসঙ্গিনী যখন খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যায়, তিনি শক্ত অবলম্বন হয়ে তার পাশে থাকেন।
৬. যদি তার স্ত্রী কখনো তাকে কষ্ট বা আঘাত দিয়ে ফেলে, তিনি নিজেকে শান্ত রাখেন। খেপে যান না কেননা তিনি ধরে নেন যে স্ত্রী হয়ত তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দিতে চাননি, অসতর্কতায় এমনটি হয়ে গেছে।
৭. জীবনসঙ্গিনীর ছোট ছোট ভুলগুলো তিনি এড়িয়ে যান এবং তার ভালো কাজগুলোকে উৎসাহিত করেন। তার পরিশ্রমের কাজগুলোর ব্যাপারে প্রশংসা করেন।

৮. ঘরের কাজগুলোতে স্ত্রীকে সাধ্যমত সাহায্য করেন। তার জন্য কোন কাজ ফেলে রাখেন না।

৯. সন্তানদেরকে ইসলামী জ্ঞানে এবং আচরণে অভ্যস্থ করার ব্যাপারে সচেতন থাকেন। সন্তানদের ইসলামী আকীদা নিয়ে গড়ে তোলা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আলাপ করেন স্ত্রীর সাথে।

১০. কোন কারণে মনোমালিন্য হলেও ঘরের বাইরে কখনো দু'জনে আলাদা হন না, স্ত্রী বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে সবসময় তাকে সঙ্গ দেন। মাঝে-মাঝেই দু'জনে মিলে বেড়াতে যান যেন স্ত্রী কিছুটা সময় তার সঙ্গ পেয়ে আনন্দিত হন যা তাদের সম্পর্ককে আরো গাঢ় করবে।

যে বিষয়গুলো দাম্পত্য জীবনকে অশান্তিময়, দুর্বল এবং অকার্যকর করে

১) খারাপ ব্যবহার করা ঃ তাকে এমন কিছু নিয়ে ঠাট্টা করা যাতে সে মানসিকভাবে আহত হয়। এমন কোন ধমক দেয়া যাবে না যাতে সে অপমানিত বোধ করে।

২) উপেক্ষা করা ঃ তার পছন্দ, ভালোলাগা কিংবা তার কথাবার্তাকে গ্রাহ্য না করা বা গুরুত্ব/পাত্তা না দেয়া। স্ত্রীর সংগে চেঁচিয়ে অথবা প্রভুসুলভ কথাবার্তা দু'জনের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করে।

৩) মিথ্যা বলা ঃ কিছুতেই মিথ্যা বলা ঠিক নয়। মিথ্যা পারস্পারিক বিশ্বাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

৪) কথা দিয়ে কথা না রাখা ঃ কথা দিয়ে কথা রাখা বা ওয়াদা রক্ষা করা একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। বিষয়টি দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৫) সন্দেহ ও গীবত করা ঃ কখনো সন্দেহ করা ঠিক না। সন্দেহ পারস্পরিক সম্পর্ককে ধ্বংস করে। জীবনসঙ্গী খুব কাছের মানুষ এটা সত্যি। কিন্তু তার খুঁত ধরে যদি তার বিষয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে হতাশ হতে হবে। সম্পর্ক ক্রমে বিষাক্ত হয়ে পড়বে যার প্রভাব সন্তানদের উপরেও পড়বে।

৬) সালাত এবং অন্যান্য ইবাদত না করা ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে না, সলাত আদায় করে না অথবা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে না, আল্লাহ তার

প্রতি সন্তুষ্ট নন। নিয়মিত সলাত আদায় না করা, অশ্লীল কাজ, হারাম উপার্জনগুলো থেকে সরে না আসার কারণে অনেক সংসার ভেঙ্গে গেছে। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে অলসতা-উপেক্ষা করার কারণে মুসলিম সংসারে অত্যন্ত দ্রুত ভাঙ্গন ধরে যায়।

৭) খুব বেশী ব্যস্ততা ঃ খুব বেশী ব্যস্ততা ভাল নয়। তার প্রতি স্বামীর কর্তব্য রয়েছে, কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কিছুটা সময় তিনি পাওয়ার অধিকার রাখেন। এই বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত।

৮) স্ত্রী হিজাব করতে চাইলে অথবা ইসলামী বিধান মেনে চলতে চাইলে তাকে বাধা না দেয়া।

৯) স্বামীর কোন বদঅভ্যাস স্ত্রী তাকে ত্যাগ করতে বললে তার উপর রাগ না করে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া। যথা, মদ-সিগারেট, জুয়া খেলা, Internet-এ Chatting, Pornography, অকারণে অনেক রাত পর্যন্ত ঘরের বাইরে থাকা, বাজে খরচ করা, আত্মীয়-বন্ধুদের সংগে প্রতিযোগিতামূলক খরচ করা ইত্যাদি।

স্বামী-স্ত্রীর একান্ত মুহূর্ত

স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে শুধু তৃপ্তি উপভোগই নয়; বরং তাতে সওয়াবও রয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

“তোমাদের স্ত্রী-সহবাস করাও সদাকা। সাহাবাগণ বললেন, ‘হে রসূল! আমাদের কেউ যদি স্ত্রী-সহবাস করে নিজের আনন্দ আহরণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?’ তিনি বললেন, কি অভিমত তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে সহবাস করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? [নিশ্চয় হবে] অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে [স্ত্রী-সহবাস করে] নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।” (সহীহ মুসলিম)

স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের চাহিদা একে অপরের উপর বৈধ অধিকার এবং এই অধিকার পুরণে একে অপরের প্রতি সচেতন থাকা উচিত। এই বিষয়ে authentic বই থেকে কিছু পড়াশোনা করা উচিত। সফল এবং তৃপ্তির জন্য বৈধ কৌশল অবলম্বন করা উচিত। অনেক সময় স্ত্রীরা এ বিষয়টাকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না এবং নানারকম অজুহাত দিয়ে থাকেন যেমন ঃ আজকে ঠান্ডা,

এখন লজ্জা করছে, এখন ভাল লাগছে না, এখন গোসল করতে পারবো না, মাথার চুল ভিজা থাকবে, ফযর সলাত আছে, সকালে অফিস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ বিষয়ে স্ত্রীর চাহিদা না থাকলেও স্বামীর কথা চিন্তা করে তার চাহিদা পুরণ করা উচিত কারণ এটা তার হক (যদি স্ত্রী অসুস্থ না থাকেন)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে আহ্বান করবে, তখন সে যেন [তৎক্ষণাৎ] তার নিকট যায়, যদিও সে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে।" (তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন ঃ "যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে [স্বামী] তার প্রতি নারাজ (অসন্তষ্ট) অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশতাগণ তাকে [স্ত্রীকে] সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "তিন ব্যক্তির সলাত তাদের কান অতিক্রম করে না- পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ না সে তার মালিকের নিকট ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে (যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে), এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম যাকে লোকেরা অপছন্দ করে।" (তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমাদানের সিয়াম ছাড়া একটি দিনও [নফল] সিয়াম পালন না করে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সূরা রূমের ২১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ *"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"*

সতর্কতা ঃ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নতুন বিয়ের পর কয়েক বছর স্বামী-স্ত্রীর খুব মিল-মহব্বত থাকে, নিয়মিত সহবাস করেন। কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পর স্ত্রী বাচ্চাকে নিয়ে এতোই বেশী মনযোগী হয়ে পরেন যে স্বামীর দিকে খুব একটা বেশী খেয়াল করেন না। সন্তানের মা, বাবার চেয়ে বাচ্চার দিকে বেশী খেয়াল করেন এটাই প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু এক্ষেত্রে সংসারের শান্তির জন্য

ব্যালেন্স রক্ষা করে চলতে হবে, কোনভাবেই যেন ব্যালেন্স নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আবার স্ত্রী নানারকম সাংসারিক কর্ম-কান্ডে এতো বেশী মনযোগী হয়ে পরেন যে স্বামীর সহবাসের চাহিদার দিকে খেয়াল করেন না। তবে স্বামীরও উচিত স্ত্রীর সহবাসের চাহিদার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা। তাই সবদিকেই ব্যালেন্স প্রয়োজন, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান-সংসার নিয়েই সুখের পরিবার।

নেগেটিভ দিক ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীর কাছ থেকে তার ইচ্ছেমত সহবাসের সুখ না পায়, তাহলে সে হয়তো বা অনাসক্ত হয়ে পড়তে পারে। তবে স্বামীরও এতো অল্পতে ধৈর্যহারা হলে চলবে না, ধৈর্য ঈমানের অংশ। আরো অনেক সহনশীল হতে হবে। স্ত্রীর সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"তোমরা যিনার নিকটবর্তী হইও না। নিশ্চয়ই তা একটি বেহায়া পন্থা এবং অসভ্যতার দিকে যাওয়ার মতো একটা খারাপ রাস্তা।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২)

যিনা কী? যিনা আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো বিয়ে বর্হিভুত নরনারীর মধ্যকার অবৈধ সম্পর্ক। বিভিন্ন উপায়ে নারী এবং পুরুষের মধ্যে যিনা সংগঠিত হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১) খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো চোখের যিনা (জীবন্ত মানুষ বা পর্ণগ্রাফী)।
২) খারাপ মনে কারো কণ্ঠস্বর শোনা কানের যিনা।
৩) খারাপ মনে কাউকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের যিনা।
৪) খারাপ মনে কারো দিকে দুই পা অগ্রসর হওয়া পায়ের যিনা।
৫) খারাপ মনে কারো সঙ্গে কথা বলা জিহবার যিনা।
৬) খারাপ মনে কারো কথা মনে মনে চিন্তা করা মনের যিনা।
৭) খারাপ মনে কারো সঙ্গে ইমেইল, চ্যাটিং বা ফেইসবুকের মাধ্যমে বন্ধুত্ব করা হাতের ও মনের যিনা।
৮) খারাপ মনে কাউকে এস.এম.এস/টেক্স্ট পাঠানো হাতের ও মনের যিনা।

স্ত্রীসহবাসের পূর্বে দু'আ

"বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্ব-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্ব-না মা-রযাক্বতানা।"

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (আমরা মিলিত হচ্ছি), হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে প্রদান করবে তার নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখ । (সহীহ বুখারী)

স্ত্রী সহবাসের সময় উপরোক্ত দু'আটি পড়তে হয় শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং এটা সুন্নাহ ।

স্ত্রী সহবাসের নিয়ম

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান! কখন উলঙ্গ হবে না । কারণ, তোমাদের সংগে যারা আছে (ফিরিশতা) তারা কখনও তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন না, মলত্যাগ ও সহবাসের সময় ব্যতীত । (জামে আত তিরমিযী)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সামনে উলঙ্গ হওয়া বৈধ । তবে যখন তখন একে অপরের সামনে উলঙ্গ হওয়া ঠিক নয় । এতে ফিরিশতারা চলে যায় এবং দিন দিন একে অপরের প্রতি আকর্ষণও কমে যায় ।

সহবাসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তৃপ্তি লাভ করে থাকে । এটা শুধু একজনের আনন্দের বিষয় নয়; বরং দু'জনেরই এতে আনন্দ লাভের অধিকার রয়েছে । তাই স্বামীর উচিত স্ত্রীর পূর্ণ তৃপ্তির দিকে খেয়াল রাখা । স্বামী-স্ত্রী তাদের একান্ত সুখের জন্য যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে আসন পরিবর্তন করে সহবাস করতে পারবেন শুধু স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সহবাস করা যাবে না । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্র স্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশী সেভাবে গমণ কর এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যত রচনার জন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ কর ।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৩)

ফরয গোসল

স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের পর অবশ্যই ফরয গোসল করতে হবে । ফরয গোসলের নিয়ম হচ্ছে, গোসলের আগে ওযূ করে নিতে হবে শুধু পা ধোয়া ব্যতীত এবং গোসলের পর পা ধুয়ে নিতে হবে । যদি ঐ মুহূর্তে কোন কারণে গোসল করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততপক্ষে সম্পূর্ণরূপে ওযূ করে নিতে হবে এবং পরে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল সেরে নিতে হবে । এই ফরয গোসল ব্যতীত কোন সলাতই আদায় করা যাবে না ।

পিরিয়ড অবস্থায় স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ *"আর তারা তোমাকে (স্ত্রী লোকদের) হায়েয (পিরিয়ড) সম্মন্ধে প্রশ্ন করছে; তুমি বলে দাও যে, এটা হচ্ছে অপবিত্রতা, অতএব হায়েয অবস্থায় স্ত্রী লোকদের আলাদা কর এবং উত্তমরূপে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না; অতঃপর তারা পবিত্র হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক তোমরা তাদের নিকট গমণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাপ্রার্থীকে ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২২২)*

এই আয়াতে হায়েয (পিরিয়ড) অবস্থায় 'স্ত্রীদের হতে পৃথক থাক' এ কথার ভাবার্থ হচ্ছে সহবাস করো না। এছাড়া সকল কিছু বৈধ। মেডিক্যাল সায়েন্সের তথ্য অনুযায়ী এই অবস্থায় সহবাস করলে নানরকম জটিল যৌন রোগব্যাধি হতে পারে।

কাপড় বিহীন গোসল করা

নাবী ﷺ যখন গোসল করতেন তখন পর্দা করে নিতেন। (সহীহ বুখারী)

এবং তিনি সকলকে পর্দা করে গোসল করার নির্দেশ দিতেন। (আবু দাউদ)

রসূল ﷺ কেন নিষেধ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা স্পষ্ট। কারণ তৎকালে গোসলখানাগুলো এমন জায়গায় বানানো হতো যেখানে পানি সহজলভ্য ছিল এবং গোসলখানাগুলো ছিল উন্মুক্ত, বাড়ির বাইরে এবং অনেকের জন্য কমোন। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই। সবার বাসা বা এপার্টমেন্টে প্রাইভেট বাথরুম এবং বাথরুমের মধ্যেও আবার special shower arrangement। তাই এই ধরণের বাথরুমে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা যেতে পারে, তাতে দোষের কিছু নেই। গোসলের সময় ছেলে ছেলেদের সামনে এবং মেয়ে মেয়েদের সামনে উলঙ্গ হতে পারবে না।

নাভির এবং বোগলের নিচের লোম পরিষ্কার

আনাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন ঃ আমাদের জন্য গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম পরিষ্কার করা এবং নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করার ব্যাপারে

সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে চল্লিশ দিন। (সহীহ মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের নিকট আকর্ষণীয় করে রাখা

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভাই তার স্ত্রীকে প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, সে (স্ত্রী) বাসায় সবসময় কাজের বুয়ার মতো কাপড়-চোপড় পরে থাকেন আর বাইরে কোথাও বের হওয়ার সময় ভাল ভাল ড্রেস পরে বের হন। আসলে এটা বেশীরভাগ পরিবারেরই একটা কমন দৃশ্য। অনেক মহিলারাই বাসায় স্বামীর সামনে সাজগোজ করেন না কিন্তু বাইরে যাওয়ার সময় সেজেগুজে বের হন! বিষয়টা অপ্রিয় সত্য হলেও গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। মহিলা সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) জীবনী পড়লে দেখা যায় যে, তাদের স্বামীরা যখন ঘরে আসতেন তখন তারা স্বামীর সামনে সেজেগুজে যেতেন, নিজেকে আকর্ষণীয় করে স্বামীর নিকট উপস্থাপন করতেন। রসূল ﷺ, তাঁর স্ত্রীগণ, এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) এবং তাঁদের স্ত্রীগণ হচ্ছেন আমাদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। একইভাবে স্বামীদেরও তার স্ত্রীর নিকট নিজকে আকর্ষণীয় করে রাখা উচিৎ। যেমন বাসায় স্ত্রীর সামনে ময়লা, পুরনো বা ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরে থাকাটা ঠিক নয়।

পুরুষদের পর্দা ঃ মহিলাদের যেমন পরপুরুষের নিকট পর্দা করা ফরয তেমনি পুরুষদেরও পরনারীর নিকট পর্দা করা ফরয। তবে পুরুষদের পর্দার নিয়ম মহিলাদের থেকে কিছুটা আলাদা। পুরুষদের সতর হচ্ছে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত তাই বলে তার কাপড় থাকা সত্ত্বেও শুধু সতর ঢেকে শরীরের অন্যান্য অংশ খোলা রাখাও ঠিক নয়। যাদের সত্যিই কাপড় নেই তাদের কথা ভিন্ন। নিম্নে পুরুষদের পর্দার কিছু নমুনা দেয়া হলো, যখন তারা বাড়ির বাইরে যাবেন তখন এই বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন ঃ

- ড্রেস এমন হওয়া যাবে না যা দিয়ে শরীরের ভিতরের অংশ দেখা যায়।
- ড্রেস এমন হওয়া যাবে না যা শরীর দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু শরীরের গঠন পরিষ্কার ফুটে উঠে।
- ড্রেস এমন প্রসিদ্ধ বা আকর্ষণীয় হওয়া যাবে না যা দেখে অন্য মেয়েরা আর্কষণ বোধ করতে পারে।

- দামী ব্র্যান্ডেড ড্রেস পরার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। আবার সামর্থ থাকলে গরিবী হালেও থাকা যাবে না।
- একজন ছেলে অন্য একজন ছেলের সামনে সতর খুলতে বা উলঙ্গ হতে পারবে না।
- একজন ছেলে অন্য একজন ছেলের পায়ের রানের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না।
- একটি ছেলে আরেকটি ছেলের দিকে কামুক দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না।
- দু'জন ছেলে এক বিছানাতে ঘুমানো নিষেধ।
- নাভির নিচে প্যান্ট, পায়জামা বা লুঙ্গি পরা যাবে না যদি উপরে কোন জামা না থাকে।
- নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়েদের সামনে খালি গায়ে যাওয়াটাও ঠিক নয়।
- আজকাল ছেলেরাও অন্য ছেলেদের দেখে আকর্ষণ অনুভব করে এবং মেয়েরাও অন্য মেয়েদেরকে দেখে আকর্ষণ অনুভব করে। কারণ এ যুগটা হচ্ছে লুত (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ অর্থাৎ গে-লেজবিয়ান সোসাইটি।
- বিশেষ করে ছেলেদের আকর্ষণীয় হাতের বাহু, পেশী বা মাসল্‌স, চেষ্ট, চুলের সৌন্দর্য্য ইত্যাদি কোনভাবেই প্রকাশ করা ঠিক নয়।

সতর্কতা অবলম্বন ঃ আজকাল অনেকে ফ্যাশনের অংশ হিসেবে খাটো সার্ট বা গেঞ্জি পরে থাকে। যখন তারা সলাতে সিজদায় বা রুকুতে যায় আর সার্ট খাটো হওয়ার কারণে তখন তাদের পিছন দিক থেকে সতর বের হয়ে পরে অর্থাৎ পাছার কিছুটা অংশ বের হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে সতর ঢাকা ফরয আর সলাতে তো অবশ্যই ফরয, সতর খুলে সলাত হবে না। তাই এই ব্যাপারে এক ভাই অপর ভাইকে সকলের সামনে লজ্জা না দিয়ে একাকী ডেকে সতর্ক করে দেয়া উচিত। আজকাল এই বিষয়টা শুধু ছেলেদের ক্ষেত্রে নয় মেয়েদের ক্ষেত্রেও অহরহ দেখা যায় যা খুবই আপত্তিকর এবং হারাম।

স্বামী-স্ত্রীর জিদ্‌ মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ

জিদ্‌ ও হঠকারিতা পরিহার ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই একটি সাধারণ দোষ হচ্ছে জিদ ও হঠকারিতা। এ দোষ থেকে যথাসম্ভব উভয়কেই মুক্ত থাকতে চেষ্টা করতে হবে। কেননা দেখা গেছে যে কোনো সামান্য ব্যাপারও উভয়ের মর্জী ও মন-মেজাজের বিপরীত ঘটলেই তারা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। তখন তারা

যে কোনো বিপর্যয় ঘটাতে ত্রুটি করেন না। আর এতে করে পারস্পরিক সম্পর্কও খারাপ হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। দু'জনের মনই তিক্ত-বিরক্ত হয়ে যায় খুব সহজেই।

অবশ্য অপরিহার্য কোনো ব্যাপার হলে স্ত্রীর কর্তব্য অপরিসীম ধৈর্য সহকারে স্বামীকে বোঝানো। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রেম-ভালোবাসার অমৃত ধারায় স্বামীর মনের সব কালিমা ধুয়ে মুছে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা। তার বদলে রাগ করে, মুখ ভার করে, তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটি করে গোটা পরিবেশটাকে বিষাক্ত করে তোলা তার কখনও উচিত নয়। স্বামীকে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ দেখতে পেলে যথাসম্ভব শান্ত ও নরম হয়ে যাওয়া স্ত্রীর কর্তব্য, কারণ মহান আল্লাহ স্ত্রীদেরকে কিছু স্পেশাল পাওয়ার দিয়েছেন। আর নিজেদের মনের ঝাল মেটানো যদি অপরিহার্যই হয়ে পড়ে, তাহলে তা অপর এক সময়ের জন্যে অপেক্ষায় রেখে দেয়া যেতে পারে, পরে এমন এক সময় এবং এমনভাবে তা করতে হবে, যাতে করে পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুমাত্র তিক্ত হয়ে উঠবে না।

স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্বামীর খুব সতর্কতার সাথেই কাজ করা, কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্বামীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা নিজের সম্ভ্রম-মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে ফেটে পড়া কোনোমতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। স্ত্রীর কাছে কিছুটা ছোট হয়েও যদি পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা যায়, তবে স্বামীর তাই করা কর্তব্য। কেননা তাতেই তার ও গোটা পরিবারের কল্যাণ নিহিত। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে বলেছেন ঃ

"কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর বদমেজাজী ও তার প্রতি প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা-অবহেলা দেখতে পায় আর তার পরিণাম ভালো না হওয়ার আশংকা বোধ করে, তাহলে উভয়ের যে কোনো শর্তে সমঝোতা করে নেওয়াতে কোনো দোষ নেই। বরং সব অবস্থায়ই সমঝোতা-সন্ধি-মীমাংসাই অত্যন্ত কল্যাণময়।" (সূরা নিসা ঃ ১২৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ সমঝোতার ফলেই উভয়ের মনের মিল হতে পারে, পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায় তাই মোটামুটিভাবে অনেক উত্তম কাজ কিংবা তা অতীব উত্তম বিচ্ছেদ হওয়া থেকে, বেশী উত্তম ঝগড়া-ফাসাদ থেকে।

হাসিমুখে অভ্যর্থনা ঃ এ পরিপ্রেক্ষিতে একথাও উল্লেখযোগ্য যে স্বামী যখনই বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসেন, তখন স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে হাসিমুখে তাকে

অভ্যর্থনা করা - স্বাগতম জানানো। কারণ স্ত্রীর স্মিতহাস্যে বিরাট আকর্ষণ রয়েছে, যার দরুণ স্বামীর মনের জগতে এমন মধুভরা মলয়-হিল্লোল বয়ে যায় যে, তার হৃদয় জগতের সব গ্লালিমা-শ্রান্তি-ক্লান্তিজনিত সব বিষাদ-ছায়া তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়ে যায়। স্বামী যত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়েই ঘরে ফিরে আসুক না কেন এবং তার হৃদয় যত বড় দুঃখ, কষ্ট ও ব্যর্থতায়ই ভারাক্রান্ত হোক না কেন, স্ত্রীর মুখে অকৃত্রিম ভালোবাসাপূর্ণ হাসি দেখতে পেলে সে তার সব কিছুই নিমেষে ভুলে যেতে পারে।

কাজেই যেসব স্ত্রী স্বামীর সামনে গোমরা মুখ করে থাকেন, প্রাণখোলা কথা বলেন না স্বামীর সাথে, স্বামীকে উদার হৃদয়ে ও সহাস্যবদনে বরণ করে নিতে জানেন না বা করেন না, তারা নিজেরাই নিজেদের ঘর ও পরিবারকে, নিজেদেরই একমাত্র আশ্রয় দাম্পত্য জীবনকে ইচ্ছে করেই অশান্তিতে পরিণত করেন, বিষায়িত করে তোলেন গোটা পরিবেশটাকে। রসূলে কারীম ﷺ এ কারণেই ভালো স্ত্রীর অন্যতম একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ "স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয় (স্বামী স্ত্রীকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠে)।" [ইবনে মাজাহ]

ক্রোধ বা রাগ জীবনে নিয়ে আসতে পারে বড় ধরণের ক্ষতি

ক্রোধ সচ্চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায়। রাগ বা ক্রোধকে অবদমিত করে সহনশীলতা ও কোমলতা অবলম্বন করতে পারা আদর্শবান মানুষের একটি বিশেষ গুণ। ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে। শয়তান মানুষের চরম শত্রু। সে কারণে কখনো কেউ ক্রোধ বা রাগের বশীভূত হলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। কেননা ক্রোধ মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে তিরোহিত করে দেয়। ফলে ক্রোধ মানুষকে পাপাচার ও অনাচারে লিপ্ত করে। তাইতো আল কুরআনুল কারীম ও হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ক্রোধের অপকারিতা বর্ণিত হয়েছে এবং সহনশীলতা, ধৈর্য ও কোমলতার নীতি অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

"তাঁদের (মু'মিনদের) বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা ক্রোধকে হজম করে এবং লোকদের সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে চলে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

তারপর অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী লোকদের প্রশংসা করে বলেন ঃ *"এবং যখন তাঁরা ক্রোধান্বিত হয় তখন তাঁরা মাফ করে দেয়।" (সূরা শুরা ঃ ৩৭)*

হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ -কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ "রাগ করো না।" লোকটি কথাটি কয়েকবার বলল, নাবী ﷺ বারবার বললেন, "রাগ করো না।" (সহীহ বুখারী)

একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো, রাগকে সংবরণ করা। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করে। বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। শয়তান আগুনের তৈরী আর পানি আগুনকে ঠাণ্ডা করে দেয়। যদি কারো ক্রোধের উদ্রেক হয় তার উচিত ওযূ করে নেয়া। (আবূ দাউদ)

তবে ক্রোধ বা রাগের একটা পজিটিভ দিকও আছে। রাগের সাথে সম্পর্ক রয়েছে জীবনের সফলতার। যদি কেউ রাগ বা জিদ ধরে জীবনে সফলতার জন্য সৎ পথে পরিশ্রম করে তাহলে সে তা অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে রাগ পুরুষের ভূষণে পরিণত হতে পারে। এটা হবে তার determination-এর পুরষ্কার। এক্ষেত্রে রাগটি পজিটিভ ভূমিকা রেখেছে।

অযৌক্তিক রাগ বা ক্রোধ নারী এবং পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই অশান্তি বা ধ্বংসের কারণ হতে পারে। নারীদের এ ব্যাপারে বেশী সতর্ক থাকতে হবে কারণ পৃথিবীর সব সমাজেই তাদের জীবনের তিনটি পর্যায়ে যেমন ঃ কন্যা, স্ত্রী ও মাতা। সুতরাং নারীদের রাগ, ক্রোধ অথবা জিদ সংসারে সমূহ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নারীরা এখানে যেন আমাদেরকে ভুল না বুঝেন। নারীরা সবসময় সম্মানিত এবং প্রকৃতির ব্যালেন্স এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্যই মহান আল্লাহ এই নিয়ম করেছেন। কারণ তিনিই ভাল জানেন কোথায় আমাদের কল্যাণ রয়েছে।

পুরুষের জীবনে রাগ না থাকলেতো পুরুষ নির্জীব হয়ে যাবে। রাগ থাকবে, এটি জীবনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের একটি অংশ কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নয়। পুরুষের রাগ যেন সংসারে অশান্তি নিয়ে না আসে, সে দিক থেকে সাবধান। মনে রাখতে হবে, যে ক্রোধের পজিটিভ দিক সুন্দর তার নেগেটিভ দিকও কিন্তু চরম কুৎসিত। রাগের

ক্ষেত্রে বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মডেল রসূল ﷺ -কে অনুসরণ করবো। নিম্নে রাগ দমনের কিছু টিপ্স দেয়া হলো ঃ

১. Physical movement যেমন- দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়া, বসে থাকলে শুয়ে যাওয়া।
২. Physical relaxation যেমন - চোখ বন্ধ করা, দীর্ঘ নিশ্বাস নেয়া।
৩. Mental distraction যেমন - উল্টো দিক থেকে গণনা করা।
৪. Verbal engagement যেমন - নিজে নিজে পজিটিভ কথা বলা, নিজের কাছে নিজে আপিল করা।
৫. Cooling technique যেমন - ওযূ করা অথবা গোসল করে নেয়া আর বুঝতে হবে এখানে শয়তান উপস্থিত।
৬. Meditation যেমন - নফল সলাত আদায় করা, এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্যকারী, আমাদের প্রতিপালক ও সর্বনিয়ন্তা মালিক।

অবাধ মেলামেশা অশান্তির সূচনা

বাংলাদেশী পরিবারগুলো পৃথিবীর সকল প্রান্তেই পরস্পর সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে উষ্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে আসছেন। এ রীতি এত বেশী সচল যে প্রায় সকল পরিবার প্রতিমাসে হয় কাউকে দাওয়াত দিয়ে মেহমানদারী করেন অথবা কারো বাসায় মেহমান হয়ে দাওয়াত খেতে যান। পরিবারগুলোর এ সংস্কৃতি বাংলাদেশ হতে সউদি আরব, লন্ডন হতে লস-এঞ্জেলস, প্যারিস থেকে সিংগাপুর সবখানে একই। এতে করে একে অপরের ঘনিষ্ট হয়, পরস্পর জানাশুনা হয়, হৃদ্যতা বাড়ে। তবে এধরণের একটি সুস্থ ও সুন্দর বিনোদন কখনো কখনো অনাকাংক্ষিত পরিবেশের সৃষ্টি করে। কোন অসতর্ক মূহূর্তে মানুষের দুর্বলতার সুযোগে চিরশত্রু শয়তান তার ভাগ বসিয়ে দেয়। মানুষকে বিভ্রান্ত করে চরম ক্ষতি করে ফেলে। প্রাথমিক আঘাতটা কাটিয়ে কিছু বুঝে উঠার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

সকল ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাটাই সর্বোত্তম। সামাজিকতা, লৌকিকতা, মেহমানদারী, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও ধর্ম পালন, রাজনীতি, স্থানীয় সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদি জীবনের সকল বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই বুদ্ধিমানের কাজ। আমার বন্ধু আমার বাড়ীতে দাওয়াত খেতে আসার মধ্যে

কোন অকল্যাণ নেই। তার বাড়ীতে প্রতি মাসে মেহমান হওয়ার মধ্যে কোন আপত্তিকর কিছু নেই। কিন্তু আমার স্ত্রী যদি আমার বন্ধুর সাথে অথবা আমি আমার বন্ধুর স্ত্রীর সাথে এমনভাবে মেলামেশা করি যাতে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আমরা সীমালজ্ঘন করে নিজেদের কঠিন পরীক্ষার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অতি প্রগ্রেসিভ মনের অধিকারীরা এসবে কিছু মনে করেন না কিন্তু ঘটনা যখন ঘটে যায় তখন আফসোস করে এর ইতি টানা যায় না বরং এর চাইতে বড় কিছু ঘটে যায়, যার ক্ষতিপূরণ কোন কিছু দিয়ে হয় না।

কোন কোন অবুঝ স্বামীরা তাদের অনুপস্থিতিতে বন্ধুদের নিজ ঘরে আসার কেবল অনুমতিই দেয় না বরং অবাধ অনুমতি দিয়ে দেন। ফলে স্বামীর বন্ধু যখন-তখন ঘরে আসার লাইসেন্স পেয়ে যান। স্বামীরা এতই অবুঝ আর অজ্ঞ যে তারা অফিস আদালতে কঠিন সমস্যার সমাধান করে বড় অঙ্কের বেতন পান কিন্তু এ সামান্য সামাজিক শিষ্টাচারটি বুঝেন না। কেউ কেউ এ অজুহাতে এ অনুমতি দিয়ে দেন যে সে তো আমার বাল্যকালের বন্ধু। অথবা সে তো আমার অনেক ছোট বা বড় বা আরো কোনো অগ্রহণযোগ্য যুক্তি। আমরা বলছিনা যে ইমারজেন্সী কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও একজন অপরজনের বাসায় যাওয়ার অনুমতি পাবে না। বিষয়টিকে অতি সহজ ও অবাধ করার মধ্যেই বিপদ লুকিয়ে থাকে। অতএব স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর কোন বন্ধুকে নিজ বাসায় আসার পথ বন্ধ করে দিতে হবে। স্ত্রীর উচিত নিজ স্বামীকেও সেটি করতে না দেয়া। আমরা বলছি না যে এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটবেই। কিন্তু দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন সতর্ক হবার সময় থাকে না। কোন কিছু ঘটার আগেই আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বেপর্দার লাইসেন্স ও দাইয়ুসী সার্টিফিকেট

আমাদের সমাজে এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন যারা ইসলামী আইন মান্যকারীদেরকে লক্ষ্য করে জোর গলায় উক্তি করে থাকেন এই বলে "ওরা সংকীর্ণমনা", ওরা মেয়েদের অবাধ মেলামেশা ও নারী অধিকারের ঘোর বিরোধী, আমরা ওদের মত নই, আমাদের আছে উদার হৃদয়, রয়েছে প্রশস্ত মন মানসিকতা।

নিজ স্ত্রীদেরকে উনারা বেপর্দার লাইসেন্স প্রদান করে বিনিময়ে নিজেরা অর্জন করে নেন দাইয়ুস হবার সার্টিফিকেট। আরবী ভাষায় প্রধানতঃ দাইয়ুস বলা হয়ে

থাকে ঐ ব্যক্তিকে যে নিজ স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার অনুমতি দিয়ে থাকে অথবা বাধা দেয় না অথবা মেলামেশায় কিছু মনে করে না। ইসলাম দাইয়ুসের পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী দিয়েছে।

রসূল ﷺ বলেছেন, "আদ-দাইয়ুসু লা ইয়াদখুলিল জান্নাহ" অর্থাৎ দাইয়ুস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। "মনের পর্দাই আসল পর্দা" নামক বুলিটি বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে যখন বেপর্দার লাইসেন্স এবং দাইয়ুসী সার্টিফিকেট উভয়টি মজবুতভাবে কাজ করে মানুষের মাঝে আর বিদায় নেয় তখন ইসলামী আদর্শবাদী পূর্ণ আইন সমাজ থেকে। বেপর্দা ও দাইয়ুসী চরিত্র সমাজে কী কী ধরণের অবক্ষয় বয়ে আনে তার কয়েকটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

অবৈধ সম্পর্ক ১ ঃ অবাধ চলাফেরা, উঠাবসা, একাকী অবস্থায় পরপুরুষের বাসায় আসার অনুমতি প্রদান। সন্তানের টিউটর হিসেবে স্বামীর অনুপস্থিতিতে ঘরে এসে পড়ানোর ব্যবস্থা, যানবাহনে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতি কখনও মোড় নেয় অন্যদিকে। চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে একে অপরকে, অবৈধ সম্পর্ক বা প্রেম বিনিময় শুরু হয় যার ফলশ্রুতিতে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে ফাটল ধরে, একে অপরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। আরও অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায় বহুদিনের গড়া সংসার আর সন্তানদের জীবনে নেমে আসে এক ঘোর অন্ধকার। এই লাইসেন্স এবং সার্টিফিকেট আর একটি বিভীষিকা বয়ে আনে আত্মীয়দের মাঝে।

অবৈধ সম্পর্ক ২ ঃ দেবর-ভাবী, শালি-দুলাভাই এদের মধ্যকার সম্পর্ক আমাদের সমাজে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একই পরিবারভুক্ত হয়ে বসবাস করার ফলে পর্দার কোন প্রশ্নই থাকে না। হাসি-তামাসা, কৌতুক, ফুর্তি ইত্যাদি অহরহ চলতে থাকে। হঠাৎ করে কখনো হয়ত দেখা গেলো ভাবী-দেবর সম্পর্ক অন্যদিকে ধাবিত হয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কে পরিণত হলো এক পর্যায়ে, সুখী সংসারটি আর টিকলো না নেমে আসলো বড় ভাইটির জীবনে অমানিশা, ধুকে ধুকে আঘাতে আঘাতে হয়ত একদিন চির বিদায় নিতে হলো। একইভাবে শালি-দুলাভাই সম্পর্কও যখন ঐ রকমভাবে মোড় নেয় তখন দীর্ঘদিনের গড়া সোনার সংসার ধূলিসাৎ হয়, বেচারী বড় বোনের আর্তনাদ তখন আর দেখে কে, এক বিভীষিকাময় জীবনের হয় শুরু।

অবৈধ সম্পর্ক ৩ ঃ আরও একটি ব্যতিক্রমধর্মী সম্পর্ক স্থান পায় আমাদের সমাজে। মেয়ে তার বাবার বন্ধুকে ডাকে চাচা বা আঙ্কল। চাচা-ভাতিজী সম্পর্ক

নিয়ে শুরু হয় এ যাত্রা আর শেষ হয় প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কের মাধ্যমে। বাবা-মায়ের সমস্ত আশা-ভরসাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মেয়ে তার বাপ-মার বাড়ী ছেড়ে পাড়ি দেয় অজানার পথে চাচা নামের প্রেমিকের সাথে। আবার খালু-ভাগিনীর মাঝেও এ ধরণের ঘটনার খবর পাওয়া যায়। শুধু দেশে নয় প্রবাসেও। গত ৩-৪ দশকে ঘটে গেলো অনেক ঘটনা যাতে উপরের ফেক্টর বা কারণগুলোই ছিল মুখ্য। বিভিন্ন ঘটনার শিকার যারা, আর যারা ঘটনার সাক্ষী বা মধ্যস্থতাকারী তাদেরকে সাথে নিয়ে আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে এ ধরণের ঘটনার কি করে বন্ধ করা যায়। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বুনিয়াদ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় উপকরণ কী হতে পারে। ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে প্রত্যাবর্তন ঈমান, ইয়াকীন, তাকওয়া এবং ইহসান দিয়ে সমাজকে সাজানোর বিকল্প অন্য কিছুই হতে পারে না সেকথা যে কোন চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই সহজে বুঝতে পারবে।

রূপ-সৌন্দর্য হচ্ছে নারীর মহামূল্যবান সম্পদ

আমাদের কাছে যখন কোন দামী সম্পদ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি থাকে তা আমরা লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখি, লকারে রাখি বা ব্যাংকে রাখি যাতে কেউ চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যেতে না পারে। এই সম্পদ দেখে কারো লোভও হতে পারে, হিংসাও জাগতে পারে। ঠিক তেমনি নারীর মহামূল্যবান রূপ-সৌন্দর্য আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তাকে আমানত স্বরূপ। এই রূপ আল্লাহ তা'আলা চাইলে যেকোন সময় আবার ফেরত নিয়েও নিতে পারেন। তাই মহান আল্লাহ তা'আলার দেয়া এই রূপ-সম্পদ নারীর উচিত পরপুরুষ থেকে লুকিয়ে রাখা, ঢেকে রাখা, আড়াল করে রাখা, আর এতেই রয়েছে তার প্রকৃত কল্যাণ। এতে সে দুই দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে – এক, আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করছে আর অন্যদিকে তার মহামূল্যবান সম্পদ পরপুরুষের কু-দৃষ্টি হতে রক্ষা পাচ্ছে। আসলে নারীর রূপ-সৌন্দর্য্য শুধু তার স্বামীর জন্য। এই রূপ অন্য কাউকে প্রদর্শন করলে অকল্যাণ ছাড়া জীবনে কোন প্রকার কল্যাণ নেই।

রসূল ﷺ বলেছেন- জাহান্নামবাসী দু' ধরণের লোক, যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। আর একদল স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টাকারিণী, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না,

এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে তার সুগন্ধি পাওয়া যায়। (সহীহ মুসলিম)

পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা নিষেধ

মাহরম অর্থ যার সাথে বিয়ে হারাম। গায়ের মাহরম অর্থ যার সাথে বিয়ে জায়িয।

- আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা (গায়ের মাহরম/পরনারী) মহিলাদের নিকট গমন করা থেকে দূরে থাক।" (সহীহ বুখারী)
- আমর ইবনুল আস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, "নাবী ﷺ স্বামীদের অনুমতি ব্যতিরেকে মহিলাদেরকে পরপুরুষের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।" (তাবারানী)
- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে পুরুষ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মহিলার শয্যায় বসবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিষধর অজগর সাপ নিযুক্ত করে দেবেন।" (মুসনাদে আহমাদ)
- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মাহরম সংগী ছাড়া কোন মহিলা সফর করবে না এবং কোন মাহরমকে সংগে না নিয়ে কোন পুরুষ কোন মহিলার কাছে যাবে না।" (সহীহ বুখারী)
- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি কখনো একাকীত্বে কোন মহিলার নিকট বসবে না যদি সেই মহিলার কোন মাহরম পুরুষ উপস্থিত না থাকে। কেন না তা করা হলে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে উপস্থিত থাকে শয়তান।" (আহমাদ)

মহিলাদের চাকুরী

ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে পুরুষের দায়িত্ব হলো সংসারের সকল খরচ বহন করা। অর্থাৎ পরিবারের ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়দায়িত্ব স্বামীর (সহীহ বুখারী)। স্ত্রী চাকুরী করতে বাধ্য না বা তাকে আয়-রোজগার করার জন্য স্বামী কোন প্রকার চাপ প্রয়োগও করতে পারবেন না। হ্যাঁ যদি স্ত্রী চাকুরী করার কারণে সংসারে অতিরিক্ত কিছু আসে তাহলে তা আলহামদুলিল্লাহ তবে স্ত্রী

অবশ্যই পর্দার মধ্যে থেকে আয়-রোজগার করবেন। এবং অতিরিক্ত আয় করতে গিয়ে যদি স্ত্রীকে বেপর্দা হতে হয় বা ঠিক মতো পর্দা করা সম্ভব না হয় তাহলে তার দায়দায়িত্ব নিজের আমলনামা ছাড়াও স্বামীর আমলনামায় এসে পরবে। অর্থাৎ এই কবীরা গুনাহর জন্য এবং ফরয হুকুম অমান্য করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'জনকেই জবাবদিহি করতে হবে।

চিত্র ১ ঃ যদি পরিবারের অবস্থা এমন হয় যে স্বামী চাকুরী করতে শারীরিকভাবে অক্ষম (disable) এবং স্ত্রী-ই একমাত্র কাজের জন্য যোগ্য তাহলে তো কোন উপায়ই নেই। তবে এক্ষেত্রেও স্ত্রীকে যতদূর সম্ভব পর্দার মধ্যে থেকে চাকুরী করতে হবে। এবং জীবন বাঁচানোর জন্য পর্দা কিছুটা ভঙ্গ হলেও আর একটি ভাল চাকুরীর সন্ধানে থাকতে হবে এবং পর্দা বজায় রেখে কাজ করা যায় এমন চাকুরীতে যত দ্রুত সম্ভব পরিবর্তন করতে হবে।

চিত্র ২ ঃ এমন যদি হয় যে স্বামী তার প্রফেশন অনুযায়ী চাকুরী পাচ্ছেন না এবং তিনি তার এডুকেশন অনুযায়ী প্রফেশন ছাড়া চাকুরীও করবেন না বা ভাল অন্য কোন প্রফেশন ছাড়াও চাকুরী করবেন না এবং তিনি হয়তো আরো পড়াশোনা করবেন। আর তাই স্ত্রীকে যদি বেপর্দা হয়ে চাকুরী করতে হয় তাহলে এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। স্বামীকে আল্লাহর উপর ভরসা করে যে কোন হালাল কাজ বেছে নিতে হবে একটু কষ্ট হলেও নিজ প্রফেশনে চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ সম্পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।" (সূরা তালাক ঃ ৩)

চিত্র ৩ ঃ আলহামদুলিল্লাহ আজকাল বেশীরভাগ মহিলারাই শিক্ষিতা, শুধু তাই নয় অনেকেই উচ্চ শিক্ষিতা। আমরা শিক্ষিতারা অনেকেই মনে করি যে এত পড়াশোনা করেছি, কিভাবে ঘরে বসে থাকি? একটা কিছু করা প্রয়োজন, শিক্ষাটাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। শিক্ষাকে অবশ্যই কাজে লাগানো প্রয়োজন, আর এই শিক্ষাকে কিভাবে কাজে লাগাবো, কোন্ ক্ষেত্রে কাজে লাগাবো সেদিকে ভেবে চিন্তে এগুতে হবে। সবকিছুর মূলে হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি), কারণ আমি যত উচ্চ শিক্ষিতাই হই না কেন আমাকে একদিন আখিরাতের ময়দানে মহান বিচারকের সামনে দাঁড়াতে হবে, প্রতিটি প্রশ্নের

উত্তর এক এক করে দিতে হবে। তাই আমরা যা কিছু করব তা অবশ্যই তাকওয়ার সীমার মধ্যে থেকে করব এবং কোন ক্ষেত্রেই সীমালঙ্ঘন করব না, আল্লাহর কোন হুকুমকেই অমান্য করব না। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহর প্রতিটি হুকুম পালনের মধ্যেই রয়েছে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ।

তাই কোন মহিলাকে যদি চাকুরি করতেই হয় তাহলে বাছবিচার না করে এবং অতিরিক্ত টাকার প্রতি না ঝুঁকে দেখে-শুনে এমন চাকুরী নেয়া উচিত যেন পর্দা করে চলতে পারেন। একটু কম বেতনের চাকুরি হলেও আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে, ইন্‌শাআল্লাহ আল্লাহ আমাকে অন্যদিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বরকত দিয়ে দিবেন কারণ আমি মহান আল্লাহ তা'আলার ফরয নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করছি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন।

যেমন, মহিলাদের বেশী বেশী ডাক্তারী পেশায় যাওয়া উচিত যেন মুসলিম মহিলা রোগীরা তার কাছ থেকে সেবা পেতে পারেন, আইনবিদ হওয়া উচিত যাতে মুসলিম মহিলারা তাদের কেইস নিয়ে তাদের কাছে যেতে পারেন, সাংবাদিক হওয়া উচিত যাতে তারা মহিলাদের বিষয়গুলো মিডিয়াতে তুলে ধরতে পারেন। এমন অনেক পেশা আছে যেগুলোতে আমাদের মহিলাদের অবশ্যই যাওয়া উচিত যাতে মুসলিম মহিলারা উপকৃত হতে পারেন।

স্বামীর আনুগত্য

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্বামী যেমনই হোক না কেন তা মেনে নেয়া উচিত, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এমন কেন? ওমন কেন? এগুলো আর এখন দেখার সময় নেই, যা দেখার এবং খোঁজ নেয়ার তা বিয়ের আগেই নেয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলার কাছে শুকরিয়া জানানো উচিত। আল্লাহ তা'আলা যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)*

বাসর রাতে সুখী পারিবারিক জীবনের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করা উচিত। আল্লাহ যেন আমাদেরকে দাম্পত্য-জীবনে সুখী করেন। কেন মানবো তাকে? কেন শুনবো তার কথা? কেন করবো তার আনুগত্য? সে কে আমার? এগুলো না বলে বৈধ বিষয়ে তার অনুসরণ করাই হচ্ছে শান্তি। আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন*

আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

রসূল ﷺ বলেছেন তোমরা তিনজন কোথাও গেলে একজনকে নেতা বানিয়ে নাও। স্কুল-কলেজ, অফিসে হেড আছেন, যাকে মানতে হয়। যে শহরে ট্রাফিক আইন মানা হয় না, সেখানে দুর্ঘটনা ঘটে বেশী। অনুরূপ সংসারের কর্তা হল স্বামী। সংসারের ঐ আইন না মানলে সংঘাত সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। স্বামীর কর্তা হওয়ার কয়েকটি প্রাকৃতিক কারণ হল ঃ

১. স্ত্রী সাধারণতঃ বয়সে ছোট হয়। মা-বাবার আদেশ/উপদেশ যেমন মানতে হয়, তেমনি স্বামীর আদেশ/উপদেশ মানতে হয়। এতেই রয়েছে স্ত্রীর পরম আনন্দ।
২. পুরুষরা সাধারণতঃ মহিলাদের তুলনায় বেশী জ্ঞানী হয়ে থাকে।
৩. মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের বেশী ঘরের বাইরে বিচরণ করতে হয় আর এতে বাস্তব অভিজ্ঞতা বেশী হয়।
৪. নারীর তুলনায় পুরুষরা ভারি কাজ করতে পারে।
৫. পুরুষরা নারীর তুলনায় অধিক রিস্ক নিতে পারে।
৬. পুরুষদের ধৈর্য বেশী থাকে।
৭. পরপুরুষের কাছে নারীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা নারীর শত্রু, পুরুষের তা নয়।
৮. নারীর ভরণ-পোষণ-এর দায়দায়িত্ব পুরুষের।
৯. বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর বাড়ি চলে আসেন, স্বামী স্ত্রীর বাড়িতে বসবাসের জন্য যান না।
১০. শারীরিকভাবে নারী দুর্বল হয়।
১১. নারীর সিকিউরিটি হচ্ছে পুরুষ।
১২. যুদ্ধ সাধারণতঃ পুরুষরাই করে থাকে।

“পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ [তাদের জন্য] ধন ব্যয় করে।” (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

মোট কথা আদর্শ স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালনকারিণী ও অনুগতা হবে। পুরুষ নারীদের দায়িত্বশীল এটি শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন ঃ

- কোথাও বাইরে গেলে উভয়ের মধ্যে স্বামীই হবে নেতা অর্থাৎ টিম লিডার।

- পারিবারিক জামাতের সলাতে স্ত্রী কুরআনে হাফিয হলেও সলাতের ইমামতি করবেন স্বামী ।
- মসজিদের সলাতেও সবসময় পুরুষ এবং মহিলা মুকতাদিদের সলাতের ইমামতি করবেন পুরুষ ।
- কোথাও সাক্ষী প্রয়োজন হলে একজন পুরুষের প্রয়োজন হয় কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন দু'জন ।
- সংসারের আয়-রোজগারের দায়দায়িত্ব স্বামীর, স্ত্রীর নয় ।
- কোথাও ভ্রমণে যেতে হলে অথবা হাজ্জে যেতে হলে স্ত্রীর সাথে স্বামী বা অন্য মাহরম পুরুষ সাথে যেতে হবে, একা যেতে পারবেন না ।
- নারী দলের নেত্রী হতে পারবেন না বা রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবেন না ।
- একজন পুরুষ ন্যায়সঙ্গতভাবে একই সময়ে ৪টি পর্যন্ত স্ত্রী রাখতে পারেন কিন্তু একজন নারী একই সময়ে একজনের বেশী স্বামী রাখতে পারেন না ।
- বিয়েতে স্বামী স্ত্রীকে মহরানা দিবেন, স্ত্রী দিবেন না ।

নাবী ﷺ বলেন, মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াক্তের সলাত আদায় করে, রমাদানের সিয়াম পালন করে, নিজের ইজ্জতের হিফাযত করে এবং স্বামীর কথা মত চলে, তখন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে । (আহমাদ)

এক মহিলা নাবী ﷺ -এর নিকট কোন প্রয়োজনে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি স্বামী আছে?' মহিলাটি বলল, 'জী হ্যাঁ ।' তিনি বললেন, 'তার কাছে তোমার অবস্থান কি?' সে বলল, 'যথাসাধ্য আমি তার সেবা করি ।' তিনি বললেন, 'খেয়াল করো, তার কাছে তোমার অবস্থান কোথায় । যেহেতু সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম ।' (আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাকী)

নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয় । (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশীরভাগই নারীজাতি; (কারণ) তারা কুফরী করে । জিজ্ঞেস করা হল, 'তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন ঃ 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয় ।' তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, 'আমি কক্ষণো তোমার নিকট হতে ভাল ব্যবহার পাইনি ।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ)

যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার জন্য তিনদিনের বেশী কোন মৃতের উপর শোকপালন করা বৈধ নয়, কেবল স্বামী ছাড়া। সে ক্ষেত্রে সে ৪ মাস ১০ দিন শোকপালন করবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৪)

ক্বাইস বিন সাদ নাবী ﷺ -কে বললেন, [ইরাকের] হীরাহ শহরে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার লোকেরা তাদের প্রাদেশিক শাসককে সিজদা করছে। আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি সিজদার বেশী যোগ্য। এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীদেরকে আদেশ করতাম, তারা যেন তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করে। যেহেতু আল্লাহ তাদের উপর তাদের স্বামীদের বহু হক নির্ধারিত করেছেন। (আবূ দাউদ)

স্বামীকে না মানলে স্ত্রীর সলাত কবুল হয় না। মহানাবী ﷺ বলেন, 'তিন ব্যক্তির সলাত তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, [যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে], [অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচারণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত] এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।' (তিরমিযী, ত্বাবারানী)

তবে আনুগত্য হবে বৈধ বিষয়ে, হারাম বিষয়ে নয়। স্বামী পর্দা করতে নিষেধ করলে, সলাত-সিয়াম করতে নিষেধ করলে, তা মানা যাবে না। যেহেতু 'স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।' (আহমাদ)

কিন্তু অনেকে আছে, যারা তাদের স্বামীর স্বামীত্বকে না মেনে নিজেদের 'আমিত্ব'কে মেনে থাকেন। স্বামীর কথা নেন না, তাকে পরোয়া করেন না, তার কথার কোন দাম দেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তার উল্টা চলেন। এটা যেন তাদের প্রকৃতি। তাই মহানাবী ﷺ বলেছেন,

তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্খী হও। কারণ, নারী জাতি পাঁজরের বাঁকা হাড় হতে সৃষ্ট। [সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বাঁকা] অতএব তুমি সোজা করতে গেলে হয়তো তা ভেঙ্গেই ফেলবে। আর নিজের অবস্থায় উপেক্ষা করলে তা বাঁকা

থেকেই যাবে। অতএব তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

নাবী ﷺ বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খুশি করে দেয়, যাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না। (আহমাদ, নাসাঈ)

অনেক মহিলা মৌখিকভাবে স্বামীর প্রশংসা করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার অবাধ্যতা করেন। আর মুখের প্রশংসা কোন কাজের নয়। যেহেতু ঈমানের মত ভালোবাসা তিনটি কর্মের সমষ্টির নাম; হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং কাজে পরিণত করা।

স্ত্রীর জন্য সতর্কতা ঃ নিজের স্বামীর সাথে অন্যের স্বামীর তুলনা করা উচিত না। ওমুকের স্বামীর এই গুণ, ঐ গুণ, এতো ভাল, ওতো ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি বলে স্বামীকে খোটা দেয়া ঠিক নয় বরং এতে নিজের মনে অতৃপ্তি সৃষ্টি হয় এবং সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। অন্যের স্বামী হাজার গুণে ভাল হোক সেগুলোর দিকে কোন স্ত্রীর তাকানো ঠিক নয়। মনে করতে হবে আমার স্বামীই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

স্বামীর জন্য সতর্কতা ঃ একইভাবে নিজের স্ত্রীর সাথে অন্যের স্ত্রীর তুলনা করা উচিত নয়। স্বামীর তো অন্যের স্ত্রীর দিকে তাকানোর প্রশ্নই উঠে না, এটা হারাম। তার রূপ-গুণের প্রশংসা করা ও তাকে দেখা তো দূরের কথা। আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর কর্তা এবং পুরো সংসারের অভিভাবকরূপে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। এ দায়িত্ব মানে স্ত্রীর উপর এবং পরিবারের অন্যান্যদের উপর হুমকি-ধামকি দেয়া নয়। এই দায়িত্বের অবহেলা এবং অপব্যবহার কোনভাবেই করা যাবে না, যদি স্বামী এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন তাহলে আখিরাতের ময়দানে তাকে কঠিনরূপে মহান আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। যে স্বামী তার স্ত্রীর কাছে ভাল সে সবার কাছে ভাল। কারণ একজন স্বামীর 'ভিতর-বাহির' অন্যান্য সবার চেয়ে সবচেয়ে বেশী জানেন তার স্ত্রী।

ভুল ধারণার অবসান ঃ এখানে ভুল বুঝার কোন অবকাশ নেই। কুরআনের নিয়ম যা আল্লাহ করেছেন তা মানবজাতির কল্যাণের জন্যই করেছেন। আর সেটা বিনা তর্কে মেনে নেয়াই প্রকৃত কল্যাণ। কুরআনের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি-তর্ক দেখানো যেতে পারে কিন্তু তাতে মোটেও কোন কল্যাণ নেই। কারণ যিনি

আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই ভাল জানেন কোথায় কোন নিয়মে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ। আর মহান আল্লাহ তা'আলার চেয়ে বেশী বুঝার চেষ্টা না করাই ভাল।

বন্ধুত্ব করবো কার সাথে?

রসূল ﷺ -এর একটা হাদীসের ভাবার্থ দিয়ে আলোচনাটা শুরু করা যাক। তোমার বন্ধু যদি হয় কামার তাহলে তুমি মাঝে মধ্যেই তার দোকানে গিয়ে সময় কাটাবে, আর কিছুটা হলেও কামারের দোকানের কয়লার কালি তোমার জামা কাপড়ে লাগবেই। আর তোমার বন্ধু যদি হয় আতরওয়ালা, তাহলেও তুমি মাঝে মধ্যেই তার দোকানে গিয়ে সময় কাটাবে, আর কিছুটা হলেও তোমার জামা-কাপড়ে আতরের ছিটে-ফোঁটা লাগবেই এবং তোমার শরীর থেকে সুঘ্রাণ আসবে।

এতেই বুঝা যাচ্ছে আমাদের করণীয় কী বা কার সাথে আমরা সম্পর্ক করবো। আমার বন্ধু যদি হয় মদখোর তাহলে একদিন না একদিন হলেও সে আমাকে বারে ঢুকিয়ে ছাড়বে, অথবা সে যদি হয় জুয়ারী তাহলে সে আমাকে একদিন হলেও জুয়ার আসরে নিয়ে ছাড়বে। আবার আমার বন্ধু যদি হয় সলাত আদায়কারী তাহলে সে কোন না কোন একদিন আমাকে মসজিদে নিয়ে ছাড়বে।

আবার আমার স্ত্রীর বান্ধবী যদি হন পর্দানশীন তাহলে আমার স্ত্রীও হয়তো একদিন হবেন পর্দানশীন। আবার আমার স্ত্রীর বান্ধবী যদি হন ইসলামিক মাইন্ডেড তাহলে যখন তারা গল্প-গুজবে বসবেন তখন তারা আলোচনা করবেন কুরআন থেকে, হাদীস থেকে অর্থপূর্ণ বিষয় নিয়ে। আবার আমার স্ত্রীর বান্ধবী যদি হন হিন্দি সিনেমার পোকা, তাহলে তারা এই অখাদ্য-কুখাদ্যের বিষয়ে খোঁজ-খবর দিবেন। আবার যখন তারা কোন আড্ডায় বসবেন তখন তাদের আলোচনার বিষয় হবে বলিউডের নায়ক-নায়িকা।

ঘটনা ১ ঃ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। স্বামী-স্ত্রী ক্যানাডা এসেছেন ল্যান্ডেড ইমিগ্র্যান্ট হয়ে। দু'জনেই হাইলি কোয়ালিফাইড, স্ত্রী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং বিসিএস-এ চান্স পেয়েছেন। বাংলাদেশী ভদ্রপরিবার হিসেবে আমাদের সাথে পরিচয় হয় এবং সেই সাথে বন্ধুত্ব। কিছুদিন পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আমাদের নিকট ১২ হাজার ডলার ধার চান তিন মাসের জন্য।

আমরাও উপকারের নিয়তে তাদেরকে ১২ হাজার ডলার ধার দেই। কিন্তু তিন মাস চলে যাওয়ার পরও তারা ডলার ফেরত দেয়ার নাম নেন না। আমরাও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য তাদেরকে টাকাটা প্রতিমাসে কিস্তিতে দিয়ে পরিশোধ করার সুযোগ দেই। এভাবে তারা ৪ হাজার ডলার পর্যন্ত পরিশোধ করে। এবং দুই বছর পরে হঠাৎ একদিন বলে তারা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছেন একেবারে এবং দেশে গিয়ে বাকি টাকা পরিশোধ করবেন। দেশে আমরা তাদেরকে চিনি না এবং ক্যানাডাতেই তাদের সাথে পরিচয়।

যা হোক, তারা আর বাকী ৮ হাজার ডলার কিছুতেই দিতে পারবেন না, সোজা কথা। ফোন করলে সাধারণতঃ ফোন রিসিভ করেন না এবং টাকার কথা বললে রাগা-রাগী করেন। হঠাৎ একদিন দু'জনে আমাদের বাসায় এসে হাজির। প্রস্তাব দিলেন আমাদের বাকী সব টাকা পরিশোধ করে দিবেন। কিন্তু কিভাবে? ওনারা ব্রোকার ধরেছেন, দুই নাম্বারী কাগজ পত্র দিয়ে ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার ডলার লোন করানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু সেজন্য তাদের একজন গ্যারান্টর প্রয়োজন। কারণ অনেক আগেই তারা নিজেদের সবগুলো ক্রেডিট কার্ড এবং লাইন অব ক্রেডিট থেকে সব ডলার তুলে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং টাকা ফেরত না দেয়ার জন্য তাদের ক্রেডিট হিস্ট্রি খারাপ হয়ে গেছে। তাই আমাদের অনুরোধ করছেন গ্যারান্টর হওয়ার জন্য। এই ৫০ হাজার ডলার লোন পেলে সেখান থেকে আমার ৮ হাজার ডলার ফেরত দিবেন এবং বাকি ৪২ হাজার ডলার আর ফেরত না দিয়ে একেবারে দেশে চলে যাবেন।

এই দেখুন বন্ধুত্বের নমুনা, দেখুন বন্ধুর চরিত্র! এতো গেল একজনের উদাহরণ। এরকম বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন ক্যাটেগরির বন্ধু পাওয়া যায় জীবনে চলার পথে। যা হোক, আমরা যাদের সাথে উঠা-বসা করি তাদের মন-মানসিকতা কি ধরণের, তাদের নীতি-নৈতিকতার মান কতটুকু? তাদের আল্লাহর প্রতি ভয় কতটুক? এসবের উপর আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের চরিত্র গঠনও নির্ভর করে। নির্ভর করে আমাদের পারিবারিক শান্তি। শুধু উচ্চ শিক্ষিত হলে বা অনেক টাকা-পয়সা আয় করলে বা দামী দামী গাড়ী চালালে বা নামকরা ব্র্যান্ডের কাপড়-চোপড় পড়লেই চরিত্রবান হওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেই প্রকৃত চরিত্রবান যে তার দৈনন্দিন কাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে সেই কাজ সম্পাদন করে, যাকে কুরআনের ভাষায় বলে তাকওয়া। আর আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি কাজ আল্লাহ যেভাবে করতে বলেছে ঠিক সেইভাবে করা। অর্থাৎ আমার নিজের মন-মর্জি মতো করলে চলবে না।

তাই বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। আল্লাহ-ভীরু, সলাত আদায়কারী ও (নারীদের ক্ষেত্রে) পর্দানশীদের সাথে চলা উচিত। কোন এক হাদীসে আছে, মানুষ তাদের বন্ধুর স্বভাব অনুযায়ী হয়, আর অসৎ বন্ধু জাহান্নামের দিকে টানে। কারণ বন্ধুর প্রভাব কিছুটা হলেও আমাদের উপর পড়বে।

ঘটনা ২ ঃ আর একটি সত্য ঘটনার মাধ্যমে উদাহরণ দেয়া যাক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্যানাডায় বসবাসরত স্বামী-স্ত্রী দিন কাটাচ্ছেন সুখেই। দেশ থেকে স্বামীর প্রাণপ্রিয় বন্ধু (ব্যাচেলর) আসেন নতুন ইমিগ্র্যান্ট হয়ে। বন্ধুর বাসার ড্রইং রুমেই থাকার ব্যবস্থা হয় সেটল না হওয়া পর্যন্ত। বন্ধুর স্ত্রীর গতানুগতিক সামাজিকতার মধ্য দিয়েই স্বামীর বন্ধুর আপ্যায়ন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শয়তান তো আর চুপচাপ বসে নেই, যা ঘটাবার তাই ঘটিয়ে দিয়েছে খুব দ্রুত। বন্ধুর স্ত্রীর সাথে প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সাথে সম্পর্ক, তারপর ছাড়াছাড়ি। গেইম ওভার। এই হলো প্রাণপ্রিয় বন্ধুর উপহার। যাহোক মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল বুঝেন, তাই তিনি পরপুরুষ এবং পরস্ত্রীর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছেন, যারাই এটা অতিক্রম করবে তারাই মহাবিপদে পড়বে। এখানে নিজ ঘরে খাল কেটে কুমির এনেছেন স্বামী নিজে। অতএব স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর কোন বন্ধুকে ঘরে আসার পথ মজবুতভাবে বন্ধ রাখতে হবে। আর স্বামীকেও সেটি করতে দেয়া যাবে না। সূরা ২৫ ফুরকানের ২৭, ২৮, ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

“সেদিন যালিম ব্যক্তি (ক্ষোভে দুঃখে) নিজের হাত দু'টো দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রসূল ﷺ -এর সাথে (দ্বীনের) পথ অবলম্বন করতাম! দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুককে (নিজের) বন্ধু না বানাতাম! আমার কাছে (দ্বীনের) উপদেশ আসার পর সে তা থেকে আমাকে বিচ্যুত করে দিয়েছিলো; আর শয়তান তো (সবসময়) মানুষকে (বিপদের সময় একা) ফেলে কেটে পড়ে।” এবং সূরা ৪১ আয-যুখরুফের ৬৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ “সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, অবশ্য যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা।”

বিশেষ অনুরোধ ঃ উপরের উদাহরণগুলো শুধুমাত্র বোঝাবার সুবিধার্থে আনা হয়েছে, কেউ এতে ভুল যেন না বুঝি এবং নেগেটিভভাবে যেন না নেই। সমাজে কিছু কিছু অসৎ লোক রয়েছে তাই বলে বিপদ-আপদে কেউ কাউকে একেবারেই ধার দেয়া বন্ধ করে দেয়া ঠিক নয়। তবে যে কোন লেনদেনে

সাক্ষীসহ লিখিত দলিল করে নেয়া আল্লাহর নির্দেশ, এতে দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

অর্থপূর্ণ পারিবারিক দাওয়াত

বাঙালী পরিবারের আজন্ম ঐতিহ্য দাওয়াত দান ও দাওয়াত গ্রহণ। পরিবারগুলি সামাজিক বন্ধন রক্ষা করার মোক্ষম উপায় হিসেবে এ পদ্ধতিকে সফলতার সাথে ব্যবহার করে আসছে। বেশ কিছু পরিবারের মিলন পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়, সুখ দুখের গল্প আর বন্ধুদের খোঁজ খবর পাওয়া যায় এ সামাজিকতার মধ্য দিয়ে। এ পদ্ধতি বা ঐতিহ্যের প্রচলন না থাকলে সম্ভবত আমরা একঘেয়েমিতে হাঁফিয়ে যেতাম। রকমারী সুস্বাদু খাবার আর খাওয়ার আগে-পরে গল্প এর মূল আকর্ষণ। এর একটি সাইকেল আছে। আজকে এর বাড়ী তো পরবর্তী বন্ধের দিন আরেকজনের বাড়ী দাওয়াত থাকবেই। এভাবে এক সাইকেল ফুরাতে কখনো একটি পুরো বছর লেগে যায়। এটি চালু রাখার মধ্যে নিশ্চয়ই কল্যাণ রয়েছে। আমরা এখানে এ দাওয়াত অনুষ্ঠানগুলোকে কিভাবে আরো অর্থবহ করে তোলা যায় তা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হোষ্ট বা মেজবান হিসেবে আমি এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি যা পালন করতে কোন অতিরিক্ত খরচ নেই কিন্তু অর্জন পুরো দাওয়াত অনুষ্ঠানকে পূর্ণতা দান করতে পারে। খাওয়ার পর সকলেই একটু মিষ্টিমুখ করেন। আমরা যাকে ডিজার্ট (Dessert) বলি। এটি দিয়ে খাওয়ার পূর্ণতা আনয়ণ করা হয়। ঠিক তদ্রুপ পুরো ঘরোয়া দাওয়াত অনুষ্ঠানকে পূর্ণতা দান করার জন্য একটি অতিরিক্ত কাজ আমরা শুরু করতে পারি।

খাওয়া শেষে হোস্ট সকলকে স্থির হয়ে বসতে অনুরোধ করতে পারেন। হোস্ট সামান্য ভূমিকা দিয়ে দ্বীন ইসলামের একটি বিষয় নিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারেন। এ জন্য হয়ত সামান্য পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনে প্রস্তুতি আগেই নিয়ে রাখতে হবে। আলোচনা মাটির নীচের আর আকাশের উপরের খবরাদির চাইতে দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী দিয়ে শুরু করা বাঞ্ছনীয়। এতে মানুষ বিরক্ত বোধ করবে না। দয়া করে এমন নসিহত করার প্রয়োজন নেই যে ঃ 'আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার, কুলহু আল্লাহ ৩ বার এবং দুরূদ ১১ বার পড়ুন, এতে অনেক সওয়াব হবে'। এগুলি

নূতন কিছু নয়। এগুলি সকল মুসলিমরাই কম বেশী করে থাকেন। যদিও সহীহ হাদীসে এর কোন দলিল নেই।

সর্বপ্রথম জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বটি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে হবে। হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে বলা যেতে পারে, 'দ্বীন ইসলামের জ্ঞানার্জন ফরয'। কারণ ইসলাম হলো Complete Code of Life, আমরা যদি কোডগুলি নাই জানলাম তাহলে সে কোড মানবো কীভাবে? অন্তত দৈনন্দিন জীবনের কোডগুলি না জানলে কিভাবে প্রতিদিনের জীবন প্ররিচালনা করবো? এবং এজন্য আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের ময়দানে জিজ্ঞেস করবে। তখন যদি বলি আমি তো কোডগুলি জানতাম না। কোনভাবেই রেহাই পাওয়া যাবে না। ইসলামের কোডগুলির চূড়ান্ত সোর্স হলো আল-কুরআন ও সুন্নাহ। আর আমরা সলাতে প্রতিনিয়তই সে কোডগুলি পড়ছি। এখন দরকার কোডগুলি অর্থসহ পড়া। এর জন্য প্রয়োজন তাফসীরের এবং হাদীস সংকলনের।

এভাবে দ্বীনের যে কোন মৌলিক বিষয় আমাদের দাওয়াত অনুষ্ঠানের Topic হতে পারে। সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা মাউনের মত সূরা সবাই জানে এমন সূরাগুলি দিয়েও শুরু করা যেতে পারে। সবাই ১৫/২০ মিনিটের আলোচনা উপভোগ করবেন ইন্‌শাআল্লাহ।

এ ব্যাপারে আমার লজ্জা বা পিছটান সকল উদ্যম ভেস্তে দিতে পারে। আমি হয়তো তখন এ যুক্তি খুজবো যে অন্যরাতো এটা করে না। আমি করে হাসির খোরাক হতে চাই না। আমি চাই না সবাই বলুক, উমুক ভাইয়ের ঘটনা কী? এতদিন তো জানতাম তিনি আমাদের মতই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, হঠাৎ কি হয়ে গেল? ইত্যাদি আজেবাজে চিন্তা। আর এ চিন্তার উৎস আমাদের চির শত্রু শয়তান। শয়তান সবসময় চায় আমরা কেবল দু'আ-দুরূদ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কুরআনের অর্থ বুঝা আমাদের কাজ নয়, ইত্যাদি। একজন নিয়মিত সলাত আদায়কারী বলেছিলেন এসব পড়তে ভয় লাগে যদি পরিবর্তন হয়ে যাই।

অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো, আমি যদি শয়তানকে পরাজিত করে এ ধরণের একটি দাওয়াত অনুষ্ঠান করতে পারি তাহলে সে অনুষ্ঠানে আসা ৯০% মেহমান এটিকে সাধুবাদ জানাবেন। ৬০% এটিকে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন। কেবল ৪০% এটিকে আন্তরিকভাবে মেনে নেবেন। হয়ত মাত্র ৫% এমন একটি উদ্যেগের সাথে কেবল একমতই হবে না বরং তারা নিজেরাও পরবর্তী দাওয়াতগুলোতে এটি চালু করবেন বলে আশা করা যায়।

তাই অন্যরা যে যাই মনে করুক না কেন আসুন আমরা এটি চালু করি, একটি সিদ্ধান্ত নেই, চেষ্টা করি, প্রস্তুতি নেই, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাই। আমরা কি কল্পনা করতে পারছি কী পরিমাণ সওয়াব আর কল্যাণের ভাগীদার হবো এরকম একটি দাওয়াত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে? মাত্র একজন মেহমানও যদি এতে কনভিন্স হয়ে নিজে তার অনুসরণ করেন তাহলে গাণিতিক হারে আরো যারা এটি চালু করবেন তার সমস্ত সওয়াবের অংশ আমরা পেতে থাকবো। এটি আল্লাহর পছন্দনীয় যে কোন কাজ সমাজে চালু করার জন্য নির্ধারিত পুরস্কার। আমরা অনায়াসেই এমন একটি সুন্দর উদ্যেগ নিতে পারি ইন্‌শাআল্লাহ।

শিরক মুক্ত জীবনযাপন করা

আজকাল সম্পূর্ণরূপে শিরক মুক্ত হয়ে জীবনযাপন করা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। আজ প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে মানুষ শিরকের সাথে লিপ্ত। বাস্তবে আজ মুসলিম সমাজে আল্লাহকে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় বটে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, আল্লাহর উলুহিয়াতী (ইবাদত) তাওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু তাঁর রবুবিয়াতের (প্রভুত্ব) তাওহীদ স্বীকার করা হচ্ছে না। মুখে স্বীকার করলেও বাস্তবে রব হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে আরো অনেক শক্তিকে। আর এটাই হচ্ছে শিরক।

শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে-ই রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভাবশালী, কর্তৃত্বসম্পন্ন, বিশ্বব্যবস্থাপক এবং রব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই মৃত 'বুযুর্গ' (?) লোকদের নিকট প্রার্থনা করে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরই ভয় করে চলে, তাদেরই নিকট থেকে কোনো কিছু পেতে আশা পোষণ করে। বিপদে পড়লে তাদের নিকটই নিস্কৃতি প্রত্যাশা করে, তাদের নিকটই সকল উন্নয়ন প্রত্যাশা করে। এক শ্রেণীর লোকেরা মনে করে ঃ এরা অলৌকিকভাবে মানুষের দু'আ শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, ফায়েজ দিতে পারে। ভালমন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাদের সন্তোষ কামনা করে। আর তাদের সন্তোষ বিধানের জন্যেই তাদের উদ্দেশ্যে মানত মানে, পশু জবাই করে, মরার পর তাঁদের কবরে নানারকম কান্ড করেন, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্যে ব্যয় করা কর্তব্য মনে করেন। আর এসব কারণেই দেখা যায়, এ শ্রেণীর লোকদের কবরকে নানাভাবে ইজ্জত করা হচ্ছে, বহু অর্থ খরচ করে কবরের উপর পাকা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে

দেশ-দেশান্তর সফর করা হচ্ছে। এক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চারিদিক থেকে তাদের ভক্তেরা এসে জমায়েত হচ্ছে। ঠিক যেমন মুশরিক জাতিগুলো গমন করে তাদের ধর্মীয় তীর্থভূমে।

ইসলামে তাওহীদী আকীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট দু'আ (প্রার্থনা) করা বা আর কাউকে সম্বোধন করে দু'আ করা সুস্পষ্ট শিরক। ইসলামে তা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। কুরআনে আল্লাহ স্পষ্টভাবে সতর্ক করে বলে দিয়েছেন ঃ

- *"আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে ডাকছো তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়। বরং নিজের সাহায্যেও অক্ষম।" (সূরা আল আ'রাফ, ৭ঃ ১৯৭)*
- *"সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি তাঁরই (আল্লাহর) নিকট, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না।" (সূরা আল আন'আম, ৬ঃ ৫৯)*

সতর্কতা

নিজ ঘরে অশান্তির এটা একটা বড় কারণ হচ্ছে শিরকের প্রশ্রয় দেয়া। একটা কথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কিছু করার বা দেয়ার ক্ষমতা নেই, সে যতো বড় ওলি বা বুজুর্গই হোক না কেন। আমার ভাগ্যের পরিবর্তন যেমন ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রোমোশন, সন্তান-সন্ততি, বাড়ি-গাড়ি, রোগ-মুক্তি, আয়-উন্নতি, ব্যাংক-ব্যাল্যান্স, ফসলের উন্নতি, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট, স্বামী-স্ত্রীর মিল, বিদেশ গমন ইত্যাদি কোন পীর-মুর্শেদ বা কোন মাজার দিতে পারবে না। আর আমি যদি কোন কিছু পাওয়ার আশায় কোথাও যাই তাহলে সেটা হবে সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক। আমার যা কিছু চাওয়ার তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে হবে এবং ইন্‌শাআল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তা আমাদেরকে দিবেন।

আমরা জানি শিরকের গুনাহ আল্লাহ তা'আলা কখনোই ক্ষমা করবেন না। তাই কিভাবে আমরা শিরকের সাথে লিপ্ত থেকে জীবনে সুখি হতে পারি? এবিষয়ে আমাদের উচিত সামান্য হলেও পড়াশোনা করা। আমাদের জানা উচিত কী কী কাজে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক হয়ে যাচ্ছে। শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের লিখা The Way is One বইটি পড়া যেতে পারে।

অমুসলিমদেরকে বিয়ে করা

অমুসলিম জাতি দু'ভাগে বিভক্ত। ১) আহলি কিতাবের অনুসারী। ২) যারা আহলি কিতাবের অনুসারী নয়। এখানে আহলি কিতাবের অনুসারী বলতে বুঝানো হয়েছে, যারা আসমানী কিতাবের অনুসারী তাদেরকে। যেমন খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদী। কুরআনে এ দু'শ্রেণীকে আহলি কিতাব নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিম পুরুষদের কেবল আহলি কিতাবের অনুসারী নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো। (সূরা আল মায়িদা, ৫ ঃ ৫)

কিন্তু কোনো মুসলিম নারীর কোনো আহলি কিতাবের অনুসারী পুরুষের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। অবশ্য মুসলিম পুরুষদের জন্য আহলি কিতাবের অনুসারী নারী বিয়ে করা বৈধ হলেও এখানে একটি বিশেষ বিষয় রয়েছে যা উপরের আয়াতে সুস্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে আর তা হচ্ছে মেয়েটিকে অবশ্যই সচ্চরিত্রা হতে হবে। আমরা যারা বিদেশে থাকি তারা সকলেই জানি যে আহলি কিতাবের সচ্চরিত্রা মেয়ে পাওয়া দুর্লভ। ওয়েস্টার্ন কালচারে এমন কোন মেয়ে পাওয়া যাবে না যে বয়ফ্রেন্ডের সাথে সহবাস করেনি। তাই বিয়ে করার জন্য শুধু আহলি কিতাব হলেই হবে না। আরো একটি বিষয় রয়েছে যে, আহলি কিতাব মানে কিতাবের অনুসারী হতে হবে। এবার কয়টি মেয়ে পাওয়া যাবে যে সে তাদের কিতাব অনুসরণ করে চলে। যারা মূর্তি পূঁজা করে বা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদের সাথে মুসলিম ছেলে বা মেয়ের বিয়ে নিষেধ যতক্ষন পর্যন্ত না সে ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"মুশরিক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে না। মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তার চেয়ে উত্তম। মুশরিক পুরুষরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমরা (তোমাদের নারীদের) বিয়ে দিবে না। মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২২১)

পর্দার উপকারিতা

১. পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের অন্তরকে শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত রাখে।

২. নারী-পুরুষকে ব্যভিচার ও নোংরামি থেকে মুক্ত রাখে।

৩. নারী-পুরুষের উভয় জীবনকে আদর্শিকভাবে সফল, সুশৃঙ্খল করে।

৪. সতী-সাধ্বী নারীরা দুশ্চরিত্রবান উদ্দেশ্যমূলক মন্দ চাহনি বা অপবিত্র চক্ষু থেকে হিফাযতে থাকে।

৫. সতী-সাধ্বী নারীদের সন্তান-সন্ততির প্রতি কারো সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ থাকে না।

৬. এতে মানব বংশ পূতঃপবিত্র থাকে।

৭. পর্দানশীল নারীর সতীত্ব ও পবিত্রতা স্বামী ও তার বংশের লোকদের নিকট নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হয়। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়।

৮. এতে নারীর শারীরিক সৌন্দর্য ও কমনীয়তা অক্ষুণ্ন থাকে।

৯. পর্দা নারীর মান-সম্মান ও তাদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রতীক।

১০. পর্দা নারীদের আভিজাত্যের প্রতীক।

১১. পর্দা লজ্জা ঢেকে রাখার উত্তম পন্থা।

১২. পর্দা নারী ও পুরুষ উভয়ের সচ্চরিত্র গঠনে সহায়ক।

১৩. পর্দা নারী ও পুরুষকে আল্লাহমুখী এবং যথাযথভাবে আমল করার সুযোগ করে দেয়।

১৪. পর্দা ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত বিরূপ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকতে পারার ফলে সকল ধরনের অসংগত মানসিক চিন্তা এবং যৌন রোগ থেকে নারী পুরুষ উভয়ই মুক্তি পায়।

১৫. পর্দা সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থ্য ও কল্যাণময় করে তোলে। সেইসাথে নারীদের সম্মান মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে বলে পুরুষরা তাদেরকে যৌতুকবিহীন বিয়ে করতে ইচ্ছা পোষণ করে। তাছাড়া এক শ্রেণীর যুবক যারা পর্দা সংরক্ষণ করে মহান আল্লাহর আদেশ পালনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, তাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি এই অগাধ ভক্তি ও আল্লাহর আদেশ পালনে মাথানত দেখে তাদের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে থাকে। ফলে এ বিয়ের ক্ষেত্রে সবকিছু সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেয়ার সমূহ ব্যবস্থা খুব সহজেই হয়ে যায়। আর এভাবেই পর্দা সমাজ জীবনকে সুস্থ্য রাখতে সক্ষম হয়। সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিয়েতে যে যৌতুক দাবি

করার এক অশুভ প্রতিযোগিতা রয়েছে তা হবু স্ত্রীকে পর্দা করতে দেখে, আল্লাহর আদেশ পালন করতে দেখে নিজে যৌতুক দাবি করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করবে এমন দুঃসাহস মুসলিম স্বামী মাত্রই দেখাতে চায় না। এতে কন্যা দায়গ্রস্ত হওয়া থেকেও মানুষ মুক্ত থাকতে পারে।

সমাজ ও দাম্পত্য জীবনে পর্দার গুরুত্ব

প্রত্যেক নর-নারীর সম্ভ্রম ও সম্মান প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে পর্দা এমন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার বাস্তবতা মানবজীবনে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কেউ করুক আর নাই-ই করুক এক্ষেত্রে সকলে একমত কোনো পরিবারের মানসিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত হলো পর্দা। চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের এ এক পরম সম্পদ। আর তাই পর্দার নীরব বিরোধী, পর্দার সরব বিরুদ্ধাচরণকারী ও যুক্তি তর্ক প্রদানকারী বিশাল এ জনগোষ্ঠীর লোকজনও পর্দাহীনতার কুফল থেকে মুক্ত থাকতে চায়। এজন্যই সর্বত্র পর্দা একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

পর্দা মেনে না চলার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী পুরুষের মাঝে বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে যা আমরা দৈনন্দিন শুনে থাকি এবং বহু ঘটনা দৈনিক পত্রিকাগুলোতে অহরহ পাঠ করছি। একথা সত্য যে আজকের সমাজে যাদের মধ্যে বেপর্দার প্রচলন বেশী, সেসব লোকই এ জাতীয় দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে বেশী। সমাজের ঘটমান এ চিত্রগুলোর দিকে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথাটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এর একমাত্র কারণ হচ্ছে বেপর্দা বা পর্দাহীনতা। যার উৎপত্তি ঘটে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা বা কাছাকাছি যাওয়ার সুবাধে। এজন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা পর্দাকে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয করে দিয়েছেন।

সুতরাং পর্দা শুধু নাবী পত্নীদের জন্যই নয়, পর্দার হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে আগত সমস্ত মুসলিম নারীর জন্যই সমান এবং একই রকম। কেউ কেউ কুরআনে বর্ণিত সূরা আহযাব-এর ৩৩ নম্বর আয়াতকে প্রামাণ্য দলিলরূপে পেশ করে থাকেন। তাদের দাবি উক্ত আয়াতে শুধু নাবী পত্নীদেরকে সম্বোধন করে পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই শুধু তারাই এ ব্যাপারে আদিষ্ট অন্য কেউ নয়। কী চরম বোকামী বা মূর্খতা! তাদের এ দাবি বর্ণনাভিত্তিক ও বুদ্ধিভিত্তিক উভয় দিক থেকে অপাংক্তেয় এবং ভুল। কেননা এ আয়াত দ্বারা শরীয়াতের

আরো বেশ কিছু আহকাম প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন তন্মধ্যে একটি এই যে, আইয়ামে জাহিলিয়াতের নারীদের অনুরূপ সাজ-সজ্জা করে বের হয়ো না।

এবার এ নির্দেশটি কি শুধু নাবী পত্নীদের জন্য নির্ধারিত? আর অপরাপর নারীদের জন্য কি এটার অনুমতি আছে যে, আইয়ামে জাহিলিয়াতের মেয়েদের মতো তোমরা সাজ-সজ্জা করে বের হও?

অথচ একথা স্পষ্ট যে, অপরাপর মেয়েদের জন্যও এ অনুমতি থাকতে পারে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা একটু সামনে গিয়ে আরেকটি হুকুম দিয়েছেন। "তোমরা সলাত কায়েম করো।" এখানে সালাত কায়েম করার হুকুমও কি তাহলে শুধু নাবী পত্নীদের সাথেই সম্পৃক্ত? অন্যান্যদের প্রতি কি সলাত কায়েম করার নির্দেশ নেই? এরপর আল্লাহ তা'আলা আরো এক হুকুম দিয়েছেন। "তোমরা যাকাত প্রদান করো।" তাহলে কি যাকাত দেয়ার হুকুম শুধু নাবী পত্নীদের উপর বর্তেছে? অন্য নারীদের কি যাকাত দিতে হবে না। আরো সামনে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অনুকরণ করো; আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ -এর অনুকরণ কি শুধু নাবী পত্নীদের জন্য আবশ্যক? অন্যান্য নারীর জন্য আবশ্যক নয় কী?

সুতরাং পুরো আয়াতের বিশ্লেষণ একথাই প্রমাণ করছে যে, এ আয়াতের মধ্যে যতগুলো আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে তা সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। বিশেষভাবে কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। যদিও বা সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ সম্বোধন নাবী পত্নীদের প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু তাদের মাধ্যমে গোটা উম্মাতই এ সম্বোধনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। আবার পর্দা প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বেপর্দা, নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশায় যে ফিতনা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে তার দ্বার রুদ্ধ করাই ছিলো হিজাব ও পর্দার উদ্দেশ্য। এখানেও প্রশ্ন জাগে ফিতনা কি শুধু নাবী পত্নীদের বাইরে যাওয়ার দ্বারাই সৃষ্টি হবে? নাঊযুবিল্লাহ।

মূলতঃ নাবী পত্নীগণ এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাদের মতো পূতঃপবিত্র পুণ্যাত্মা নারী ভূ-পৃষ্ঠের উপর আর ছিলো না। তাদের পক্ষ থেকেই কি ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিলো? তাদের কারণেই শুধু পর্দা প্রবর্তিত হলো? অপরাপর নারীদের পক্ষ থেকে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার মোটেও আশংকা নেই? বরং বলা যায়, যখন নাবী পত্নীদের প্রতি এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা পর্দার মধ্যে থাকো। তখন অপরাপর নারীর ব্যাপারে এ নির্দেশ আরো জোরালোভাবেই

আরোপিত হবে। কেননা তাদের পক্ষ থেকে ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা আরো শত গুণে বেশী। এছাড়াও অন্যত্র আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল নারীদেরকে সম্বোধন করে বলেন "হে নাবী! স্বীয় স্ত্রীদেরকে বলে দিন এবং স্বীয় কন্যাদেরকেও বলে দিন এবং সমস্ত মু'মিন মহিলাদেরকেও বলে দিন যে, তারা যেন নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর নিজেদের চাঁদরকে ঝুলিয়ে দেয়।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩ ঃ ৫৯)

স্বামীর সামর্থ্যের অতিরিক্ত দাবি

স্বামীর উপার্জন সম্পর্কে ধারণা রেখে তার কাছে সংসারের প্রয়োজনটুকু উপস্থাপন করা উচিৎ। মূলতঃ স্বামীর উপার্জনের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে অনেক অভাবের মধ্যে যেটি সবার আগে বা সময়ভেদে প্রথম পূরণ করা উচিৎ তাই স্বামীর কাছে পেশ করা উত্তম। যেমন মনে করি, ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করা দরকার, স্কুল ড্রেস, স্কুলে বই বহন করার ব্যাগ, নতুন শ্রেণীর বই ও খাতা ক্রয় করা দরকার। বাসা ভাড়া দেয়া দরকার। বাসার আনুষঙ্গিক খরচ করা দরকার। আবার মেরিজ ডে আসছে এতে স্ত্রীর জন্য উপহার হিসেবে অলংকার বা দামি শাড়ি স্ত্রীর দাবি। নইলে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে তার ইজ্জত সম্মান সব ধূলোয় মিশে যাবে।

এখন স্বামীর আয় অনুসারে সব প্রয়োজন একসাথে পূরণ করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আদর্শবান স্ত্রীর দায়িত্ব হলো এতসব অভাব ও চাহিদার মধ্যে সময়ের দাবি অনুসারে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা স্বামীর সামনে পেশ করা। অর্থাৎ ছেলের ভর্তির সময় অনুযায়ী তাকে স্কুলে ভর্তি করানোর বিষয়টি স্বামীর কাছে সবকিছুর আগে তুলে ধরা জরুরী। তারপর স্কুল ড্রেস ও কয়েকটি বই ও খাতা ক্রয়, তারপর বাসার ভাড়া এবং বাসার কিছু আনুষঙ্গিক খরচ করা। এরপর সম্ভব হলে স্ত্রী স্বামীকে বলে অনৈইসলামী অনুষ্ঠান মেরিজ ডে এ ধরনের প্রোগ্রাম ও কেনাকাটা বাদ দেয়াই উত্তম। আদর্শবান স্ত্রী এমনই হওয়া দাবী।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু কতিপয় স্ত্রী স্বামীকে বলে কোথা থেকে টাকা আনবা কিভাবে দিবা তা জানি না। কিন্তু আমার এটা দরকার। এটা না হলে আমার ইজ্জত যাবে ইত্যাদি। যা দুঃখজনক এবং এমন পরিবারে অশান্তি আসাই যুক্তিযুক্ত। আসলে সত্যি কথা বলতে কি অভাব কখনই শেষ হয় না। একটি অভাব পূরণ না হতে হতেই অন্য অভাব তার স্থান দখল করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভাষায় অভাবের বৈশিষ্ট হলো অভাব অসীম কিন্তু এ অভাব পূরণের

জন্য যে সম্পদ দরকার তা সসীম। আর এ অবস্থায় কেবলমাত্র অল্পে তুষ্ট ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ত এবং আল্লাহর কাছে অভাব পেশ করে সাহায্য কামনায় পারিবারিক শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

স্বামীর কাছে কোনো কিছুর দাবী পেশ না করে আল্লাহর কাছে দাবী পেশ করাই পরিবার ও পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান ও একমাত্র দিক। এ ধরনের পরিবারে অশান্তি তথা স্বামী স্ত্রীর মাঝে কোন ধরনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে না। তবে এমন চরিত্রের আদর্শবান স্ত্রী পাওয়া যায় যে, পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ যে সত্যি কোন কোন স্বামীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত স্বরূপ। যাহোক সবাইতো আর এরকম হয় না। মানবজীবনে এই ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে তাই মহান আল্লাহ তা'আলা নাবী কারীম ﷺ -এর পারিবারিক জীবনেও এধরনের একটা সমস্যা দিয়ে তার সমাধান আমাদেরকে শিক্ষাস্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন। একবার তিনি স্ত্রীদের দাবী পূরণে অসন্তুষ্ট হয়ে স্ত্রীদের থেকে আলাদা হয়ে রাত কাটান। আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ সূরা আহযাবের ২৮-২৯ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

"হে নাবী, স্ত্রীদের বলে দিন যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও তার জাকজমক কামনা কর তবে আসো তোমাদেরকে কিছু সহায় সম্পদ দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, রসূল ও আখিরাতের বাড়ী চাও তাহলে তোমাদের মধ্যেকার পূর্ণশীলদের জন্য বিরাট পুরস্কার তৈরী করে রাখা হয়েছে।"

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে নাবী পত্নিগণ ধৈর্যের পথকেই গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এ ধরনের অবস্থায় কুরআন স্বামীকে সাধ্যমত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। আর স্ত্রীদেরকে স্বামী যতটুকু দিতে পারে ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। তাই কিয়ামত পূর্ব পর্যন্ত আগত সকল নাবী পত্নীদের অনুকরণে আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুনিয়ার প্রাপ্তিকে পদোদলিত করতে পারলে কোন পরিবারে পারিবারিক জীবনে কোন অশান্তির ছায়া পড়তেও পারে না।

অভাব ও দারিদ্রতায় স্বামীকে অবমূল্যায়ন করা

স্বামীর গাড়ী নেই, ঢাকায় বাড়ী নেই, ফ্ল্যাট নেই, ছোট একটা অন্ধকার প্রকোষ্ঠ সমতুল্য জায়গায় ভাড়া থাকে। গৃহের অভ্যন্তরে ফ্রিজ নেই, ওয়াশিং মেশিন

নেই, মাইক্রোওয়েভ ওভেন নেই, কিচেনে উন্নত মান-সম্পন্ন উপকরণ নেই, দামী সোফা সেট নেই, বক্স খাট নেই, দামী আলমারী নেই, স্বামী পর্দার কথা বলে কিন্তু দরজা-জানালায় মানানসই পর্দার কাপড় নেই, বিগ সাইজের টেলিভিশন নেই। সন্তানদের নিয়ে স্কুলে যেতে কষ্ট হয়। কোথাও কোন পার্টিতে যেতে দামী শাড়ী এবং ডায়মন্ডের অলংকার দরকার তাও নেই ইত্যাদি অভাব অভিযোগ এক শ্রেণীর সৎ কর্মজীবি মানুষের পরিবারের।

এ পরিবারে কর্তা ঘুষ নেন না বা অবৈধ আয় করেন না। আল্লাহ ভীরু অত্যন্ত সৎ ও সহজ-সরল জীবনযাপন করেন। সুদ ও সুদী প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন লেনদেন নেই। কারও সম্পদের প্রতি তার কোন লোভও নেই। এ জন্য স্ত্রীর দাবী তিনি কর্মঠ নন। চালাক চতুর নন, তিনি বলদ তিনি গাধা ইত্যাদি। কেননা ঐ অফিসের একই পদে চাকুরী করে আরেকজন ভাইয়ের বাসায় কোন কিছুর ঘাটতি নেই। গাড়ী, বাড়ী ও তাদের সবই আছে। এ অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর সাথে দণ্ড কলহে জড়িয়ে থাকে। স্ত্রী স্বামীকে এটা সেটা বলে আর স্বামী চুপচাপ থাকে। কখনও বা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বলে। এটি হচ্ছে এক ধরনের অভাব ও দরিদ্র পরিবারের বাস্তবতা।

এ ধরনের সম্পদ লোভীদের প্রসঙ্গে রসূল ﷺ সতর্ক করে বলেন, দু'টো ক্ষুদার্থ নেকড়ে বাঘকে বকরির পালে ছেড়ে দিলে তারা এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না। এর জন্য অর্থ ও যশের মোহ তার দ্বীনের যতটুকু ক্ষতি করতে পারে (তিরমিযী)।

তাদের জন্য সতর্ক করে রসূল ﷺ বলেন, তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির পশ্চাদ গমন করে থাকে। দু'টো ফিরে আসে কিন্তু একটি থেকে যায়। তার পিছন পিছন তার পরিবার-পরিজন তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল যায়। অনন্ত পরিবার-পরিজন এবং ধন-দৌলত ফিরে আসে। কিন্তু আমল তার সাথে থেকে যায়। (তিরমিযী)।

তারপর রসূল ﷺ সবাইকে সতর্ক করে বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক উম্মতের একটি ফিতনা রয়েছে। আমার উম্মতের ফিতনা হলো ধন-সম্পদ (তিরমিযী)।

অন্যত্র এমন লোভীদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কোন আদম সন্তানের যদি এক উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে তবে অবশ্যই সে দ্বিতীয় আরেকটি চাবে। মাটি ছাড়া আর কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারবে না।

স্বামীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন না করা

স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি আন্তরিকতার সাথে মুহব্বত ভালোবাসা প্রদর্শন না করে। স্বামীর সাথে আনন্দ মুর্হূতে যোগ না দেয়, স্বামীর সাথে সকল বৈধ কাজে সহযোগিতা না করে তখন তাদের পারিবারিক জীবন অশান্ত হওয়া স্বাভাবিক।

ছোটখাট জিনিস ধরা ও তর্ক-বিতর্ক করা

ছোটখাট বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা, যুক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে মিছামিছি বিজয়ী করার প্রবণতা দুঃখজনক। এ ধরনের প্রবণতা স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের চরিত্রেই থাকতে পারে। যা পরিবার ও পারিবারিক জীবনে অশান্তির অনেক বড় কারণ। তাই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ছোটখাট জিনিস বা বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা সমর্থন করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি তার নফসকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠাতে পারল সেই সফলকাম।" (সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৬)

পরিবার ও পারিবারিক জীবনে এরকম খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে অনেক সময় মনোমালিন্য হয়ে থাকে। তাই এসব ছোটখাট বিষয়ে বিতর্ক করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মানুষের চিরশত্রু শয়তানকে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া অনুত্তম। এটি শান্তির বিপরীতে অশান্তির নমুনা। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সতর্ক থাকা আবশ্যক। তবে একথাও সত্য স্বামী কোনো আদেশ দিলে স্ত্রী যদি তা পালনে অস্বীকার করে, তাকে দেখে যদি স্বামী আনন্দ না পায়, কোনো শপথ করলে তা যদি স্ত্রী পূরণ না করে, আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের প্রতিও স্বামীর ধনসম্পদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমে আসা তো উচিতই বটে।

আসলে পরিবার জীবনে শুভ-অশুভ বলতে আমাদের প্রিয় নাবী ﷺ তিনটি জিনিসের কথা বলেছেন। নাবী ﷺ একবার বলেন ঃ

“অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। অবশ্য তিনটি জিনিসে শুভ লক্ষণ আছে; স্ত্রীলোক, ছোড়া ও বাড়ি।” (সুনান ইবনে মাজাহ) তারপর রসূল ﷺ আবারও বলেন ঃ ‘‘কুলক্ষণ বলতে কিছু থাকলে তা ছোড়া, স্ত্রীলোক ও ঘরেই থাকতো।” (সুনান ইবনে মাজহা)

উল্লিখিত হাদীস দু’টি থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো-স্ত্রীলোক পরিবার ও পারিবারিক জীবনে শুভলক্ষণ বয়ে আনতে পারে আবার এই স্ত্রীলোকই পরিবার ও পারিবারিক জীবনে কু-লক্ষণ বয়ে আনতে পারে। অর্থাৎ যেসকল স্ত্রীলোক স্বামীর মন বুঝে স্বামীকে কষ্ট না দিয়ে সুন্দর করে কথা বলে, স্বামীর প্রতি খুব খেয়াল রাখে, স্বামীকেই তার জীবনের সবকিছুর সাথী হিসেবে গ্রহণ করে, স্বামীর প্রতি তার নিজেকে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করে সেই পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাওয়া নিশ্চিত।

আর যেসকল পরিবারে স্বামী বলে একটা; স্ত্রী বলে তিনটা; স্বামীর সাথে সুন্দর করে কথা বলে না; স্বামীকে কোণঠাসা করতে পারলে নিজেকে সার্থক মনে করে; সে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অশান্তি বিরাজ করা স্বাভাবিক। স্বামীকে সুস্থ সুন্দর কর্মদ্দোম ও উৎফুল্ল রাখতে একজন স্বামীপরায়ণা স্ত্রীর বিকল্প নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য কোনো কোনো স্ত্রী শুধু একটা কথা অর্থাৎ যে কথা বলার কারণে স্বামীর পুরো দিনটি সুন্দরভাবে অতিবাহিত হতে পারে সেই কথাটুকুও সুন্দর করে বলতে চায় না; বলে না। ফলে দিনের শুরুতেই স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে স্বামীর সমস্ত দিনটি অতিবাহিত হয় মন খারাপ ও মন্দ কর্ম দিয়ে-যা দুঃখজনক।

একে অপরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝি

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝির ফলে অনেক সময় পারিবারিক জীবনে অশান্তি বিরাজ করে। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন খুলে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে দুর্বলতাই প্রধান কারণ হিসেবে দেখা দেয়। স্বামী বা স্ত্রীর কোনো কাজের ফলে কখনো কারো মনে মন্দের সৃষ্টি হলে পরবর্তীতে তা বিভিন্ন ছোটখাট কারণে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। কালক্রমে তা বিষয়টি অন্তর্দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করে। অথচ এরকম সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করার জন্য উভয়েই এগিয়ে আসা উত্তম।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে পরামর্শ না করা

অনেক স্বামীদের অভিযোগ স্ত্রীদের সাথে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করলে বা পরিবার গঠনের কোনো সিদ্বান্তের কথা জানালে তারা তা অন্যের কাছে ব্যক্ত করে দেয়। স্ত্রীরা কখনোই স্বামীর কোনো বিষয় নিজের কাছে গোপন রাখতে পারে না। তাই স্বামী-স্ত্রীর সাথে সাংসারিক জীবনের কোনো বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতে চান না। কিন্তু স্ত্রীরা তা মানতে নারাজ। তারা নিজেদের দুর্বলতা দেখেন না, বরং স্বামী তাদের সাথে পরামর্শ করে না, পারিবারিক কল্যাণের কারণে।

নিজের বাবার বাড়ির বড়াই না করা

আজকাল কতিপয় স্ত্রী আছেন যারা কথায় কথায় নিজের বাবার বাড়ির বড়াই করে- যা অনৈসলামিক। বড়াই বা গর্ব-অহংকার করা ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন কিছু একদমই পছন্দ করেন না। তাইতো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"ভাল ও মন্দ বরাবর নয়। তুমি ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করো। ফলে তোমার সাথে যার শক্রতা আছে সে হয়ে যাবে তোমার পরম বন্ধুর মতো। আর এহেন সুফল তার ভাগ্যেই জোটে যে ধৈর্য ও সহনশীলতার অধিকারী এবং যে বিরাট সৌভাগ্যশীল।" (সূরা হামীম আস সাজদা, ৪১ ঃ ৩৪-৩৫)

সুতরাং মহান আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন না তাতো ধর্মীয় জ্ঞান যাদের আছে তাদের কারোর কাছেই পছন্দ হওয়ার কথা নয়। এমনকি যে স্ত্রী তার বাবার বাড়ির অট্টালিকা বা প্রাচুর্যের বড়াই করে তার কাছেও অন্যরা এমনটি করলে তার পছন্দ হবে না। যাহোক কতিপয় স্ত্রীরা আছেন তা করতে পছন্দ করেন। কিন্তু মতামত হলো- ধরে নিলাম স্ত্রীর কথাই সত্য স্ত্রীর বাবা ভাইয়ের অনেক আছে কিন্তু স্বামীর হয়তো এত নেই যার জন্যে স্ত্রীর এত দুঃখ কিন্তু তার বাবা ভাইয়েরা কী দেখে বিয়ে দেয়নি? স্বামীর এত সম্পদ নেই, হতেই পারে কিন্তু তাই বলে সে এখন কী অবৈধ আয় করবে? অন্যের হক হরণ করবে?

আসলে আল্লাহভীতি আছে এমন স্বামীর পক্ষে কোনোটিই সম্ভব নয়। কাজেই স্বামীর বাড়িতে যা আছে, স্ত্রীর যতটুকু চাহিদা পূরণ করতে পাড়ছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাইতো উত্তম। অন্যথায় স্ত্রীর অহংকার যাবে রসাতলে। আবার বাবার বাড়িতে আরো থাকলেও তাতো বিয়ের পর এখন আর স্ত্রীদের নেই। মূলতঃ

বিয়ের পর স্বাভাবিক নিয়মে তো স্ত্রীর জন্য স্বামীর বাড়িই নিজ বাড়ি হয়ে যায়। আর স্ত্রীর বাবার বাড়ি হয়ে যায় নিকটতম আত্মীয়ের বাড়ি। এটাইতো বাস্তবতা।

কিন্তু দুঃখজনক হলো আজকাল এক শ্রেণীর স্ত্রীরা তাদের স্বামীর বাড়িতে এসে বাবার বাড়ির বড়াই এমনভাবে করে যে স্বামী তখন বলে-তোমার বাবা দেখে বিয়ে দিতে পারেনি। তোমার যখন এত চাহিদা তখন আমাকে তোমার স্বামী হিসেবে নির্বাচন না করলেই পারত! আবার কেউ কেউ বলে, যাও নিয়ে আস। নিয়ে আসলেই তো হয়। এত আছে, এত আছে বল কিন্তু বিয়ের সময় কী দিয়েছে, দেখছি না, এভাবে শুরু হয় দ্বন্দ্ব-কলহ। আবার কেউ বলে, যাও বাবার বাড়িতে গিয়ে থাক। তোমার বাবার বাড়িতে অট্টালিকা আছে আমার বাড়িতে নাই তো তোমার বাবা বিয়ে দিল কেন? তোমাকে ঐ বাড়িতেই রেখে দিতো! (নাউযুবিল্লাহ) ইত্যাদি অনেক নাজায়িয কথাবার্তা হতে হতে এক পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সবচেয়ে নিকৃষ্টতম পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায়।

কাজেই আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত, ইসলাম বড়াই করা, অহংকার করা পছন্দ করে না, কোনোভাবেই সমর্থন করে না। যেখানে ইসলাম বিরোধী এ কাজটি হবে সেখানে দ্বন্দ্ব শুরু হবে। তাই এমনটি না করাই উত্তম। এসব থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সচেতন থাকা আদর্শ পরিবার জীবনের জন্যই জরুরি।

দাম্পত্য সম্পর্কের ৫০টি গুরুতপূর্ণ বিষয়

১. সুন্দর সম্পর্ক নিজে থেকেই তৈরি হয় না, সেটি তৈরি করতে হয়। তাই নিজেকেই সেটি তৈরি করতে হবে।

২. কর্মক্ষেত্রেই যদি আমি সবটুকু কর্মক্ষমতা নিঃশেষ করে ফেলি, তাহলে আমাদের দাম্পত্য জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. আমার উৎফুল্ল আচরণ হতে পারে আমার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর জন্য খুব দামি একটি উপহার।

৪. একইসাথে ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা ঠিক নয় নয়।

৫. আসুন জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর ব্যাপারে বন্ধুদের কাছে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকি। মনে রাখা উচিত যে বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া দাম্পত্য সম্পর্কে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

৬. দাম্পত্য জীবনে তা-ই নিয়ম যা দু'জনের পছন্দের ভিত্তিতে ঘটে।

৭. সাময়িক ঝগড়া বিবাদের কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় না। মনের মধ্যে জমে থাকা চাপা ক্ষোভ আর যন্ত্রণাই দাম্পত্য জীবনকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়।

৮. দাম্পত্য সম্পর্কে, "কী পেলাম?" এর হিসাব মেলানোর জন্য নয়। বরং সঙ্গী/সঙ্গিনীকে "কী দিতে পেরেছি," সেটাই দাম্পত্য সম্পর্কের মূল কথা।

৯. "জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী হিসেবে আমি সর্বোত্তম"-এমনটি মনে হওয়া অতি আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ। এমনটি মনে হলে নিজেকে যাচাই করা উচিত।

১০. সংসারের ক্রমাগত আর্থিক স্বচ্ছলতার অর্থ এই নয় যে দাম্পত্য জীবনও সুখের মধ্য দিয়ে কাটছে।

১১. যদি দু'জনের মাঝে বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই বিশ্বাস জোড়া দেয়ার সময় এখনও পার হয়ে যায়নি। এজন্য যেকোনো সময়ই উপযুক্ত সময়।

১২. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা নিয়ে তর্ক হয় তাতে আসল বিষয় থাকে না।

১৩. ভালোবাসা কেবলমাত্র অনুভূতি নয় বরং আমাদের কাজের মাধ্যমেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

১৪. বেশী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনের হতাশা ও অতৃপ্তিকে বাড়িয়ে দেয়।

১৫. দাম্পত্য জীবনের অনেক তর্কই হয়ত এড়িয়ে যাওয়া যায় না, তবে ক্ষতিকর বিতর্ক এড়িয়ে যেতেই হবে।

১৬. জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর প্রতি গভীর মনোযোগ পরস্পরের জন্য হতে পারে অমূল্য উপহার।

১৭. অনেক সময় সুখী দম্পতিরাও ভাবেন যে তারা ভুল মানুষটিকে বিয়ে করেছেন।

১৮. আমার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনী আমাকে সুখী করার শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে না পারলেও তিনি আমার সুখী হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

১৯. মিথ্যা বলে হয়ত সামান্য কিছু সুবিধা পাওয়া যায় কিন্তু পরিণামে মিথ্যা বলার জন্য সুবিধার চেয়ে অনেক বেশী চড়া মূল্য দিতে হয়। অতএব, মিথ্যা বলা বর্জন করাই উত্তম।

২০. আমার মতামত যে সবসময় সঠিক এমনটি ভাবা ঠিক নয়।

২১. বছরের পর বছর ধরে যে বিশ্বাস নিজেরা গড়ে তুলেছি তা এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাই সাবধান।

২২. সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অপরাধবোধকে দীর্ঘায়িত করে তার অনুভূতি নিয়ে খেলা করে যা পেতে চাই তা কখনো পাওয়া যায় না, পাওয়া যাবে না ।

২৩. ইসলামী মন-মানসিকতা সম্পন্ন বন্ধুদেরকে অবহেলা না করে তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের সাথেই উঠাবসা করা উচিত ।

২৪. যদি মনে হয়, 'তুমিই আমার জন্য সঠিক মানুষ, যাকে আমি বিয়ে করেছি', তাহলে মনে করতে হবে আমি ঠিক পথেই আছি ।

২৫. নিজের যুক্তিতে প্রমাণ করার প্রলোভনকে দমন করতে পারলে একে অপরের জীবন সহজ হয়ে যাবে ।

২৬. হৃদয়ের উদারতা একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের প্রধান ভিত্তি ।

২৭. সঙ্গী বা সঙ্গিনী যদি কোনো রক্ষণাত্মক আচরণ করে, তাহলে তার রক্ষণাত্মক হওয়ার পক্ষে কারণ খুঁজে দোষ ধরার প্রয়োজন নেই ।

২৮. বৈবাহিক জীবন কোন অসম্পূর্ণ বিষয় নয় এটা এক পরিপূর্ণ সমাধান ।

২৯. দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি কোন কিছু এখনও পরিশোধ করতে নাও পারি । তবে যত দেরিতে তা করবো, ততবেশি ক্ষতি হতে পারে ।

৩০. সুন্দর বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন ।

৩১. ক্ষমা কোন সাময়িক গুণ নয় বরং ক্ষমা একটি চলমান প্রক্রিয়ার নাম ।

৩২. দাম্পত্য জীবনের কঠিন সময়গুলো আমাদেরকে একজন ভালো মানুষ করে গড়ে তুলবে ।

৩৩. বিয়ে অনেকটা রকেট উৎক্ষেপণের মতো । যখন তাতে মাধ্যাকর্ষণ টান পূর্ণ থাকে, তখন ফ্লাইট খুব সামান্য জ্বালানীতেই চলতে থাকে ।

৩৪. দাম্পত্য জীবনে সাফল্য পেতে হলে অতীতে কী হয়েছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ভবিষ্যতের করণীয় নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে ।

৩৫. সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে । কৃতজ্ঞতা বোধকে নিজের ভেতর চেপে রাখা ঠিক নয় ।

৩৬. বাস্তবতার খাতিরে মাঝে মাঝে নীরবতা পালন করা উচিত ।

৩৭. সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছে আমার সর্বোত্তম প্রশ্নগুলোর একটি হতে পারে, "আমি কীভাবে তোমাকে আরও বেশী ভালোবাসতে পারি?"

৩৮. চাইলেই দাম্পত্য জীবনকে চিরসবুজ করে রাখা যায় ।

৩৯. যৌক্তিক অনুমানের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে । তবে পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে অনুমানকে যাচাই করে নেয়াই আবশ্যক ।

৪০. মনের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যই সবকিছু নয় কিন্তু সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি।

৪১. সার্থক যৌনসম্পর্ক সার্থক দাম্পত্য সম্পর্কের নিশ্চয়তা দেয় না তবে তা সার্থক দাম্পত্য সম্পর্ক নির্মাণে সহায়তা করে।

৪২. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করলে তা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষতি করে না। তবে সন্দেহজনক বিষয় নিয়ে লুকোচুরি করলে তা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষতি করে।

৪৩. সঙ্গী/সঙ্গিনীকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবণতা এবং ঈর্ষাপরায়ণতার জন্ম হয় ভয় থেকে, ভালোবাসা থেকে নয়।

৪৪. বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্যতার জন্ম দেয় এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে।

৪৫. স্বামী বা স্ত্রী যদি কোনোকিছুকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তাহলে তা দু'জনেরই জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৪৬. দাম্পত্য সম্পর্কে প্রেমাবেগের প্রয়োজন কখনো ফুরিয়ে যায় না।

৪৭. নতুন সম্পর্কের ঔজ্জ্বল্য সবসময়ই ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে।

৪৮. নীরবতাও আক্রমণাত্মক হতে পারে যখন তা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪৯. উত্তম হলো নিজে কীভাবে সঠিক কাজটি করতে পারি সেদিকে মনোযোগ দেয়া। তারপর নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ভুলের দিকে মনোযোগ দেয়া।

৫০. দাম্পত্য সম্পর্ককে মানিয়ে নেয়া একেবারেই অসম্ভব মনে হলে, কেবল তখনই বিচ্ছেদের দিকে পা বাড়ানো উচিত। এই কাজটি আল্লাহ খুব অপছন্দ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের মৌলিক দুর্বলতা এবং সমাধান

আসুন নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি

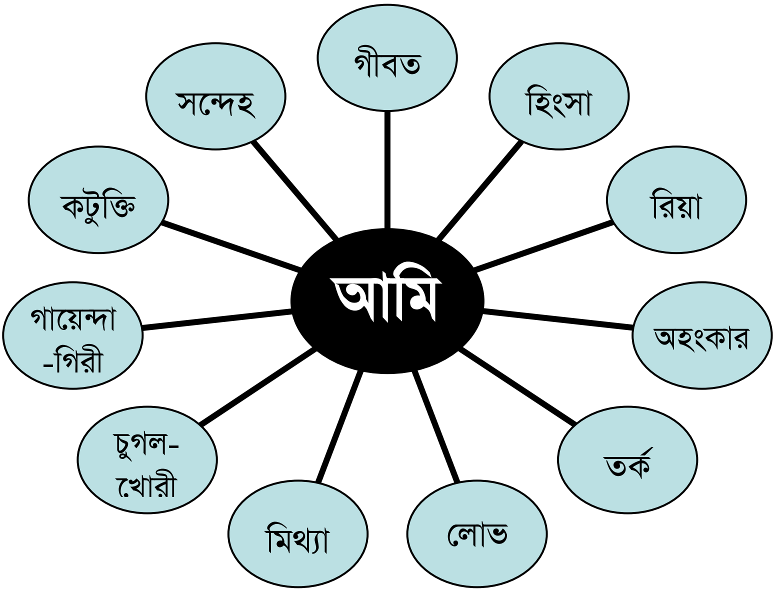

খুব গভীরভাবে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি, উপরের দোষত্রুটিগুলো আমার মধ্যে কোনটা কতটুকু আছে এবং নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা কমিয়ে নিয়ে আসি এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই ।

আমাদের একটা বদঅভ্যাস আমরা নিজের চেয়ে অন্যকে নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই। সাধারণতঃ নিজের দিকে না তাকিয়ে শুধু অন্যে কি করল সেটার দিকে বেশী জোর দেই। এবং নিজে সংশোধন না হয়ে অপরকে বেশী বেশী উপদেশ দিতে পছন্দ করি। আর কেউ যদি ভাল মনে করে আমার ভুল ধরিয়ে দেয় তাহলে তার উপর ক্ষেপে যাই। সূরা বাকারার ৪৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

"তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করো কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাকো অথচ তোমরা কুরআন পড়ো। তোমরা কি ভাবো না?" তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়ে আরো বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা নিজেরা করো না? আল্লাহর নিকট এটা ঘৃনা উদ্রেককারী যে তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা করো না।"(সূরা সফ ঃ২-৩)

আসুন আমরা নিজেকে নিয়ে প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে এক ঘন্টা আত্মসমালোচনা করি। এতে করে নিজের অনেক ভুল-ভ্রান্তি বের হয়ে আসবে এবং সেই সাথে আসবে নিজের মনে অনুশোচনা ও খুলে যাবে তাওবার পথ। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন।

গীবত (পরনিন্দা) এবং বাক সংযমের নির্দেশ

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা একে অপরের পেছনে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাও? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

একদা রসূল ﷺ বললেন, "তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে?" লোকেরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তাই তার পেছনে আলোচনা করা।" বলা হল, 'আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার রায় কী? (সেটাও কি গীবত হবে?)' তিনি বললেন, "তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তার গীবত করলে। আর তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে।" (সহীহ মুসলিম)

চুগলখোরী ও গীবত কী ঃ একের কথা অপরকে বলে উভয়ের মাঝে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা ও ঝগড়া ফ্যাসাদ লাগিয়ে দেয়ার নাম চুগলখোরী।

গীবত আরবী শব্দ যার অর্থ পরনিন্দা, কুৎসা রটনা করা, অন্যের দোষক্রটির কথা প্রকাশ করা। কারো অনুপস্থিতিতে এমন কোন দোষের কথা বলা যা সে শুনলে মনে কষ্ট ও দুঃখ পাবে। কাউকে ইঙ্গিত করে কটাক্ষ করে কথা বলাও যাবে না, কেননা এটা গীবতের অন্তর্ভূক্ত। গীবত যে আগুন জ্বালায় চুগলখোর তাকে বিস্তৃত করে নতুন দিকে ছড়িয়ে দেয়, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা একটা মারাত্মক অপরাধ।

গীবত (পরনিন্দা) হারাম

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

তিনি আরো বলেছেন, "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী (ফিরিশতা) তার নিকটেই রয়েছে। (সূরা ক্বফ ঃ ১৮)

যে কথায় উপকার আছে বলে স্পষ্ট হয়, সে কথা ছাড়া অন্য সব (অসঙ্গত) কথা হতে নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখা প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত মুসলিম ব্যক্তির উচিত। যেখানে কথা বলা ও চুপ থাকা দু'টোই সমান, সেখানে চুপ থাকাটাই সুন্নত। কেননা, বৈধ কথাবার্তাও অনেক সময় হারাম অথবা মাকরূহ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। অধিকাংশ এরূপই ঘটে থাকে। আর (বিপদ ও পাপ থেকে) নিরাপত্তার সমতুল্য কোন বস্তু নেই।

নাবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

এ হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উপকারী কথা ছাড়া কোন কথা বলা উচিত নয়। অর্থাৎ, সেই কথা যার উপকারিতা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যে কথার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সে কথা বলা উচিত নয়।

আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মুসলিম কে?" তিনি বললেন, "যার জিহবা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" (সহীহ মুসলিম)

গীবতে অংশগ্রহণ করা হারাম। যার নিকট গীবত করা হয় তার উচিত গীবতকারীর তীব্র প্রতিবাদ করা এবং তার সমর্থন না করা। আর তাতে সক্ষম না হলে সম্ভব হলে উক্ত সভা ত্যাগ করা।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "ওরা যখন অসার (মূল্যহীন) বাক্য শ্রবণ করে তখন ওরা তা পরিহার করে চলে।" (সূরা ক্বাসাস ঃ ৫৫)

নাবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে তার চেহারাকে রক্ষা করবেন।" (তিরমিযী)

যে সব কারণে গীবত বৈধ

সঠিক শরয়ী উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ; যখন গীবত ছাড়া সে উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। এমন কারণ ৬টি ঃ

১) **অত্যাচার ও নির্যাতন ঃ** নির্যাতিত ও অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষে বৈধ যে, সে শাসক, বিচারক প্রমুখ (প্রভাবশালী) ব্যক্তি যাঁরা অত্যাচারীকে উচিত সাজা দিয়ে ন্যায় বিচার করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখেন তাঁদের নিকট নালিশ করবে যে, 'অমুক ব্যক্তি আমার উপর এই অত্যাচার করেছে।'

২) **মন্দ কাজের অপসারণ ও পাপীকে সঠিক পথ ধরানোর কাজে সাহায্য কামনা ঃ** বস্তুতঃ শরীয়ত বহিঃর্ভূত কর্মকান্ড বন্ধ করার ব্যাপারে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে গিয়ে বলবে যে, 'অমুক ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত। সুতরাং আপনি তাকে তা থেকে বাধা দিন' ইত্যাদি। তবে এর পিছনে কেবল অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে, অন্যথা নয়।

৩) **ফতোয়া জানা ঃ** মুফতী (বা আলিমের) নিকট গিয়ে বলবে, 'আমার পিতা, আমার ভাই বা আমার স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এই অন্যায় অত্যাচার আমার প্রতি করেছে। তার কি কোন অধিকার আছে? (এমন করার অধিকার যদি না থাকে) তবে তা থেকে মুক্তি পাবার এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার ও নিজ অধিকার অর্জন করার উপায় কী?' অনুরূপ আবেদন পেশ করা। এরূপ বলা প্রয়োজনে বৈধ। তবে সতর্কতামূলক ও উত্তম পন্থা হল, নাম না নিয়ে যদি বলে, 'এক ব্যক্তি, বা লোক বা কারো স্বামী এই করেছে, সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন?' নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম না নিয়ে

এরূপ বললে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। এ সত্ত্বেও নির্দিষ্ট করে নাম নিয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা বৈধ।

৪) **মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করা ও তাদের মঙ্গল কামনা করা ঃ** এটা অনেক ধরণের হতে পারে। তার মধ্যে যেমন ঃ

ক) হাদীসের দোষযুক্ত রাবী ও (বিচারকার্যে) সাক্ষীর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা। সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ করা বৈধ; বরং প্রয়োজনবশতঃ ঐরূপ করা অত্যাবশ্যক।

খ) কোন ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক জোড়ার জন্য, কোন ব্যবসায়ে অংশীদারি গ্রহণের উদ্দেশ্যে, কারো কাছে আমানত রাখার জন্য, কারো সাথে আদান-প্রদান করার মানসে অথবা কারো প্রতিবেশী হবার জন্য ইত্যাদি উদ্দেশ্যে পরামর্শ চাওয়া। আর সে ক্ষেত্রে যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত প্রকৃত অবস্থা খুলে বলা। বরং হিতাকাঙ্ক্ষী মনোভাব নিয়ে যত দোষ-ত্রুটি থাকবে সব ব্যক্ত করে দেবে।

৫) **বিদ'আতী কাজে লিপ্ত ঃ** প্রকাশ্যভাবে কেউ পাপাচারণ বা বিদ'আতে লিপ্ত হলে তার কথা বলা।

৬) **প্রসিদ্ধ নাম ধরে পরিচয় দেয়া ঃ** সুতরাং যখন কেউ কোন মন্দ খেতাব দ্বারা পরিচিত হয়ে যায়; যেমন খোঁড়া, কালা, অন্ধ ইত্যাদি তখন সেই খেতাবগুলি উল্লেখ করা সিদ্ধ। তবে অবমাননা বা হেয় প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে সে সব উল্লেখ করা নিষিদ্ধ।

চুগলী করা হারাম

মানুষের মাঝে ফাসাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলা কথা লাগিয়ে দেয়াকে 'চুগলী করা' বলে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "(অনুসরণ করো না তার যে পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।" (সূরা ক্বলাম ঃ ১১)

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৮)

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টো কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "ঐ দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। অবশ্য ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধ (বা কোন কঠিন কাজের) জন্য আযাব দেয়া হচ্ছে না।" (তারপর বললেন) "হ্যাঁ, অপরাধ তো বড়ই ছিল। ওদের একজন (লোকের) চুগলী করে বেড়াত। আর অপরজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না।" (সহীহ বুখারী)

নাবী ﷺ বললেন, "মিথ্যা ও অপরাধ' কী জিনিস আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না? তা হচ্ছে চুগলী করা, লোকালয়ে কারো সমালোচনা করা।" (সহীহ মুসলিম)

দু'মুখোপনার নিন্দাবাদ

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। (সূরা নিসা ঃ ১০৮)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মানবমন্ডলীকে বিভিন্ন (পদার্থের) খণির ন্যায় পাবে। জাহিলী (অজ্ঞতার যুগে) যারা উত্তম ছিল, তারা ইসলামে (দীক্ষিত হবার পরও) উত্তম থাকবে; যখন তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা শাসন-ক্ষমতা ও কর্তৃত্বভার গ্রহণের ব্যাপারে সে সমস্ত লোককে সর্বাধিক উত্তম পাবে, যারা ঐ সব পদগুলিকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা বোধ করবে। আর সর্বাধিক নিকৃষ্ট পাবে দু'মুখো লোককে, যে এদের নিকট এক মুখ নিয়ে আসে আর ওদের কাছে আর এক মুখ নিয়ে আসে।" (সহীহ বুখারী, ও সহীহ মুসলিম)

মুহাম্মাদ ইবনে যায়িদ (রা.) হতে বর্ণিত, কতিপয় লোক তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.)-এর নিকট নিবেদন করল যে, 'আমরা আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?)' তিনি উত্তর দিলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা 'মুনাফিক্বী' আচরণ বলে গণ্য করতাম।" (সহীহ বুখারী)

পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছেদন এবং শত্রুতা পোষণ করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৩-১০)

নাবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ো না, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছেদন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশী কথাবার্তা বলা ত্যাগ করে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয়। (ঐ দিনে) প্রত্যেক সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করেনি। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা থাকে। (তাদের সম্পর্কে) বলা হয়, এদের দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, এদের দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও।" (সহীহ মুসলিম)

চুগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি

চুগলখোরীর পরিণতি জাহান্নাম

রসূল ﷺ বলেছেন, চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আমি কি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্ট লোক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? তারা হলো, চুগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী লোক (মুসনাদে আহমাদ)।

গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি

গীবতকারী দু'দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন ঃ যার গীবত করা হয় তার গুনাহসমূহ গীবতকারীর আমলনামায় লিখে দেয়া হয় এবং গীবতকারীর

আমলনামা থেকে পূণ্য নিয়ে যার গীবত করা হয়েছে তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয়। অর্থাৎ যার গীবত করা হয় সে নিজের অজান্তে দু'দিক থেকেই লাভবান হয়।

"আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই তো ওটার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

"দুর্ভোগ (কঠিন শাস্তি) ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের গীবত বা পরনিন্দা করে।" (সূরা হুমাযাহ ঃ ১)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ গীবত যিনার চাইতেও মারাত্মক অপরাধ। কোন মানুষ যদি যিনা করে তাওবা করে ফেলে, আল্লাহ তাওবা কবুল করে নেন। কিন্তু গীবতকারীকে ক্ষমা করা হয় না, যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে সে নিজে মাফ করে দেয়। (বায়হাকী)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ মিরাজের রাত্রিতে আমি একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। লোকগুলোর তামার নখ ছিল, ঐগুলো দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল। আমি বল্লাম, জিবরাঈল আ. এরা কারা? জিবরাঈল আ. বললেন, এরা তারাই যারা মানুষের মাংস খেতো অর্থাৎ গীবত করতো এবং সম্মানীদের অসম্মান করতো। (আবূ দাঊদ)

তিনি আরো বলেছেন, "পাপ ও সীমালংঘনের কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য করো না।" (সূরা মায়িদা ঃ ২)

যে সব কারণে গীবত চর্চা হয়

১) ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের দোষচর্চা করে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

২) মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু কারো দোষচর্চা করতে

থাকলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৩) পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ কেউ গীবতে লিপ্ত হয়ে পরে যেমন, কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয়।

৪) কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুক এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

৫) অহঙ্কার ও গর্বের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের হীন ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এই যে, সেই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জানে।

৬) প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে।

৭) হাসি-তামাসা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

৮) অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি-গালাজ করা নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি 'ফাসিক' অথবা 'কাফির' বলে অপবাদ দেয়, তখনই তা তার উপরেই বর্তায়; যদি তার প্রতিপক্ষ তা না হয়। (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আপোসে গালাগালিতেরত দু'জন ব্যক্তি যে সব কুবাক্য উচ্চারণ করে, সে সব তাদের মধ্যে সূচনাকারীর উপরে বর্তায়; যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণে) সীমা অতিক্রম করে। (সহীহ মুসলিম)

অপ্রয়োজনে মুসলিমদের প্রতি কুধারণা করা নিষেধ

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, *"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)*

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুধারণা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

তিনদিনের অধিক এক মুসলিমের অন্য মুসলিমের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা হারাম। তবে যদি বিদ'আতী, প্রকাশ্য মহাপাপী ইত্যাদি হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা ভিন্ন

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পরস্পর সম্পর্কছেদ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্ধেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন। (সহীহ মুসলিম)

বিদ'আতীর সলাত, সিয়াম, হাজ্জ প্রভৃতি ফরয কিংবা নফল কোনো ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না এবং সে ইসলাম থেকে এরূপভাবে খারিজ হয়ে যায় যেভাবে মাখানো আটা থেকে এক গুচ্ছ চুল বের হয়। (ইবনে মাজাহ)

অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান করা, অপরের অপছন্দ সত্ত্বেও তার কথা কান পেতে শোনা নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, *"তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)*

"যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কুধারণা সবচাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান (জাসূসী) করো না, একে অপরের সাথে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলিমের উপর হারাম। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ ও আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান (জাসূসী) করো না, অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, পরস্পরের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।

আর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা পরস্পর সম্পর্কছেদ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও। অন্য আরো এক বর্ণনায় আছে, তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না এবং অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করো না। (এ সবগুলি সহীহ মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং এর অধিকাংশ বর্ণনা করেছেন সহীহ বুখারী)

কারো প্রতি হিংসা করা হারাম

হিংসা হল, কোন ব্যক্তির কোন নিয়ামত (সম্পদ বা মঙ্গল) তা দ্বীনী হোক অথবা পার্থিব, তার ধ্বংস কামনা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদের হিংসা করে?" (সূরা নিসা ঃ ৫৪)*

কোন মুসলিম ভাই বা বোনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হারাম

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, *"হে বিশ্বাসীগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা (এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালংঘনকারী।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ *"দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।" (সূরা হুমাযাহ ঃ ১)*

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবে। (সহীহ মুসলিম)

নাবী ﷺ বলেছেন, 'যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একজন বলল, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।" আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'কে সে আমার উপর কসম খায়

এ মর্মে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। আমি তাকেই ক্ষমা করলাম এবং তোর (শপথকারীর) কৃতকর্ম নষ্ট করে দিলাম!" (সহীহ মুসলিম)

কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দেখে আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ

আল্লাহ বলেছেন, *"সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)*

অন্যত্র তিনি বলেন, *"যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে ইহলোক ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা নূর ঃ ১৯)*

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ১)*

তিনি আরো বলেছেন, *"আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪)*

নাবী ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক গণ্য হবে। আর সে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলো হল, ১) তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২) কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪) ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

নাবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে (বিশেষ) পতাকা নির্দিষ্ট হবে। বলা হবে যে, এটা অমুক ব্যক্তির (বিশ্বাসঘাতকতার) প্রতীক। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজি হারাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)*

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের উপর অস্ত্র তোলে। আর যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। (সহীহ মুসলিম)

ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নাবী ﷺ [ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি করার] দালালি করতে নিষেধ করেছেন।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কারো বংশে খোঁটা দেয়া হারাম

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, *"যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৮)*

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকের মধ্যে দু'টি এমন দোষ রয়েছে, যা আসলে কাফিরদের (আচরণ) ঃ বংশের খোঁটা দেয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা। (সহীহ মুসলিম)

'রিয়া' (লোক-প্রদশর্নমূলক কার্যকলাপ) হারাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।" (সূরা বাইয়িনাহ ঃ ৫)*

তিনি আরো বলেছেন, *"হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিয়ো না ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, *"নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে।" (সূরা নিসা ঃ ১৪২)*

তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শোনাবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দেখাবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

'যে ব্যক্তি শোনাবে' অর্থাৎ, যে তার আমলকে মানুষের সামনে প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করবে। 'আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন' অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে (সৃষ্টির সামনে সে কথা জানিয়ে) তাকে লাঞ্ছিত করবেন। 'যে ব্যক্তি দেখাবে' অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে স্বীকৃত নেক আমল প্রকাশ করবে যাতে সে তাদের নিকট সম্মানিত হয়। 'আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন' অর্থাৎ, সৃষ্টির সম্মুখে তার গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত (করে অপমানিত) করবেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না। (আবু দাউদ)

যাকে লোক 'রিয়া' বা প্রদর্শন ভাবে অথচ তা প্রদর্শন নয়

একদা রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল; বলুন, 'যে মানুষ সৎকাজ করে, আর লোকে তার প্রশংসা করে থাকে (তাহলে এরূপ কাজ কি রিয়া বলে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "এটা মু'মিনের সত্ত্বর সুসংবাদ।" (সহীহ মুসলিম)

কাউকে কিছু দান করে তা অন্যের কাছে প্রকাশ বা প্রচার করা নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)*

তিনি আরো বলেছেন, *"যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে অতঃপর যা ব্যয় করে, তার কথা বলে বেড়ায় না (এবং ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না, (তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।)" (সূরা বাকারা ঃ ২৬২)*

নাবী ﷺ বললেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, এরূপ তিনি তিনবার বললেন। তখন আবু যার বললেন, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?' রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে (পায়ের) গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে। (সহীহ মুসলিম)

এর অন্য বর্ণনায় আছে, "যে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে।" এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার কাপড় অহংকারের সাথে টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরে।

গর্ব ও বিদ্রোহাচরণ করা নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে।" (সূরা নাজম ঃ ৩২)*

তিনি আরো বলেছেন, *"কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা শূরা ঃ ৪২)*

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা পরস্পরের প্রতি নম্রতা ও বিনয় ভাব প্রদর্শন কর। যাতে কেউ যেন অন্যের প্রতি অত্যাচার না করতে পারে এবং কেউ সামনে গর্ব প্রকাশ না করে। (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (গর্বভরে) বলে, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে গেল, সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশী ধ্বংসোন্মুখ। (সহীহ মুসলিম)

'সবাই উচ্ছন্নে গেল বা ধ্বংস হয়ে গেল' বলা সেই ব্যক্তির জন্য নিষেধ, যে গর্বভরে সকলকে অবজ্ঞা করে ও নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে ঐ কথা বলে। এটাই হল হারাম। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি লোকদের মধ্যে দ্বীনদারীর অভাব প্রত্যক্ষ করে দ্বীনী আবেগের বশীভূত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করার মানসে ঐ কথা মুখ থেকে বের করে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। উক্ত ব্যাখ্যাকারী উলামাগণের মধ্যে ইমাম মালিক ইবনে আনাস, খাত্ত্বাবী, হুমাইদী (রহ.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

মুনাফিকী স্বভাব মানুষের সৎ আমল নষ্ট করে দেয়

মুনাফিকের চরিত্রে ৪ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ

১. সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে।
২. সে যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা ভঙ্গ করে।
৩. তার নিকট যখন কোন জিনিস আমানত রাখা হয় তখন সে তার খিয়ানত করে।

৪. যখন একে অপরে ঝগড়া লাগে তখন সে গালাগালি করে।

যারা মুসলিম নাম ধারণ করে মুনাফিকের মত আচরণ করে তারা কাফির হতেও খারাপ। তারা যে কোন সময় মানুষকে যে কোন ফাঁদে ফেলতে পারে। তারা কথা বলার সময় ভাল কথা বলে আর আচরণ করার সময় খারাপ আচরণ করে। এ জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ *"মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।" (সূরা আন নিসা ঃ ১৪৫)।*

মুনাফিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল মিথ্যা কথা বলা। তারা যে কোন সময় যে কোন ধরনের সত্য গোপন করতে দ্বিধা করে না। বিপদে পড়লে তারা মিথ্যা বলতে পারে। আর আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের কোন অভাব নেই। অসংখ্য লোক রয়েছে যারা স্বার্থের কারণে সকাল-বিকাল মিথ্যা কথা বলছে। মানুষ যখন একবার মিথ্যা কথা বলে তখন সে সহজে মিথ্যা ছাড়তে পারে না। সে মিথ্যা কথা ছাড়তে চায় কিন্তু মিথ্যা তাকে ছাড়তে চায় না। আর আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকই হল লোভী। আর লোভের কারণেই মানুষ বেশী মিথ্যা কথা বলে থাকে। এ জন্য বলা হয়, 'মিথ্যা সকল পাপের মূল'। মিথ্যা হতে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ বলেন ঃ *"তোমরা প্রতিমাদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৩০)*

নাবী ﷺ বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তি যে শুধু মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। (আবু দাউদ)

প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই ঈমান নিয়ে চলতে হলে মিথ্যা ত্যাগ করতে হবে। কারণ মিথ্যা যদি সে ত্যাগ করতে পারে তাহলে তার মধ্যে হিংসা, লোভ, অহংকার, চুগোলখোরী, রিয়া ইত্যাদি থাকবে না।

মুনাফিকের ২য় বৈশিষ্ট্য হল, সে যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তখন তা ভঙ্গ করে। মুনাফিকরা ওয়াদা পালনে সচেতন নয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে ওয়াদার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। *"হে ঈমানদারগণ, তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ১)*

নাবী ﷺ বলেন, 'মু'মিনদের ওয়াদা ঋণ স্বরূপ', প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পর ওয়াদার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। *"তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে, কারণ প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৪)।*

যারা ওয়াদা পালন করে না তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ *“হে মু’মিনগণ, তোমরা যা পালন কর না এমন কথা বল কেন?”* (সূরা সফ-২)

ওয়াদা ভঙ্গ করা জঘন্যতম অপরাধ। এ বিষয়ে নাবী ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই’, আর মুনাফিকের এটা হল একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। মুনাফিকের ৩নং বৈশিষ্ট্য হল সে খিয়ানতকারী, অর্থাৎ তার কাছে কোন কিছু জমা রাখলে সে সেই গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে থাকে। আর যে খিয়ানত করে থাকে তাকে বলা হয় আত্মসাৎকারী। যে ব্যক্তি খিয়ানত করে তাকে কেউ ভালোবাসে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে থাকে এবং আল্লাহ তা’আলাও তাকে ঘৃণা করে থাকেন।

কৃত্রিম মর্যাদা প্রদর্শন ও চর্চা থেকে দূরে থাকি

এ সমস্যাটি কোন এক জনগোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র সকলেই এ রোগে আক্রান্ত। আমরা সকলে কমবেশী কৃত্রিম মর্যাদা রক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু এ রোগের তীব্র মাত্রা মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির দ্বন্দ বা ঝগড়া, পরিবারের সাথে অপর পরিবারের অসৎ প্রতিযোগিতা, বান্ধবীর সাথে অপর বান্ধবীর লড়াই ইত্যাদি সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষ অযথা এর পেছনে সময়, শ্রম ও মেধা ব্যয় করে। এর বিভিন্ন রূপ ও ঢং আছে। পুরুষের রোগ নারীরটি হতে ভিন্ন। ছোটদেরও আবার বড়দের চাইতে অন্যরকম। কিন্তু যে রূপে আর ঢং-এ হোকনা কেন এ ব্যাপারে সীমালংঘন কোন ভাবেই ভাল নয়। মানুষ যখন মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্যের লড়াইয়ে লিপ্ত হয় ঠিক তখনই কৃত্রিমতা নামক উপসর্গ ঝেকে বসে। মন মস্তিষ্ককে আচ্ছাদিত করে এক অপ্রয়োজনীয় অদৃশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ব্যক্তির ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে হয়। অবৈধ উপায়ে অর্থ রোজগার, অন্যায় আচরণ ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পরে।

এর খারাপ দিক ঃ এ রোগে তূলনামূলক মহিলারা বেশী আক্রান্ত হয়। কার শাড়ী কত সুন্দর, কার গহনা কত দামী, কে কোন শপিং মল হতে বাজার করেন, কে কোন ব্রান্ডের পোশাক পরিধান করেন, কার অলংকারে কয়টা ডায়মন্ড আছে, কার স্বর্ণের বালায় কতুটুকু সোনা আছে ইত্যাদি ধরণের কৃত্রিম মর্যাদার চর্চা প্রায়ই দেখা যায়। আফসোসের বিষয় এ চর্চা কেবল বলা কওয়া আর দেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক অঘোষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সংশ্লিষ্ট মহিলারা।

সমাজে বসবাসকারী অন্য মহিলারা ক্রমান্বয়ে এ প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। এর অসৎ দিকটি স্বামীদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। মহিলারা অন্ধ হয়ে যান। স্বামীকে মৃদু হতে কড়া চাপ দিতে থাকেন। উমুক গয়নাটি আমার চাই তা না হলে আমি কিভাবে মুখ দেখাবো, উমুক মডেলের গাড়ীটি আমাদের এ মাসেই কিনতে হবে ইত্যাদি বাগাড়ম্বড়তা। কোন কোন স্বামী এগুলোকে মুখ বুঝে সহ্য করেন আবার কেউ কেউ প্রতিবাদ করেন, বাকবিতন্ডা করে ঘরের শান্তির বিনিময়ে বাইরের সৌন্দর্য কিনে নেন।

আবার অনেকে ইসলামিক মাইন্ডের হয়েও ইসলামী অনুষ্ঠানে অন্যান্য মহিলাদেরকে শো করার উদ্দেশ্যে অনেক দামী গহনা বা শাড়ি পরে আসেন এবং ইনডাইরেক্টলি তা শো করার চেষ্টা করেন এবং তার দেখাদেখি অনেকেই এই প্রতিযোগিতায় জরিয়ে পরেন যা মহান আল্লাহ তা'আলা একেবারেই পছন্দ করেন না।

প্রতিষেধক ঃ অথচ প্রতিযোগিতা হওয়ার বিষয় ছিল কে কত বেশী সদাকা করেছে? কে তার দামী হারটি বিক্রি করে দেশে একজন ইয়াতীমের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন? কে এ বছর একটি গরীব মেয়ের পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছে? কে তার বেতনের একটা অংশ সদাকার জন্য আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। ইত্যাদি। অবশ্য কোন কোন মায়েরা এগুলি করে থাকেন। অন্যরা যদি ধীরে ধীরে এ বিষয়গুলিকে প্রতিযোগিতার বিষয় বানিয়ে আনেন তাহলে গয়নার প্রতিযোগিতার স্থলে সদাকার প্রতিযোগিতা চালু হবে, শাড়ীর প্রতিযোগিতার স্থলে ইয়াতীমের বিয়ের ভার গ্রহণের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এভাবে সমাজ ও কম্যুনিটির লোকরা উপকৃত হবে। জীবন সুন্দর হবে। কৃত্রিমতা দূর হবে। পারস্পরিক বিশ্রী প্রতিযোগিতা শ্রদ্ধা ও খাঁটি ভালোবাসার রূপ নেবে।

"যারা সোনা রুপা জমা করে রাখে এবং তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেই দিনের আযাবের কথা জানিয়ে দাও যেদিন সোনা ও রুপা আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের ললাটে, পাঁজরে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে যে, এটাই হচ্ছে তোমাদের নিজেদের জন্য সঞ্চিত সেই ধন-সম্পদ। তোমরা যা কিছু সঞ্চয় করেছিলে এখন তারই স্বাদ গ্রহণ করো।" (সূরা তাওবা ঃ ৩৪-৩৫)

"আমি অনেক জানি" এই ভাব না দেখাই

কোন বিষয়ে আমি সত্যিকার অর্থে কতটুকু জানি বা না জানি তা আপাততঃ এক পাশে সরিয়ে রাখি। ভাবখানা এমন রাখি যে "আমি তেমন কিছুই জানি না"। এই ভাব "আমি অনেক কিছু জানি" এর চাইতে শতগুণে উত্তম। প্রথমতঃ আমি যে বিষয়ের উপর কাজ বা গবেষণা করছি সে বিষয়ে আমাকে আরো অনেক জানতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি এটা ধরে নেয় যে সে অনেক কিছুই জানে, তাহলে তার আরো জানার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া শুরু হয়। আবার কোন ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে যে সে চালাক, তাহলে তার ক্ষতি সে মুহূর্ত হতে শুরু হয়ে যায়। অতএব আমার পলিসিই হবে সবার নিকট কিছু না কিছু শেখার আছে। আমাকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সে জ্ঞানার্জনের জন্য। এ জন্যে যদি কারো নিকট ছোট হতে হয় তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ আমার মূল টার্গেট জ্ঞানার্জন। কোন অবস্থাতেই কাউকে এই ভাব দেখানো যাবে না যে আমি তার চাইতে বেশী জানি। এতে করে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই আমার সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না।

আমি যদি সত্যিকার জ্ঞানীই হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে সেটার জন্য ভাব দেখাতে হবে না। বরং আচার-আচরণে, কথা-বার্তায় শ্রোতারা এটা সহজেই বুঝে নেবেন। আমার কোন ভুল যদি কেউ ধরেই বসে তাহলে চটে যাওয়া যাবে না। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। আমার মতামত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যদি আমি শতভাগ নিশ্চিত হই তাহলে তো আমার চটে যাবার কোন কারণ নেই। আর কোন কারণে যদি আমার মতামত ভুল হয় তাহলে আমার হারানোরও কিছু নেই। বরং নির্ভুল হবার সুযোগ পেলাম। এতে প্রতিপক্ষ আমার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করবে না। আর কেউ যখন আমাকে কোন কিছু বুঝিয়ে বলছেন তখন ঘন ঘন বুঝছি বুঝছি যেন না বলি। আমি যদি সত্যিকার অর্থে বুঝে থাকি তাহলে বিষয়টা ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ হলে বলা উচিত 'বুঝেছি'।

কেউ যদি আমার কোন কাজের ব্যাপারে, অভ্যাসের ব্যাপারে বা আচরণের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক ভুল ধরিয়ে দেয়, তাহলে তাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। যে ব্যক্তি আমাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে অনেক চিন্তাভাবনা করে এবং অনেক চেষ্টার ফলেই আমাকে আমার কাজের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সাহস করেছে। তাকে ধমক দেয়া যাবে না। তাকে নিরুৎসাহিত করা যাবে না। সেতো আমার প্রকান্ড একটা উপকার করার চেষ্টা করেছে। তার সাহসের ফলেই

আমি একটি দোষ হতে মুক্ত হবার সুযোগ পেলাম। অন্যরাতো কেবল আমার গুণগান করে। আমার চাটুকারিতা করে, আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতার ব্যাপারে বাড়িয়ে বলে, আমাকে আকাশের উপর তুলে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। যে লোকটি আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের সুযোগ করে দিলেন সেই সত্যিকারের হিতাকাংক্ষী। তাকে সম্মান করা উচিত, ধন্যবাদ দেয়া উচিত ও তার জন্য দু'আ করা উচিত।

দৃষ্টি অনিয়ন্ত্রণের কুফল

স্বাভাবিক লজ্জা-শরমের অনিবার্য ফল হচ্ছে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ। চোখের দৃষ্টি এমন একটি হাতিয়ার, যার দ্বারা দুনিয়ায় যেমন ভালকাজও করা যায়, তেমনি নিজের মধ্যে জমানো যায় পাপের বিষবাষ্পও। দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীক্ষ্ণ-শানিত তীর যা নারী বা পুরুষের অন্তর ভেদ করতে পারে। প্রেম-ভালোবাসা তো এক অদৃশ্য জিনিস, যা কখনো চোখে ধরা পড়ে না, বরং চোখের দৃষ্টিতে ভর করে অপরের মর্মে গিয়ে পৌঁছায়। দৃষ্টি বিনিময় এক অলিখিত লিপিকার আদান-প্রদান, যাতে লোকদের অগোচরেই অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক মর্মকথা পরস্পরের মনের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

ইসলামের লক্ষ্য যেহেতু মানবজীবনের সার্বিক পবিত্র ও সর্বাঙ্গীন উন্নত চরিত্র, সেজন্যে দৃষ্টির এ ছিদ্রপথকেও সে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে, দৃষ্টিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যে দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"মু'মিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে, এ নীতি তাদের জন্যে অতিশয় পবিত্রতাময়। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত।" (সূরা নূর ঃ ৩০)

কেবল পুরুষদেরকেই নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে, *"মু'মিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে।" (সূরা নূর ঃ ৩১)*

এ ভীতি যে কেবল পরকালের জন্যেই, এমন কথা নয়। এ দুনিয়াতেও দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্রতা রক্ষা না করা হলে তার অত্যন্ত খারাপ পরিণতি দেখা দিতে পারে। আর তা হচ্ছে স্বামীর হৃদয় অন্য নারীর দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং স্ত্রীর

মন সমর্পিত হওয়া অন্য কোনো পুরুষের কাছে। আর এরই পরিণতি হচ্ছে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে আশু বিপর্যয় ও ভাঙ্গন।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার কারণ এই যে, যৌন উত্তেজনার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী ও পুরুষের প্রায় একই অবস্থা। বরং স্ত্রীলোকের দৃষ্টি পুরুষদের মনে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে থাকে। কারো কারো চোখ বিনিময় হলে স্ত্রীলোক সর্বাঙ্গে কাতর এবং কাবু হয়ে পড়ে, যদিও তাদের মুখ ফোটে না।

কেননা দৃষ্টি প্রথমতঃ আকর্ষণ জাগায়, আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা-বিভ্রমে নিমজ্জিত করে আর এ চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে, বাস্তবে ঘটনা সংঘটিত করে। বাস্তবে যখন কোনো বাধাই থাকে না, তখন এ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে কারো উপায় থাকে না।

জরীর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ যদি কারও উপর নজর পড়ে যায় তাহলে কি করব? উত্তরে তিনি বললেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। (আবু দাঊদ)

নাবী কারীম ﷺ আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে বললেন ঃ হে আলী ! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকিও না। প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করা হবে কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে ক্ষমা করা হবে না। (আবু দাঊদ)

নাবী কারীম ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পরনারীর প্রতি কু-দৃষ্টি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে উত্তপ্ত গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর)

নেতৃত্বের প্রতি লোভ

এ খারাপ গুণটি নেই এমন কোন রক্ত-মাংসের মানুষ সম্ভবত পাওয়া যাবে না। যোগ্যতার বিষয়টি চিন্তা না করে কেবল লোকের দৃষ্টিতে সম্মান বাড়বে মনে করে বেশীর ভাগ লোকই নেতা হতে চায়। অধিকাংশ প্রার্থীই নেতার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। কেবল নেতা হওয়ার প্রতিযোগিতায় কত লোক যে

দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িত হয়ে জীবন হারিয়েছে তার পরিসংখ্যান নিলে সংখ্যাটি হাজার ছাড়িয়ে যাবে। বিদেশে বাংলাদেশী সংগঠনগুলিতে এ রোগের যথেষ্ট লক্ষণ রয়েছে। কোথাও কোথাও এ ইস্যুতে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছে। এক পক্ষের হবু নেতার সমর্থক অন্য পক্ষকে ঘায়েল করার হুমকির কারণে পুলিশী হস্তক্ষেপ কোন অবিশ্বাস্য ঘটনা নয়।

এ রোগের খেসারত দিতে হচ্ছে পুরো জাতিকে, আক্রান্ত সংগঠনকে, প্রতিষ্ঠানকে। একজন অযোগ্য ব্যক্তি যিনি নেতৃত্বের দায়দায়িত্বের কথা চিন্তা করে এ হতে দূরে থাকেন, তিনি অপর আরেক ব্যক্তি হতে উত্তম যিনি অপেক্ষাকৃত যোগ্য কিন্তু নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে বেখেয়াল। এর কারণ প্রথম ব্যক্তি নিজেকে যোগ্য মনে না করে নেতৃত্বের লোভ হতে দূরে থাকলেও তাকে যদি দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে সে প্রতি মুহূর্তে তটস্থ থাকবে, তার অধীনস্থদের কল্যাণের কথা মাথায় এনে চিন্তা ভাবনা করতে থাকবে কিভাবে অবস্থার উন্নতি করা যায়। পরে সে নিজেকে ক্রমান্বয়ে এডজাষ্ট করে নেবে ও তার মধ্যে ধীরে ধীরে যোগ্যতার সৃষ্টি হয়ে যাবে।

প্রতিষেধক ঃ যাদের নেতৃত্বের প্রতি লোভ আছে, যেসব ব্যক্তি নেতা হওয়ার জন্য বেপরোয়া আচরণ করেন, যারা নেতা হওয়ার জন্য নির্লজ্জ কাজ করতে দ্বিধা করে না তাদের কোন অবস্থাতেই নেতা হিসাবে নির্বাচন করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে অন্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝতে হবে যে এ ধরনের ব্যক্তিরা যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হোক না কেন তাদের দ্বারা কম্যুনিটির প্রকৃত কোন কল্যাণলাভ হবে না। কদাচিৎ যদি তারা কিছু চমক দেখাতে সক্ষমও হয় কিন্তু এর শেষ পরিণতি সর্বদা করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক হওয়ার আশংকাই অধিক।

সংগঠন রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সামাজিক যাই হোক না কেন সেখানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরী। এ সকল সংস্থার মধ্যে প্রশিক্ষণের কথা কখনো শোনা যায়নি। তাদের অন্যান্য কর্মসূচী নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়, এ প্রোগ্রাম, সে অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত সংগঠন সারা বছর। কমপক্ষে দু'টি নৈতিক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী হাতে নেয়া উচিত। সেখানে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সৎ চরিত্রের অধিকারী কোন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিত্বকে স্পীকার বানিয়ে সংগঠনে পদের অধিকারী সকল কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যে যত শিক্ষিত হয় তার জন্যে ঠিক সেই পরিমাণ নৈতিক শক্তি অর্জন করা কল্যাণকর।

আমাদের চরিত্রের মান

সারা দুনিয়ায় আমরা মুসলিমরা শিক্ষার দিক থেকে সবচাইতে পিছিয়ে আছি। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা দূরে থাক, মৌলিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্জনের লক্ষ্যমাত্রাটিও আমরা স্পর্শ করতে পারছি না। ফলে আমরা আভ্যন্তরীণ ও আন্ত র্জাতিকভাবে শোষিত হচ্ছি।

বাংলাদেশী হিসেবে আমাদের চরিত্রে রয়েছে নানারকম হাস্যকর উপাদান। অতি দুর্বল ও অতি অসহনশীল আমরা, দুনিয়ার যে প্রান্তে গিয়েছি সেখানেই নিজেদেরকে নিজেরা শত্রুতে পরিণত করেছি। আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী হতে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক পর্যন্ত সকল পর্যায়ে এ বিষয়ে সুনাম অর্জনে ধন্য হয়েছে। তবে এ অসৎ স্বভাব অর্জন ও তার বিকাশে অল্প শিক্ষিতদের চেয়ে বেশী শিক্ষিতরা এগিয়ে আছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ মহান ব্যক্তিরা ঝগড়া, মারামারি, কথা কাটাকাটি, অশ্রাব্য ভাষায় নিজেদের গালাগাল দেয়া ইত্যাদি ঘটিয়েছেন কোন বিজ্ঞ কারণে নয় অথবা নয় কোন ভাবগাম্ভীর্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে। এমনও নয় যে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায় বনিবনা হয়নি। অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বিষয়ে এসব উচ্চ শিক্ষিত মহৎ ব্যক্তিগণ ঝগড়া ফাসাদ করে নিজেদের শক্তি অপচয় করছেন।

ঝগড়ার সবচাইতে কমন সূত্র মসজিদ কমিটি গঠন বা ভাঙ্গন নিয়ে, অথবা বাংলাদেশী সোসাইটির নেতৃত্বের কোন্দল বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে। অবস্থা দেখে মনে হয় শয়তান সন্তুষ্টির সাথে এসব ব্যক্তিদের ত্যাগ করেছে এবং শয়তানের সর্বজ্ঞাত এজেন্ডা বিভেদ সৃষ্টির এক নম্বর উপাদানকে জমিনে বাস্ত বায়ন করার জন্য এসব উচ্চ শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ করে দুনিয়ার সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে। পত্রপত্রিকার খবরাদি ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশী সংগঠনগুলির খোঁজ-খবর নিয়ে এ দাবীর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম কিছু লক্ষ্য করা যায়নি।

তাড়াহুড়া না করা

কোন কাজেই তাড়াহুড়া করা ঠিক না। দৃঢ়চিত্তে সময়মতো কাজ শুরু করা উচিত, প্ল্যানমতো ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া উচিত, কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজ মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত হতে দেয়া যাবে না। দেখা যাবে তাড়াহুড়া

ছাড়াই কাজটি সমাধা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ । তবে প্ল্যানটা হতে হবে নিখুঁত এবং কাজের গতি হতে হবে প্রফেশনাল, অলস বা ঢিলেঢালা নয় । দেরীতে শুরু করলে, প্রয়োজনীয় মাল-মশলা এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করার আগেই কাজে হাত দিলে অগ্রগতির হার কম হতে বাধ্য যার ফলে তাড়াহুড়া করতে হয় । তাড়াহুড়া করলে কাজে ভুল হয়, আরো দেরী হয় । অন্য যে কথাটি সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন সেটা হলো লাইফ ইজ নট অ্যান ইমার্জেন্সি, সব কাজেই একটা তাড়া, একটা ব্যস্ততা জীবনে অশান্তি এবং ব্যর্থতা ডেকে আনে । Go easy. One step at a time.

অন্যের দোষ অনুসন্ধান না করা

যদি নির্বিবাদে, শান্তিতে জীবন কাটাতে চাই? তাহলে অপরের দোষ অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকা উচিত, অন্যের বিরূপ সমালোচনা থেকে দূরে থাকা খুবই জরুরী । শত্রুতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, অকারণে দুর্ভাবনার কবল থেকে মুক্ত থাকা যাবে; অন্যান্য প্রয়োজনীয়, সৃজনশীল কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ বেশী পাওয়া যাবে । এর জন্যে চাই বাকসংযম; কখন কথা বলতে হবে, কখন চুপ থাকতে হবে সেটা ভাল করে বুঝতে হবে । এখানে আবেগের স্থান নেই, প্রয়োজন বিচক্ষণতার । অন্যের দেয়া উস্কানিও উপেক্ষা করতে হবে । মনে রাখতে হবে আমার মতো অন্যদেরও আপন রুচি-পছন্দমতো চলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে । মহান আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে কুরআনে বলেছেন ঃ

"সেইসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করে, আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয় ।" (সূরা হুমাযাহ ঃ ১)

অন্যের প্রশংসা করা ও আত্মপ্রশংসা না করা

প্রশংসা একটি লোভনীয় বস্তু । আমরা আমাদের নিজেদের প্রশংসা অন্যদের মুখে শুনতে বড় ভালোবাসি । তবে প্রশংসাটা যেন আমাদের মনে গর্ব-অহংকার বা স্পর্ধার অথবা অন্যদের হেয় দৃষ্টিতে দেখার বাসনা সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ।

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না আর জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না ।"
(সূরা লুকমান ঃ ১৮)

অন্যদিকে আমরা আত্মপ্রশংসা করতেও ভালোবাসি। যেমন ঃ দান-সদাকা, বিভিন্নরকম সাহায্য-সহযোগিতা, ডিগ্রি অর্জন ইত্যাদি করেই আমাদের অনেকেই সেটাকে বিভিন্ন পরিবেশে বারবার ফলাও করে বলে বেড়াই, প্রশংসা কুড়াবার চেষ্টা করি। এটা খুবই নিন্দনীয় স্বভাব, একজন বিবেকবান ব্যক্তির জন্যে এটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। এধরনের আত্মপ্রশংসা সেই সৎকর্মটুকুর সম্পূর্ণ মাধুর্যটাই ধ্বংস করে ফেলে।

চাকুরী নিয়ে হতাশা?

ভাল পেশা ঃ ইসলামে নৈতিকতার দিক থেকে কোন বৈধ পেশাই ছোট নয় আবার কোনটি বড়ও নয়। যদি আয়-রোজগারের ক্ষেত্রে হারাম-হালাল বাছবিচার করে উপার্জন করা যায়। আল্লাহর নাবীগণ ছিলেন মানব ইতিহাসের সবচাইতে সম্মানিত মানুষ। তাঁরা সবাই নিজ হাতে জীবিকা উপার্জন করতেন। প্রথম মানুষ ও নাবী আদম (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কৃষি কাজ করতেন। আল্লাহর নাবী দাউদ (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদশাহ হয়েও কর্মকারের কাজ করে সংসার চালাতেন। নাবী জাকারিয়া (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঠ মিস্ত্রীর কাজ করতেন। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর অনুসারী সাহাবীগণ কেউ ব্যবসা করতেন, কেউ চাকুরী করতেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ্) কাপড়ের ব্যবসা করতেন। এভাবে দেখা যায় যে একেক জন একেক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এসব মনীষীগণ কে কি ধরনের কাজ করতেন তা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বরং তাদের আদর্শভিত্তিক জীবন ও আদর্শের জন্য ত্যাগই এ মহান ব্যক্তিদিগকে মানবজাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

অতএব সর্বপ্রথম আমাদেরকে এ মূলনীতি ঠিক করতে হবে যে, কাজ বা পেশা যাই হোক না কেন কোনটিই ছোট নয় আবার কোনটি বড়ও নয়। কোন পেশার কথা শুনে যদি কেউ নাক সিঁটকায় তাহলে মানুষ হিসেবে সে ব্যক্তি প্রশংসনীয় নয়। শিক্ষিত মূর্খরাই বিশেষ পেশার কথা শুনে বিরূপ ভাব প্রকাশ করে। এতে করে তথাকথিত শিক্ষিতদের প্রকৃত জ্ঞানের দৈন্যদশাই ফুটে উঠে যদিও তারা নিজেদেরকে খুব জ্ঞানী মনে করে।

পরিচ্ছন্ন পেশা ঃ ভাল পেশা বলতে কিছু স্বীকার না করলেও আমরা পরিচ্ছন্ন পেশার কথা শুনে থাকি ও তা আমলে নেই। পেশা সমূহের মধ্যে কিছু আছে যার গোড়াই গন্ডগোল সম্পর্কিত। যাবতীয় পেশা নির্বাচনের সময় শুধু

পারিশ্রমিকের পরিমাণ দেখাই শেষ নয়। কাজের ধরণ, এর পরিবেশ, আপনার নিয়োগকর্তার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি দেখে নেবার সুযোগ থাকলে তা একটি ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হয়। কোন চাকুরী করতে গিয়ে যদি আমি আগেভাগেই জানতে পারি যে এ কাজে আমার নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিতে হবে, কিংবা আমার উপর আল্লাহর যে অধিকার আছে তা খর্ব হবার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট, এ ধরনের কাজ বা পেশা না নেওয়া ভাল। এতে আল্লাহ্ খুশী হন এবং মূলতঃ এটা আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। আর এ পরীক্ষায় যদি আমি উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর-যাতে তোমরা মুক্তি পাও।" (সূরা আল-মায়িদা ঃ ১০০)

স্বাভাবিক পথে এক লক্ষ টাকা উপার্জন, আর অস্বাভাবিক পথে দশ লক্ষ টাকা বা তারও বেশী উপার্জন এক নয়। একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষের জন্য প্রথমটিই শ্রেয়। কেবল পরকালের ভয় যদি আমার ভেতরের পশুকে দমন করার জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে বিষয়টি এভাবে বিবেচনা করি ঃ অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের প্রভাবে আমার জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় নেমে আসবে। এতে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তা আমার অবৈধভাবে কামানো অর্থের তুলনায় অনেক বেশী। অবৈধ অর্থ আয়ের অশুভ প্রভাব পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা আমার উপর নির্ভরশীল তারাও অনুভব করবে। এর জ্বালায় আমি ধড়ফড় করবো, দুনিয়ার সবকিছু তেতো মনে হবে। কিন্তু এ সংকট হতে নিজেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থলে সরিয়ে নেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ ধরনের আত্মঘাতী কাজ হতে মুক্ত রাখুন।

কেন কিছু লোকের চেহারা কুৎসিত হয়?

অনেক লোকই উজ্জল ও সুন্দর ছিল শিশুকালে কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই আদরের এবং সুন্দর চেহারার বিলুপ্তি ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু কেন এমন হয় তা নিয়ে কখনও ভেবে দেখেছি কি? শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে জেনে নেই। যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল ও সৎ তার সেই সততা ফুটে উঠে দ্বীপ্তিশীল হয়ে মুখমন্ডলে, তার সেই সততা উজ্জলা হয়ে পরিচিতি লাভ করে চেহারাতে আর এর বিপরীত হতে দেখা যায় সেই ব্যক্তির ব্যাপারে যে

পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলে। ব্যক্তি যতই বৃদ্ধ হতে থাকে ততই বৃদ্ধ হওয়ার নিদর্শন সহজে ধরা পড়ে। এতদনুসারে ছোট্টকালে ব্যক্তির সেই সুন্দর চেহারাখানা, পরবর্তীকালে যে কোনভাবে সে যদি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং পাপের উপর থাকতে বদ্ধপরিকর হয় তখন কুৎসিত আকার ধারণ করে প্রকাশ লাভ করে মনের সেই মনভাব জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর তার বিপরীত দিকটাও ঠিক তেমনিভাবে সত্য।

উদ্ধৃতি ঃ বর্ণীত হয়েছে যে ইবনে আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেন "নিশ্চয়ই সৎআমল হৃদয়কে করে আলোকিত, চেহারাকে করে দ্বীপ্তিশীল, শরীরকে করে শক্তিশালী, রিযিক করে বৃদ্ধি এবং সৃষ্টির হৃদয়সমূহে তৈরী করে ব্যক্তির জন্য ভালোবাসা অপরদিকে পাপাচার হৃদয়কে করে অন্ধকারে নিমজ্জীত, অনুজ্জল করে মুখমন্ডল, শরীরকে দুর্বল করে তোলে এবং ঐ ব্যক্তির জন্যে সৃষ্টির অন্তরসমূহে তৈরী করে ঘৃণা।"

এমনও হতে পারে যে এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয় না এমনকি মহা উদ্দ্যেগের সাথে ইবাদতসমূহ সম্পন্ন করে আর করে যুহদ বা স্বেচ্ছায় জীবনের বৈধ আনন্দসমূহ বিসর্জন দেয়। কিন্তু তথাপি ব্যক্তির মাঝে রয়ে যায় মিথ্যা বা যা সত্য নয় এমন ধরণের আক্বীদা আল্লাহ, তাঁর দ্বীন, তাঁর রসূল ﷺ এবং তাঁর দ্বীনদার বান্দাদের সম্পর্কে। আর যা অন্তরে লুকায়িত থাকে তা প্রকাশ হওয়াটা স্বাভাবিক। যে মিথ্যা আর অসত্য আক্বীদা সে সত্য ও সঠিক বলে যে বিশ্বাস করতো তা ভেসে উঠে তার চেহারায় এবং যে পরিমাণ মিথ্যা সে ধারণ করে ঠিক সে পরিমাণ অন্ধকার প্রকাশ পায় তার মুখমন্ডলে।

উদ্ধৃতি ঃ বর্ণীত আছে যে উসমান ইবনে আফফান (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেন "এমন কেউই নেই যে ব্যক্তি তার শয়তানী লুকিয়ে রাখবে আর আল্লাহ তা'আলা তা তার চেহারাতে প্রকাশ না করে ছেড়ে দেবেন এবং যা তার জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত হয় তাও।"

প্রথম যুগের মুসলিম বা সালাফীদের কেউ কেউ বলতেন "যদি কোন বিদ'আতি লোক প্রতিদিন তার দাঁড়িতে রং লাগায় তথাপি বিদ'আতের রং তার চেহারায় বিদ্যমান থাকবে"। শেষ বিচারের দিন তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো সব বিশ্রী [কদাকার] হয়ে গেছে, তুমি কি মনে করো জাহান্নাম [এ রকম] ঔদ্ধত্য পোষণকারীদের ঠিকানা [হওয়া উচিৎ] নয়"। (সূরা আয্ যুমার ঃ ৬০)

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন "সে [কিয়ামতের] দিন [নিজেদের নেক আমল দেখে] কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ্র সমুজ্জল হয়ে যাবে, আবার কিছু লোকের চেহারা [ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর] কালো [ও বিশ্রী] হয়ে পড়বে, সুতরাং যাদের মুখ [সেদিন] কালো হয়ে যাবে [তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে], ঈমানের [নিয়ামত পাওয়ার] পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতঃপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল [হিসেবে] এ আযাব উপভোগ করতে থাকো।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৬)

ইবনে আব্বাস (রা.) সহ কেউ কেউ বলেন "উজ্জল চেহারা হবে যারা আহ্লে সুন্নাহ এবং কালো চেহারা হবে তাদের যারা বিদ'আতি ও বিভেদ সৃষ্টিকারী।

লজ্জাশীলতা ও শালীনতা

সচ্চরিত্র গঠনে লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ অত্যন্ত জরুরী। লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য। সে যে কোন অসৎ কাজ করতে পারে, আর এজন্যই বলা হয়, যার লজ্জা-শরম নেই তার ঈমানও নেই। কারণ লজ্জা ও শালীনতাবোধ মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম থেকে বাঁচার উত্তম হাতিয়ার।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা। (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লজ্জা ও ঈমান সবর্দা পরস্পর সাথী হয়ে থাকে। যখন এর একটি বিলুপ্ত হয়, অপরটিও উঠিয়ে নেয়া হয়। (বায়হাকী)

অন্যত্র রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা নিজেও এ গুণে গুণান্বিত। তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর দরবারে মুনাজাতে উভয় হাত উত্তোলন করে তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযী)

মূলতঃ লজ্জাবোধ মানবজাতির একটি অন্যতম গুণ। এ প্রসংগে নাবী কারীম ﷺ বলেন ঃ লজ্জা এমন একটি গুণ যার ফলে সর্বদা কল্যাণ লাভ করা যায়।

নাবী কারীম ﷺ বলেন ঃ লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই বয়ে আনে। (সহীহ বুখারী)

লজ্জাহীন লোক ভাল-মন্দ সকল কাজ করতে পারে, কোন কিছুই তাকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে না। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ লজ্জা-শরম না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে। (সহীহ বুখারী)

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পুরুষ কি নারী সবার জন্যই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ মানুষের লজ্জাস্থানের হিফাযত করার বিশেষ তাকীদ রয়েছে। লজ্জাস্থানের উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাই শুধু লজ্জাস্থানের হিফাযত নয়। বরং অবৈধভাবে লজ্জাস্থানের ব্যবহার না করাই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করার মর্ম। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"হে রসূল! মু'মিনদের বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাঁদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটা তাঁদের জন্য উত্তম।" (সূরা আন নূর ঃ ৩০)

"আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাঁদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তাঁরা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাঁদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাঁদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় [ওড়না ও চাদর] দ্বারা আবৃত করে।" (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে কোন অবস্থাতেই অশ্লীল আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ড যা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করে তার কাছেও যাওয়া যাবে না।

"আর প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না।" (সূরা আনআম ঃ ১৫১)

উক্ত আয়াতে 'অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না' বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে সব কাজ ও কাজের উৎস অশ্লীলতা ও পাপাচারের সাথে সম্পৃক্ত বা সেদিকে নিয়ে যায় তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এর মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অভিসার, অশ্লীল গান-বাদ্য, বিনোদন, ম্যাগাজিন, হিন্দি নাচ-গান, সিনেমা ইত্যাদিও এর মধ্যে শামিল।

নিজের অন্তত দশটি দোষ খুঁজে বের করি

দোষে-গুণে মিলেই মানুষ। সম্পূর্ণ নির্দোষ বা সম্পূর্ণ গুণহীন মানুষ হতে পারে না। তবে আমাদের দোষগুলো সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে যাতে সেই দোষগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি। আর সেজন্যই আমার নিজের দোষগুলো খুঁজে বের করা প্রয়োজন। যেমন ঃ আমি কি নিজেকে বড় মনে করি? খুব বেশী তর্ক করি? আমার মাঝে মিথ্যা কথা বলার বা পেঁচিয়ে বলার প্রবণতা আছে? কথা দিয়ে কথা রাখি না? স্ত্রীর/স্বামীর প্রতি, সন্তানদের প্রতি যত্নবান নই? বৃদ্ধ মা-বাবার খবর নিই না? ধর্মেকর্মে অমনোযোগী? অতিরিক্ত খরচ করি? অন্যের প্রশংসা সহ্য করতে পারি না? অন্যের গীবত করি? পরচর্চা-পরনিন্দা করে থাকি? হিংসা করি? লোভ সামলাতে পারি না? ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের আমিটাকে খুঁজে বের করতে হবে, সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মানুষের অধিকার
আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না

মানুষের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন

"তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাও এতে কোন পুণ্য নেই বরং পুণ্য হচ্ছে তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, কিতাব ও নাবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, নিঃস্ব, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাস মুক্তির জন্য ধনসম্পদ দান করে, আর সলাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং যখন অঙ্গীকার করে সেই অঙ্গীকার তারা পূরণ করে এবং যারা অভাবে ও দুঃখে-কষ্টে, দারিদ্র্যে, সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করে। তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই আল্লাহভীরু।" (সূরা বাকারা ২ঃ ১৭৭)

পরকালের জীবনকে যারা সত্যই বিশ্বাস করবেন তাদেরকে অবশ্যই বান্দার হক বা অধিকারগুলো আদায় করতে হবে। কারণ আল্লাহর হক বহুক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন কিন্তু বান্দার অনাদায়কৃত হক বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন না। হাঁ তবে যদি কোন বান্দার নিকট কোন ব্যাপারে কেউ দায়ী থাকেন আর যদি হাজারও চেষ্টা করে দায়মুক্ত হতে না পারেন তবে তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আর যদি এমন হয় যে হাজার চেষ্টা করেও কোন প্রকারেই সম্ভব হল না দায় পরিশোধ করার অথবা ক্ষমা চাওয়ার, এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা দেখবেন তার দায়মুক্ত হওয়ার জন্যে মনের পেরেশানি কি পরিমাণ ছিল। এটা দেখে মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিজের পক্ষ হতে দায় মুক্ত করে দিতে পারেন। তবে এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি এরূপ করেন তবে তিনি যার

নিকট দায়ী ছিলেন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ তুমি একে মাফ করে দাও তার পরিবর্তে আমি তোমার গোনাহ মাফ করে দিচ্ছি। একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখতে হবে পুরোপুরি, তবে আল্লাহ তা'আলার বিধানকে ফাঁকি দিয়ে নয়।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফেরত দিতে"। (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৫৮)

পরকালে আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন এই নিয়তে যারা পরের হক নষ্ট করবেন তারা খুবই ভুল করবেন। নিজেকে নিজেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন। মনে রাখতে হবে সেখানে সব কিছুই মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে এবং যিনি মনের খবর রাখেন তিনি অবস্থা মুতাবেক বিবেচনা করবেন। কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁকিবাজি থাকলে আল্লাহ তা'আলার দয়া পাওয়া যাবে এমন কোন ওয়াদা আল্লাহ তা'আলার নেই। তাই আর কোন অপরাধে নয় শুধুমাত্র অন্যের হক নষ্ট করার কারণেই বহু লোককে জাহান্নামে যেতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের হককে প্রথমতঃ আটটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই আটটি শ্রেণীবিভাগে কার কতটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য তা আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।

১) নিকট আত্মীয়ের হক
২) দূর আত্মীয়ের হক
৩) প্রতিবেশীর হক
৪) দেশবাসীর হক
৫) সরকারের হক
৬) সাধারণ মুসলিমের হক
৭) অভাবী লোকের হক
৮) অমুসলিমদের হক

মাতাপিতার ভরণপোষণ

আল্লাহর পর সর্বপ্রথম হক পিতামাতার হক। দ্বীন ইসলামের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে সন্তানগণ দুর্ভাগ্যের শিকার হন, নিজেদের সবকিছু ঠিক রেখে তবে পিতামাতার বিষয়টি দয়া করে বিবেচনা করেন। অর্থাৎ পিতামাতার বিষয়টি secondary। নিজের সামাজিক স্টেটাস রক্ষার মোটা খরচের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তার একটা সামান্য অংশ এককালীন মাতাপিতার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। তারপরও কড়াকড়ি হিসেব লিখে রাখা হয় এ বছর মোট কত টাকা দেয়া হলো। গত পাঁচ বছরে কত।

কোন কোন সন্তানরা আরো হতভাগ্য। তারা মাতাপিতার খরচ নিয়ে দর কষাকষি করে। এক সন্তান বলে আমি তো তাদের খরচ চালাচ্ছি, অন্য জন খোঁটা দেয় গত বছর তিনেক তো আমি চালিয়েছি। আরেকজন যোগ দেয়, আমি প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আসছি। কেবল ভাগ্যবান ও বুঝদার ঈমানদার ছেলেটি বলে তোমরা কেউ কিছু দাও বা না দাও, আমার কিছু যায় আসে না। আমার মা-বাবা আমার দায়িত্ব। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমার জন্মদাতাদের সেবা করে আমি ধন্য হতে চাই। তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমার প্রভু আমাকে তৌফিক দিয়েছেন যে আমি পিতামাতা উভয়ের দায়িত্ব নিয়ে সৌভাগ্য হাসিল করতে চাই।

আমি যদি ঈমানদার হয়ে থাকি তাহলে পিতামাতার খরচ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যোগান দিয়ে প্রমাণ করি যে আমার ঈমানের দাবি মজবুত। যদি আমার দাবিতে আমি সৎ থাকি তাহলে এরকম নির্লজ্জ যুক্তি তর্কের আশ্রয় যেন না নেই যে গত "দশ বছর আমি তাদের দেখেছি এখন আর পারছি না"। এধরনের খারাপ চিন্তা আসা মানে আমার মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ এখন আর আমার হাতে নেই। এটা নিশ্চিত ইবলিসের দখলে। আমার ব্যাপক ধ্বংসের আগেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিয়ে আসা উচিত।

যেসব সন্তানের আত্মমর্যাদা আছে, যারা কাপুরুষ নন তারা সর্বদা মাতাপিতার খরচ বহনের জন্য অন্য ভাইবোনদের সাথে প্রতিযোগিতা করবেন। প্রকৃত ঈমানদারগণ এ দায়িত্বপালনে কোন বাহানা খোঁজে না। যে ভাই বা বোনের বাড়ীতে আমার পিতামাতা থাকছেন সে পরিবারের নিকট কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। আমার পিতামাতার খাতিরে তাদের বেশী বেশী উপহার পাঠানো উচিত। মাঝে মাঝে তাদের জন্য আলাদা করে অর্থ পাঠানো উচিত যাতে তারা কোন কারণে পিতামাতাকে বোঝা মনে না করেন বরং লাভজনক মনে করেন।

হঠাৎ করে একজন নারীর জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন

একটি মেয়ে জন্মের পর থেকে তার মা-বাবা, ভাই-বোনের আদরে বড় হতে থাকে। দীর্ঘ ২৫-২৬ বছর সে একই পরিবেশে বড় হতে থাকে। একই মায়ের হাতের রান্না খেয়ে তৃপ্তি পেয়ে থাকে। দিন দিন যখন সে বড় হতে থাকে তার পাশাপাশি সে নিজ পরিবার থেকে কিছু দায়িত্ববোধও শিখে। এভাবে একদিন তার বিয়ে হয়ে যায় এবং হঠাৎ করেই একদিনের মধ্যে তার দীর্ঘ জীবনের পরিবেশ পরিবর্তন হয়ে যায়। সে নিজ মা-বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি চলে

যায় এবং একেবারেই একাকী হয়ে যায়, না ভাইবোন সাথে না মা-বাবা সাথে। সে হঠাৎ করেই একাকী হয়ে যায় সবাইকে ছেড়ে যাদের সাথে সে এতোটা দিন একত্রে থেকেছে, একই রকম রান্না খেয়েছে, একই পরিবেশে বড় হয়েছে।

সর্বপ্রথমে সে সম্পূর্ণ একটি নতুন লোকের সাথে স্বামী হিসেবে সংসার করা শুরু করে। স্বামীর বাড়ি আসার পর থেকে নিজ স্বামীকে চিনতেই বেশ কিছু দিন সময় লেগে যায় যেমন ঃ তার মনমানসিকতা, তার ধ্যান-ধারণা, তার চিন্তা-ভাবনা, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কী পছন্দ করেন কী পছন্দ করেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার যদি যৌথ পরিবারের সাথে বসবাস করে থাকেন তাহলে তো দায়িত্ব আরো বেশী। স্বামীকে যেভাবে চিনতে হয়েছে ঠিক তেমনি শ্বশুর বাড়ির অন্যান্যদেরকেও চিনতে হয়। যেমন ঃ শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেবর, ভাসুর ইত্যাদি। হঠাৎ করে তাকে এক-দুই সপ্তাহের মধ্যে বা এক দুই মাসের মাধ্যে ম্যাচিউর হতে হয়। আর যদি প্রথম বছরেই সন্তান-সন্ততি হয়ে যায় তাহলে তো দায়িত্বের আর শেষ নেই।

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েটি (স্ত্রী) হঠাৎ করে এক রকম কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়েন যার পূর্ব প্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতা সাধারণতঃ কোন মেয়েরই থাকে না বা এর জন্য কোন ট্রেনিং সেন্টার বা স্কুলও নেই। প্রতি পদে পদে ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়। আর এই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য অর্থাৎ পরিবারে শান্তি বজায় রাখার জন্য তাকে নানা ত্যাগ শিকার করে যেতে হয়। তাই স্বামীদেরকে তার স্ত্রীর এই ত্যাগের কথাগুলো মনে রেখে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত, সদয় হওয়া উচিত, কোঅপারেটিভ হওয়া উচিত। একইভাবে যৌথ পরিবারের অন্যান্যদেরও বিষয়টি খেয়াল করা উচিত এবং গুরুত্ব দেয়া উচিত।

বউ শাশুড়ী সমস্যা ও তার সমাধান

এই আর্টিকল্‌টি পড়ার আগে আমরা যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকি। কেউ কাউকে যেন ভুল না বুঝি। এখানে কাউকেই ছোট করা হচ্ছে না সেদিকেও যেন খেয়াল রাখি। এটা আমাদের নিজেদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে একপ্রকার আত্মসমালোচনা। আলহামদুলিল্লাহ অনেক পরিবারেই বউ শাশুড়ীর মধ্যে খুবই ভাল সুসম্পর্ক বিদ্যমান, তবে এই আর্টিকল্‌টিতে শুধু নেগেটিভ দিক নিয়েই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সমস্যা ঃ আমাদের সমাজে বউ শাশুড়ী সমস্যা শুরু হয়ে যায় মোটামুটি বিয়ের পর থেকেই। বিশেষ করে যারা যৌথ পরিবারে বসবাস করে থাকেন তাদের সমস্যাটি খুবই প্রকোট। যেমন শাশুড়ী বউকে পর মনে করে আর সহ্য করতে পারেন না আবার বউ শাশুড়ীকে পর মনে করে এবং এক সময় সহ্য করতে পারেন না। বিয়ের পর থেকে কিছু দিনের মধ্যেই কেমন যেন দু'জন দু'জনের শত্রু হয়ে যান। কোন কোন পরিবারে এই শত্রুতা আরো প্রকট আকার ধারণ করার জন্য অথবা কমিয়ে আনার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের অন্য আর একজন ভুমিকা রাখেন, তিনি হচ্ছেন ননদ বা নোনাশ। হয় সে আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলার জন্য তাতে কেরোসিন ঢেলে দেয় অথবা আগুন নিভানোর জন্য পানি ঢেলে দেন। এক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্যরা যেমন স্বামী, শুশুর, দেবর বা ভাশুর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অপারগ হিসেবে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। তারা বিষয়টা বুঝেন কিন্তু সঠিক সমাধান কীভাবে হবে তার কোন কুল কিনারা করে উঠতে পারেন না। আবার অনেক ক্ষেত্রে শয়তানের প্ররোচনায় পরে নিজেরাও এই গৃহ যুদ্ধে জড়িয়ে পরেন। আমাদের সমাজে বউ শাশুড়ীর চারিত্রিক ব্যবহারের কিছু নমুনা নিম্নে লক্ষ্য করি ঃ

সমস্যার কিছু নমুনা

- বিয়ের পর থেকে দু'জনের মধ্যে দিন দিন ব্যবহারের পরিবর্তন হতে থাকে, হাসি মুখ দেখাই যায় না।
- একজন আরেকজনের দিকে ঠিক মতো তাকিয়ে দেখে না।
- একজন আরেকজনের সাথে ভাল ব্যবহার করে না।
- উভয়েই সব সময় মুখ গোমড়া করে রাখে।
- একে অপরকে ঠিকমত সম্মান করে না।
- একজন আরেকজনকে খুব বেশী পারিবারিকভাবে সময় দেয় না।
- বাসায় ঢুকে একে অপরকে সালাম দেয় না।
- বাসা থেকে বাইরে যাওয়ার সময়ও একে অপরকে সালাম দেয় না।
- একে অপরের সাথে প্রায়ই ঝাঁজি মেরে কথা বলে।
- একে অপরকে সব সময় কেমন যেন দূর্ব্যবহারের ভয়ে ভয়ে থাকে।
- সুযোগ পেলেই কথা দিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করে বসে।
- একে অপরের সাথে সাধারণতঃ এক সাথে বসে খাবার খায় না।
- রান্নার ব্যাপারে কোন প্রকার মন্তব্যই করা যায় না, করলে ক্ষেপে উঠে।
- একজন অপরজনকে সাধারণতঃ গুরুত্ব দেয় না।

- মনে হয় কোন কারণে মেজাজ সবসময় খিটমিটে থাকে।
- দু'জন দুই দিকে বা দুই ঘরে একা একা সময় কাটায়, খুব কমই এক সাথে বসে সময় কাটায়।
- কেউ কাউকে কাছে ডেকে নিয়ে বসে কথা-বার্তা বা গল্প করে না।
- শাশুড়ীর সেবা যত্ন যা করা হয় তা up to the mark নয়।
- সব সময় একে অপরের ভুল ধরার জন্য প্রস্তুত থাকে।
- একে অপরকে সবসময় খোটা দিয়ে কথা বলে।
- একজন আরেকজনের বদনাম পরিবারের অন্যান্যদের নিকট বা বাইরের লোকের কাছে করে থাকে।
- মনে হয় একজন আরেকজনের পিছনে সবসময় লেগে থাকে।

এখন এই সমস্যার কারণগুলো কী? কেন সমস্যা তৈরী হচ্ছে? ব্যাপারটা এমন নয় যে দু'জনের মধ্যে কোটি টাকার বনি বনা হচ্ছে না। আসলে সংসারের খুব সামান্য বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয় আর এভাবেই দিন দিন তা বাড়তে থাকে।

১. কেউ কাউকে ক্ষমার চোখে দেখে না।
২. দু'জনের মধ্যে মতের সেকরিফাইসের (ত্যাগের) অভাব ঘটে।
৩. প্রতিশোধ নেয়ার মতো একটা প্রবণতা কাজ করে।
৪. প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করে না অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় পায় না।

সমস্যার বিশ্লেষণ

বাস্তবে দেখা গেছে যে, নিজ ছেলে তার বউকে খুব ভালোবাসলে, তাকে কিছু উপহার দিলে শাশুড়ী মনে কষ্ট পান, হিংসায় জ্বলে পুড়ে যান। আবার একইভাবে ছেলে মাকে (শাশুড়ীকে) খুব ভালোবাসলে, কিছু উপহার দিলে বউ মনে কষ্ট পান এবং হিংসা করেন। শাশুড়ী মনে করে আমার ছেলে তার বউকে এতো সময় দেয় কেন? আবার বউ মনে করে আমার স্বামী তার মাকে এতো সময় দেয় কেন? ক্যানাডা-আমেরিকায় এমনও দেখা গেছে যে বউ-শাশুড়ীর বনিবনা না হওয়ায় ঝগড়া-ঝাটির জের হিসেবে ছেলেকে যেতে হয়েছে জেল-হাজতে, খেতে হয়েছে পুলিশের পানিশমেন্ট। অনেক শাশুড়ী আবার নিজের জীবনের প্রতিশোধ নেন (অবশ্য এটা খুবই কম ক্ষেত্রে)। কারণ তিনি যখন বউ ছিলেন তখন তার শাশুড়ীও তাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছিল, উঠতে বসতে তার ভুল ধরতো, তাকে খোটা দিত। তাই সেও এই সিনরিওগুলো ভুলতে পারেন না

এবং সে এটাকে ট্রেডিশন হিসেবে তার ছেলের বউয়ের সাথেও একই আচরণ করে থাকেন।

শাশুড়ীর নিজের মেয়ে কোন ভুল করে ফেললে বা কোন অন্যায় করে ফেললে যে চোখে দেখেন বা যেভাবে অতি সহজে ক্ষমা করে দেন তা ছেলের বউয়ের ক্ষেত্রে পারেন না। এর কারণ হচ্ছে তিনি ছেলের বউকে নিজের মেয়ের মতো দেখেন না। তিনি সবসময় মনে করেন বউ অন্য বাড়ির মেয়ে এবং সবসময় পরপর ভাবেন, কিছুতেই আপন করে নিতে পারেন না। তিনি এভাবে ভাবেন না যে তার নিজের মেয়েও একদিন অন্য বাড়ির বউ হয়ে যাবে বা গেছে এবং সেখানে যদি তার মেয়ের শাশুড়ী তার মেয়ের সাথে একই আচরণ করেন তাহলে তার কেমন কষ্ট লাগবে! তাহলে আমি কেন আমার ছেলের বউয়ের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলি না। আবার অনেক শাশুড়ী নিজ ছেলের বউয়ের উপর বদ-দু'আ দিয়ে থাকেন। তিনি চিন্তা করেন না যে এ তো আমারই পেটে ধরা ছেলের বউ, আমি যদি তার ক্ষতির জন্য বদ-দু'আ করি তাহলে তো আমার ছেলের পরিবারেরই ক্ষতি হবে, আমার নাতী-নাতনীরই ক্ষতি হবে।

একইভাবে ছেলের বউও অনেক ক্ষেত্রে শাশুড়ীর অনেক বিষয় সহজভাবে দেখেন না। সে চিন্তা করে না যে আমি এ যুগের একজন আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে কিন্তু আমার শাশুড়ীর বয়স হয়ে গেছে, তিনি আমার চেয়ে কম শিক্ষিতা, পুরোনো যুগের মানুষ, হয়তো অনেক কিছু মনে রাখতে পারেন না, ঠিক মতো বিচার-বিবেচনা করতে পারেন না। মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে শিশুর মতো হয়ে যান, শিশুদের মতোই ভুল করেন। এই সকল কারণে আমার চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা এবং আমার শাশুড়ীর চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটা গ্যাপ থাকাই স্বাভাবিক। আরো একটু গভীরে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে, আমিও একদিন আমার শাশুড়ীর মতো বৃদ্ধ হবো, বার্ধ্যক্যজনিত সমস্যা আমার মধ্যেও তখন তৈরী হবে, আমিও হয়তো আমার ছেলেকে বিয়ে দিয়ে ছেলের বউ ঘরে আনবো, তখন আমার ছেলের বউ আমার সাথে এমন ব্যবহার করলে আমার কেমন কষ্ট লাগবে! আবার আমি যদি শাশুড়ীর জায়গায় আমার নিজ জন্মদাত্রী মায়ের কথা চিন্তা করি যে তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং তিনি আমার নিজ মায়ের মতোই। অথবা আমার ভাইয়ের বউ যদি আমার মায়ের সাথে এমন আচরণ করেন তাহলে আমার কেমন কষ্ট লাগবে! বৃদ্ধা মার বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা এতো গুরুত্ব দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে বহু জায়গায় এর উল্লেখ আছে, বিষয়টি খুবই করুণ ঃ

“আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে [সদাচরণের] নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে, তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন-তো আমার কাছেই।” [সূরা লুকমান ঃ ১৪]

উপরের আয়াত দু’টি পড়লে একজন সন্তানের চোখে পানি এসে যায়। নিজ সন্তানের সামনে যদি তার বউ তার মার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে তার জন্য কতটা কষ্টের ব্যাপার তা একমাত্র মহান আল্লাহই হয়তো বুঝতে পারেন।

স্বভাবগত সমস্যা

১. দেখা গেছে কিছু কিছু মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে খুব চুপচাপ, সবসময় নিরবতা পছন্দ করে, একা একা থাকতে পছন্দ করে, প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা কথা-বার্তা বলে না, আগ বাড়িয়ে কখনো কোন কথা বলে না, অনেক কথার জবাবও পুরোপুরি দেয় না ইত্যাদি ইত্যাদি।

২. আবার দেখা গেছে কিছু কিছু মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে কর্কশ স্বরে কথা বলে, পরিবারের লোকদের সাথে যখন কথা বলে তখন মনে হয় সে খুব বিরক্ত। এতে অন্যেরা অতি সহজেই ভুল বুঝে।

৩. আবার দেখা গেছে কিছু কিছু মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে ঝাঝি মেরে কথা বলে। যখন কোন কথার উত্তর দেয় বা কাউকে কিছু সংশোধন করতে যায় তখন মনে হয় সে এভাবে আদব ছাড়া কথা বলছে কেন। এতেও অন্যেরা ভুল বুঝে এবং অপর পক্ষের মনে খুবই আঘাত লাগে।

এই তিনটি স্বাভাব যার মধ্যে আছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সে নিজে এটা বুঝতে পারে না যে এধরণের আচরণের কারণে অন্যেরা মনে কষ্ট পাচ্ছে বা অন্যেরা তাকে ভুল বুঝছে। এটা তার জন্মগত স্বভাব, সে এভাবেই বড় হয়েছে, এভাবে দীর্ঘ ২০-২৫ বছর বাবা-মার বাড়িতে পার করে শ্বশুর বাড়িতে এসেছে। কিন্তু তার শাশুড়ীতো আর তার স্বভাব সম্পর্কে জানেন না। এটা বুঝে উঠতে উঠতেই শুরু হয়ে যায় সংসারে ভুল বুঝাবুঝি। শাশুড়ী মনে করেন বউ মুড মারে, আমাকে গুরুত্ব দেয় না, আমার সাথে বেআদবের মতো আচরণ করে আমাকে অবহেলা করে বা আমাকে অপছন্দ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে দুই পক্ষের মধ্যে দিন দিন একটা বড় ধরণের communication gap সৃষ্টি হতে থাকে আর তা সংসারে অশান্তির জন্য বড় ধরণের ক্ষতির দিকে মোর নিতে থাকে।

নিজেদের সংসারে সুখের জন্য এই ক্ষেত্রে বউয়ের একটু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। একটু খেয়াল করলেই নিজের প্রকৃত ভুলগুলো ধরা সম্ভব। তাকে এই বিষয়ে আরো স্মার্ট হওয়া উচিত। নিজেদের কল্যাণের জন্যই অবস্থা বুঝে স্বভাব পরিবর্তন করা উচিত। হ্যাঁ স্বভাব পরিবর্তন এতোটা সহজ নয়। কিন্তু জীবনতো নিজের, সংসারও তো নিজের তাই কষ্ট হলেও তা পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত। কুরআনের ভাষায় 'হিকমত' অবলম্বন করা উচিত। শাশুড়ীর সাথে প্রয়োজনে অভিনয় করা যেতে পারে নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি থেকে দূরে থাকার জন্যে। এভাবে অভিনয় করতে করতে হয়তো একদিন নিজের স্বভাবও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। শাশুড়ী যেন মনে করেন আমার বউমার মতো মেয়েই হয় না, সে হচ্ছে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সফল বউ।

আবার বিপরীত যদি চিন্তা করি তাহলে শাশুড়ী যদি এমন কোন প্রাকৃতিক স্বভাব চরিত্রের মধ্যে থাকে তাহলে একই উপায়ে তার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা উচিত। তবে বাস্তবে দেখা গেছে যে, শাশুড়ী যদি জোয়ান হন তাহলে কাজটি যতটা সহজ কিন্তু মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে আর খুব সহজে দীর্ঘ দিনের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারেন না, আর এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এর উপর বৃদ্ধ হওয়ার কারণে আরো কিছু নতুন নতুন স্বভাব তার সাথে যোগ হয়, সেটাও আল্লাহর বিধান। তাই আমাদেরকেই সহশীলতা আরো বাড়াতে হবে। তাদেরকে ক্ষমার চোখে দেখতে হবে। তাদের দু'আ কুড়াতে হবে। তাদের মন জয় করে চলতে হবে। তাদের মনে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না।

বউ এর জন্য কিছু করণীয়

১. ভাল না লাগলেও সবসময় শাশুড়ীর খোঁজখবর নেয়া।
২. শাশুড়ীর মাথা আঁচড়িয়ে দেয়া, মাথায় তেল দিয়ে দেয়া।
৩. শাশুড়ী ঠিক মতো ঔষুধ-পত্র ঠিক মতো খাচ্ছেন কিনা তা খেয়াল রাখা।
৪. শাশুড়ীর ব্লাডপ্রেসার বা ডায়েবেটিস মেপে দেয়া বা তাকে মাঝে মধ্যে ডাক্তারের কাছে চেকআপের জন্য নেয়া।
৫. মাঝে মধ্যেই শাশুড়ীর পড়নের কাপড় লন্ড্রি করে দেয়া।
৬. শাশুড়ী যা খেতে পছন্দ করেন তা মাঝে মধ্যে ঘরে রান্না করা।
৭. শাশুড়ীর সাথে বসে গল্প করা বা টিভি দেখা।
৮. শাশুড়ীকে কোন কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখা যে কাজটি তিনি খুব পছন্দ করেন এবং আগ্রহভরে করেন।
৯. শাশুড়ীকে সবসময় সালাম দেয়া (অর্থাৎ তার শান্তি কামনা করা)।

১০. বাইরে যাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞেস করা যে তার কিছু লাগবে কিনা।
১১. শাশুড়ীর জন্য মাঝে মধ্যেই উপহার নিয়ে আসা যদিও সস্তা দামেরও হয়।
১২. শাশুড়ীকে বেশী বেশী করে কুরআন ও হাদীস থেকে নাবী-রসূলদের জীবনী শুনানো, সাহাবাদের জীবনী শুনানো।
১৩. শাশুড়ীকে ইসলামিক ডিভিডি ছেড়ে দেয়া এবং সেখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে মাঝে মধ্যেই আলোচনা করা।
১৪. শাশুড়ীকে বিভিন্ন ইসলামিক প্রোগ্রামে নিয়ে যাওয়া।
১৫. শাশুড়ী যদি অন্য কারো গীবত করতে শুরু করেন তাহলে তা হিকমতের সাথে (অর্থাৎ টেকনিকের সাথে) অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়া।
১৬. অন্যের কাছে সবসময় শাশুড়ীর প্রশংসা করা যদিও তিনি খারাপ হন।
১৭. শাশুড়ী যদি কোন ভুল করে ফেলেন বা কোন অন্যায় কাজ বা কথা বলেন তৎক্ষণাত উত্তর না দিয়ে অপেক্ষা করা।
১৮. সময় সুযোগ মতো তাকে কুরআন-হাদীসের আলোকে তার ভুলের সংশোধন করে দেয়া, তবে মনে রাখতে হবে বিষয়টি খুবই সেনসিটিভ। তিনি যেন আবার ভুলের উপর ভুল না বুঝেন। এতে হাসব্যন্ডের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।
১৯. শাশুড়ীর কথার নেগেটিভ জবাব না দেয়া বা তার মুখে মুখে কথা না বলা।
২০. শাশুড়ী যেন ভুল বুঝে কোনভাবেই বদদু'আ করার সুযোগ না পায় সেদিকে সচেতন থাকা।
২১. সবসময় শাশুড়ীর জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করা।
২২. নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট দিয়ে শাশুড়ীর মনমানসিকতা পরিবর্তন করে ফেলা যেন সে বউ ছাড়া আর কিছুই না বুঝে।
২৩. এটাকে জীবনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়া এবং সবসময় মহান আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখা।
২৪. কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন-হাদীসের আশ্রয় নেয়া এবং সেজন্য নিয়মিত কুরআনের ব্যাখ্যা, হাদীস গ্রন্থ ও সাহাবীদের জীবনী পড়া।

শাশুড়ীর সাথে সময় কাটানোর জন্য গল্পের আরো কিছু বিষয় যা সাধারণতঃ বয়ষ্করা পছন্দ করেন। যেমন ঃ তার অতীতকাল কেমন কেটেছে? তার বিয়ের আগে কোথায় কোথায় ছিলেন? মুক্তিযুদ্ধের সময় কীভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করেছেন? গ্রামের বাড়িতে কে কে আছে? দেশের বাড়ি কে দেখাশোনা করেন? গ্রামের বাড়িতে কী কী ফসল হতো? তার ভূমিকা কী ছিল? বাড়িতে রাখাল কয়জন ছিল? ধানি জমি কেমন ছিল? কীভাবে তার বিয়ে ঠিক হলো? তার বাবা-

মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী কেমন ছিলেন? দেশে আত্মীয়-স্বজন কে কে আছেন? তখন নদীতে মাছ কেমন হতো? তখন কী কী পিঠা বানানো হতো? ইত্যাদি ইত্যাদি। আলোচনার বিষয়গুলো এমন দিকে ধরে রাখা যে তা যেন কোনভাবেই কারো বিরুদ্ধে গীবত বা সমালোচনার দিকে না যায়, কারো ক্ষতি না হয়। উদ্দেশ্য আলোচনা করে সময় কাটানো, তাকে সংগ দেয়া।

আমরা যদি ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে দেখি তাহলে সবসময় মনে করা উচিত যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরো আট-দশজন থেকে অনেক ভাল রেখেছেন, সঠিক দ্বীন ইসলামের বুঝ দিয়েছেন, ইসলামী পরিবেশ দিয়েছেন, তার জন্য সবসময় মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে শোকরিয়া আদায় করা উচিত। মু'মিন মু'মিনের আয়নাস্বরূপ, ভুল সংশোধন করে দেয়া একে অপরের ঈমানী দায়িত্ব, কাউকে হেয় বা ছোট করা নয়। আমাকে সবসময় এটা মনে রাখতে হবে যে আমার প্রতিটি কার্যকলাপের জন্য আখিরাতে আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ তাঁর কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন যে ঃ *"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার"। (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)*

অপরদিকে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস পড়লে দেখতে পাই সেখানে মু'মিন মুসলিমগণ পরস্পর ভাই হিসেবে একের প্রতি অপরের দায়িত্ব কর্তব্য কি তার বিশদ বর্ণনা। ইমাম নববীর বিখ্যাত হাদীস সংকলন "রিয়াদুস সালেহীন" গ্রন্থের ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮ এবং ২৩৯ নম্বর হাদীসগুলোতে বুখারী এবং মুসলিমের বরাত দিয়ে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো থেকে আমরা আমাদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি এবং তদনুসারে জীবনযাপন করতে পারি এবং আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারি। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একজন মুসলিম অপর একজন মুসলিমের ভাই। তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) এক ভাই অপর ভাইয়ের কোন ক্ষতি করবে না;

(২) তার সংগে শত্রুতা করবে না, তাকে পরিত্যাগ করবে না;

(৩) তার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না;
(৪) তার সংগে মিথ্যা বলবে না;
(৫) তাকে লজ্জিত, অপদস্থ অথবা অপমানিত করবে না;
(৬) তার প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করবে না;
(৭) যে তার ভাইয়ের দোষক্রুটি ঢেকে রাখবে আল্লাহ হাশরের দিনে তার দোষক্রুটি ঢেকে রাখবেন;
(৮) যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে হাশরের দিনে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন;
(৯) যে তার ভাইয়ের বিপদাপদে সাহায্য করবে হাশরের দিনে আল্লাহ তার বিপদাপদ দূর করবেন;
(১০) একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের আরো কর্তব্য রয়েছে ঃ

ক) তাকে সালাম দেয়া ও তার সালামের জবাব দেয়া;
খ) সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া;
গ) মৃত্যুর পর তার জানাজার সংগে যাওয়া এবং জানাজার সলাত পড়া;
ঘ) সে দাওয়াত দিলে তা কবুল করা;
ঙ) সে হাঁচি দিয়ে যখন "আলহামদুলিল্লাহ" বলে তখন তার জবাবে "ইয়ারহামুক আল্লাহ" (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলা;
চ) সে কোন পরামর্শ চাইলে তাকে সৎপরামর্শ দেয়া;
ছ) প্রতিজ্ঞা পালন করা।

সন্তানদেরকে সমানভাবে গুরুত্ব দান

আমরা জানি মহান আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার জন্য সন্তানদের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অনেকগুলো হকের মধ্যে একটি হচ্ছে সমবন্টন। যেসব পরিবারে একাধিক সন্তান, বাস্তবে দেখা গেছে যে কোন কোন পিতামাতা সকল সন্তানদেরকে একই রকম ভাবে দেখেন না, কাউকে বেশী গুরুত্ব দেন আবার কাউকে অবহেলা করেন। এর পিছনে অনেকগুলো কারণও রয়েছে, তার মধ্যে ইসলামী শিক্ষার অভাব ও দারিদ্রতা এ দু'টি হচ্ছে প্রধান কারণ।

একজন ইয়াতীমের দায়িত্ব নেই

আমি কি কখনও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে আমরা যারা বিদেশে থাকি আমার এক কাপ কফির দামে বাংলাদেশে একজন ইয়াতীম বাচ্চা মানুষ হতে

পারে! আমরা যারা আমেরিকা– ক্যানাডায় বসবাস করি তাদের নিকট ১টি ডলার তেমন কোন amount-ই না, কিন্তু এই ১টি ডলার = বাংলাদেশে ৮০ টাকা যা দিয়ে একটা গরিব পরিবারের একদিনের বাজার খরচ হতে পারে। তার মানে আমি প্রতিদিন ১ ডলার করে মাসে ৩০ ডলার একটা পরিবারকে দিলে তাদের সংসার চলতে পারে। আমি কি জানি আমার সম্পদের উপর অন্যদের হক রয়েছে আর তা আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় সূরা আয-যারিয়াতের ১৯ নং আয়াতে বলেছেন ঃ *"এবং তার ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত জনের অধিকার রয়েছে"*

অর্থাৎ আমার উপার্জিত সম্পদের উপর সমাজের অপেক্ষাকৃত সহায় সম্পদহীন পরিবার ও মানুষের একটা ন্যায্য অধিকার আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। আমাদের গরীব আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, ইয়াতীম ইত্যাদি লোকদের প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর নেয়া ও তাদের জন্য সামর্থনুযায়ী আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা আমাদের সকলের উপর আল্লাহ নির্ধারিত অর্থনৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ *"নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দিয়ে দাও, আর মিসকিন ও সম্বলহীন পথিককে তাদের অধিকার। তোমরা অপব্যয়-অপচয় করো না" (সূরা আল-ইসরা ঃ ২৬)*

বঞ্চিত ও প্রার্থীগণ যদি সামাজিকভাবে আপনার অপ্রিয়ও হয় তাহলেও তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে যেতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নূরের ২২ নম্বর আয়াতে তা বলেছেন। সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। ধরি আমার কোন সন্তান নেই অথবা ১টি বা ২টি সন্তান আছে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে আরো ১টি সন্তান দিতেন তাহলে তাকেও আমি অন্য সন্তানের মতোই মানুষ করতাম, কোথাও কমতি করতাম না। তাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য পরকালের মুক্তির কথা চিন্তা করে অনায়াসেই আমি আমার কোন গরীব আত্মীয়ের একটা সন্তান বা কোন একটা ইয়াতীম বাচ্চার দায়িত্ব নিতে পারি। একবার চিন্তা করি দেখি আমি কতো দিকে কতো পয়সা নষ্ট করছি এবং তা দিয়ে কয়টা ইয়াতীম বাচ্চা মানুষ হতে পারে!

একজন ইয়াতীম কতো অসহায়! তাই মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইয়াতীমের গুরুত্বের কথা বার বার বলেছেন। একবার কি ভেবে দেখেছি যে আজ আমি যদি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই কাল আমার সন্তানও এমন ইয়াতীম হয়ে যেতে পারে! তাই আমার মন কি চায় না যে এমন একজন ইয়াতীমের কষ্ট দূর করতে? স্বামী-স্ত্রী মিলে খুব গভীরভাবে একবার ভেবে দেখি কিভাবে এই লাভবান প্রজেক্ট হাতে নেয়া যায় এবং সামনের মাস থেকেই ইন্‌শাআল্লাহ শুরু

করে দিতে পারি। আমি মাসে মাসে শুধু টাকা দিয়েই যেন বসে না থাকি, নিয়মিত তদারকি করি যাতে এই ইয়াতীমটি ভবিষ্যতে একজন ভাল শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হতে পারে যার পুরস্কার আমি মহান আল্লাহর কাছ থেকে পাবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়া সমস্যা ও সমাধান

ভাড়াটিয়াদের কাছে বাড়ির মালিকের হক বা অধিকার

১. প্রতি মাসের শুরুতে ১-৫ তারিখের মধ্যে বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করে দেয়া উত্তম। অন্যদিকে কোনভাবেই বাড়িওয়ালা যেন খুঁজে ভাড়ার টাকা নিতে না হয় সেদিকেও গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখা।

২. বাড়ি বা ফ্লাটটিকে নিজের মনে করে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রেখে ব্যবহার করা।

৩. দেয়ালের গায়ে পেরেক বা ময়লা বা দাগ পড়বে এমন কিছু না করা, তারপরও বিশেষ প্রয়োজন হলে মালিকের সাথে আলোচনা করা।

৪. দরজার সিটকিনি/জানালার কাঁচ যেন ভেঙ্গে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা।

৫. পানির টেপ বা ঝরণা, বৈদ্যুতিক সুইচ ইত্যাদি যত্নের সাথে ব্যবহার করা এবং যেন ভেঙ্গে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা।

৬. বাসার মেঝেতে মোজাইক বা টাইলস থাকলে বা এমনিতেও মেঝে ফেটে যাওয়া বা গর্ত হয়ে যেতে পারে এমন কিছু না করা।

৭. দরজা খুব জোরে না লাগানো; সিড়ি বেয়ে উঠা বা নামার সময় জোরে শব্দ না করা।

৮. বাড়ির প্রধান ফটক দায়িত্বের সাথে বন্ধ এবং খোলা।

৯. অনেকে মনে করে ভাড়া নিয়েছি যেভাবে ইচ্ছে হবে সেভাবে ব্যবহার করব এমনটি মনে না করা।

১০. যে কোন সমস্যা বাড়ির মালিককে তৎক্ষণাৎ জানানো।

১১. বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া। অপ্রয়োজনে সবসময় বাতি নিভিয়ে রাখা।

১২. পানি ব্যবহারে সকলকে সচেতন হতে হবে অর্থাৎ অপচয় না করা।

১৩. এভাবেই সকল ভাড়াটিয়া সচেতন হলে বাড়ির মালিকরা সন্তুষ্ট থাকবেন। এতে মুখ কালো করা, মন খারাপ করার মত কোন পরিস্থিতি হবে না।

বাড়ির মালিকের কাছে ভাড়াটিয়ার হক

১. বাড়ির বা ফ্লাটের বা কক্ষের ভাড়া যতটা সম্ভব সহনশীল পর্যায়ে রাখা ।

২. পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের লাইনে কোন সমস্যা থাকলে তা দ্রুত সমাধান করে দেয়ার চেষ্টা করা ।

৩. ভাড়াটিয়ারা অত্যন্ত কাছে অবস্থানকারী হওয়ায় নিকটতম প্রতিবেশীর যে হক তা আদায়ের হুকুম চলে আসে। সুতরাং তাদের সুবিধা, অসুবিধা খোঁজ-খবর নেয়া ।

৪. সাময়িক কারণে ভাড়া দিতে না পারলে ভাড়াটিয়াদের সাথে রাগারাগি করা, বকাবকি করা, সব শেষে জিনিসপত্র আটকে রেখে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া অমানবিক ।

৫. ভাড়াটিয়াকে পছন্দ না হলে তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলা উচিত এবং নোটিসের ভিত্তিতে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া ।

৬. কোথাও কোথাও শুনা যায়, গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের বিল বাড়িওয়ালা পরিশোধ করে ফলে রাত দশটা বাজলেই চিৎকার করতে থাকে লাইট নিভাও লাইট নিভাও। যা ভাড়াটিয়ার সন্তানদের পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটে ।

৭. কোথাও শুনা যায়, স্বামী-স্ত্রী হলে ভাড়া হবে, সন্তান থাকলে ভাড়া দেয়া যাবে না বা দেয়া যাবে তবে তা হবে শর্তযুক্ত। কারণ বাচ্চা এটা সেটা ধরবে, ক্ষতি করবে, চিৎকার করবে ইত্যাদি। এমন ক্ষেত্রে বাড়িওয়ালার মনে করা উচিত এক সময় আপনিও বাচ্চা ছিলেন। কাজেই একটু ত্যাগ, একটু ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ খুশী হবেন ।

৮. আবার শুনা যায়, নিকট আত্মীয়-স্বজন বাসায় আসলে বাড়িওয়ালা তাদের সামনে শুনিয়ে শুনিয়ে আজেবাজে কথাবার্তা বলে। ভাড়াটিয়ার স্থানে বাড়িওয়ালা থাকলে তার কেমন লাগতো?

৯. রাত এগারোটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত মেইন গেট বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে প্রবেশ ও বাইরে যাওয়া শর্ত জুড়ে দেয়া ঠিক না। বাড়িওয়ালা ও তার নিজ সন্তান যদি রাত এগারোটার পর বাসায় ঢুকতে পারে তাহলে ভাড়াটিয়ার বিশেষ কোন কারণে একটু দেরী হলে বাড়িওয়ালার মুখ কেন কালো হবে? এমন কষ্ট দেয়া ঠিক না ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল ইনকাম

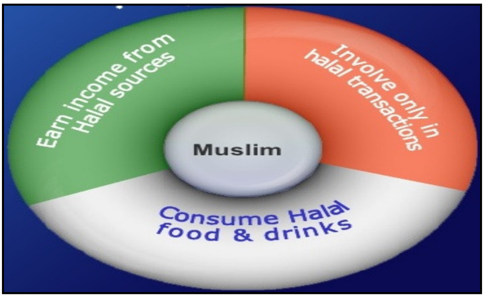

ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজী। হালাল ইনকাম সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশী জানি কিন্তু খুব সুক্ষ্মভাবে কুরআন-হাদীসের আলোকে কখনো ভেবে দেখিনি। সলাত-সিয়ামের মতো এটিও যে একটা ফরয ইবাদত তা আমরা সতর্কতার অভাবে ভুলে বসে আছি। আমাদের প্রায় সকলেরই অভিযোগ যে বাংলাদেশে মানুষ অসৎ, ঘুষ খায়, চুরি করে ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষয়গুলো আমি কি কখনো আমার নিজের আয়-রোজগারের ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের আলোকে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি? যেমন ইসলামের দৃষ্টিতে যিনি ঘুস খান এবং যিনি ঘুস দেন দু'জনই কবীরাহ গুনাহর সাথে জড়িত। আবার যিনি সুদ খান, যিনি সুদ দেন এবং যিনি সুদের ট্রানজেকশন লিখেন বা হিসাব রাখেন সকলেই কবীরাহ গুনাহর সাথে জড়িত।

এই অধ্যায়ে রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের ব্যাপারে মুসলিম পরিবারগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে মাত্র। সকলের নিকট বিশেষ অনুরোধ, প্রিয় পাঠকবৃন্দ এই বিষয়গুলিকে কোন তর্কের বিষয় না বানাই। কিছু কিছু সিনারিওগুলো কারো কারো জীবনের সাথে আংশিক বা পুরোপুরি মিলে যেতে পারে কিন্তু অবশ্যই তা কাউকে নির্দিষ্ট করে নয় বা কাউকে বিন্দুমাত্র হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কিছু নয়। এখানে শুধু মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে পালন করতে গিয়ে এই বিষয়ের উপর কুরআন হাদীসের উপর এনালাইসিস করা হয়েছে মাত্র। এবং বোঝানোর সুবিধার্থে কিছু কমন চিত্র উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

আজ আমরা যদি একে অপরকে সতর্ক না করি তাহলে একদিন আখিরাতের ময়দানে একজন আরেক জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন এই বলে যে "কই

আমাকে তো উনারা সতর্ক করেননি!” পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *“তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে।”*

তাই একে অপরকে সতর্ক করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ *“তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই হ'ল সফলকাম।” (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪)*

হালাল ইনকাম কেন ফরয?

আমরা জানি প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য হালাল রুজির সন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত অর্থ-সম্পদ বা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হয় না।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিকপ্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজাহ)

“হে মানব মন্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (সূরা বাকারা ঃ ১৬৮)

“হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদত কর।” (সূরা বাকারা ঃ ১৭২)।

“হে নাবী! তাদের বল, আমার আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই নির্লজ্জতার কাজ প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি।” (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৩)

“আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল।” (সূরা মায়িদা ঃ ৫)

রসূল ﷺ বলেছেন, মানবজাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোজগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না। (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরযের পরে ফরয। (বায়হাকী)

রসূল ﷺ বলেছেন, শরীরের যে অংশ হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিন্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য। (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র এবং কেবলমাত্র পবিত্র বস্তুই তিনি গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছেন পয়গাম্বরদেরকে। আল্লাহ বলেছেন, “হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।” (অনুরূপভাবে) তিনি মু'মিনদেরকে বলেছেন, “হে ঈমানদারেরা! আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য হতে আহার গ্রহণ কর।” অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ তুললেন, যিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধূলি-মলিন অবস্থায় (কোন পবিত্র স্থানে হাযির হয়ে) দু'হাত আকাশের দিকে তুলে (দু'আ করে আর) বলে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও লেবাস সব কিছু হারামের, এমনকি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্য দিয়েই জীবনধারণ করেছে। সুতরাং তার দু'আ কি করে কবুল হবে! (সহীহ মুসলিম)

রিযিক একমাত্র আল্লাহর হাতে?

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন রিযিকের মালিক একমাত্র তিনি। আর আমরা তার উল্টোটা করছি। অর্থাৎ রিযিকের দায়িত্ব নিজের ঘারে নিয়ে নিয়েছি। অথচ সূরা ইসরার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

“নিশ্চয় তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন, যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন।” তিনি আরো বলেছেন ঃ *“এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।” (সূরা আন-নাজম ঃ ৪৮)*

“মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, মূলতঃ আল্লাহর কাছে তাতে সম্পদ মোটেই বৃদ্ধি পায় না কিন্তু তোমরা যে যাকাত আদায় কর একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার উদ্দেশ্যে তা অবশ্যই বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।” (সূরা আর রুম ঃ ৩৯)

আমরা আল্লাহ তা’আলার উপর ভরসা রাখতে পারছি না, অর্থের লোভে দিশে-হারা হয়ে যাচ্ছি, যে দিকে যা পাচ্ছি বাছবিচার না করে তাই পকেটে ভরছি।

ইনকাম ট্যাক্স সরকারের হক

মনে রাখতে হবে আমার ইনকাম এর মধ্যে সরকারের হক রয়েছে, অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স। জনগণ থেকে ট্যাক্স নিয়েই সরকার আমাদেরকে নানারকম নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে। যেমন ঃ শিক্ষা, বাসস্থান, রোড-ঘাট, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, পার্ক, নিরাপত্তা, শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুলিশ, আর্মি, ইত্যাদি।

তাই কারো হক নষ্ট করা ঈমান বর্হিভুত কাজ অর্থাৎ একজন মুসলিম হয়ে আমি কারো হক নষ্ট করতে পারি না। আর বান্দার হক আল্লাহ তা’আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। পরকালের জীবনকে যারা সত্যই বিশ্বাস করি তাদেরকে অবশ্যই বান্দার হকগুলি আদায় করতে হবে আর বান্দার হকের মধ্যে ৫ম নাম্বারটি হলো সরকারের হক। কারণ আল্লাহ তা’আলার হক বহুক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলা মাফ করবেন কিন্তু বান্দার হক বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ তা’আলা মাফ করবেন না।

পরকালে আল্লাহ তা’আলা মাফ করবেন এই নিয়্যতে যারা পরের হক নষ্ট করবো তারা খুবই ভুল করবো। নিজেকে নিজেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবো। মনে রাখতে হবে সেখানে সব কিছুই মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে এবং যিনি মনের খবর রাখেন তিনি অবস্থা মুতাবেক বিবেচনা করবেন। কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁকিবাজি থাকলে আল্লাহ তা’আলার দয়া পাওয়া যাবে এমন কোন ওয়াদা আল্লাহ তা’আলার নেই। তাই আর কোন অপরাধে নয় শুধুমাত্র অন্যের হক নষ্ট করার কারণেই বহু লোককে জাহান্নামে যেতে হবে। কুরআন-হাদীসের আলোকে মানুষের প্রতি মানুষের হককে প্রথমতঃ আটটি ভাগে ভাগ করা যায় তা আমরা আগেই দেখেছি। এই আটটি শ্রেণীবিভাগে কার কতটুকু দায়িত্ব ও

কর্তব্য তা আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। সূরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করেছেন।

সম্পদের প্রকৃত মালিকানা কে?

আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, যাবতীয় সকল কিছুর মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা ঃ *"আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর।" (সূরা হাদীদ ঃ ১০) "আর যা কিছু আসমান ও জমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর প্রতি সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৯)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ঘোষণা করছেন ঃ সবই আল্লাহর। অর্থাৎ একজন সম্পদশালী যেন এ কথা মনে না করেন যে তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম আর ডিপ্লোমেসী দিয়ে অবাধ সম্পদের মালিক হয়েছেন। সুতরাং পুরো সম্পদটাই তার একান্ত ব্যক্তিগত ও এতে আর কারো ভাগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বার বার বলেছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যা দিয়েছি বলে দাও তারা যেন সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে (সংক্ষেপিত) সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩১

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। চাকুরী, ব্যবসা, অর্থ, ফসল, মুনাফা লাভ সবই আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন। মানুষ কেবল নিজ চেষ্টাবলে সম্পদ অর্জন করতে পারে না। অর্থাৎ আয় উন্নতির কমতি বা ফুলে ফেঁপে উঠা সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হয়। এখানে দুই নাম্বারীর কোন পথ খোলা নেই।

পরহেজগারী

সমাজে অনেকে আমরা পরহেজগার বলে পরিচিত, কেউ কেউ সলাত আদায় করতে করতে কপালে দাগ ফেলে দিয়েছি, কেউ কেউ পরহেজগারীকে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, আর কয়েকবার হাজ্জের মধ্যে সীমিত করে ফেলেছি। হাজ্জ করে হাজী নামে ডাক শুনতে ভাল লাগে, কেউ কেউ তো রাগ করি, কেন হাজী বলা হচ্ছে না। অনেকে চিল্লা দিতে দিতে বড় বুজুর্গ হয়ে গেছি। অনেকে সারা রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে দুই চোখ ফুলিয়ে ফেলেছি। অনেকে ইসলামী আন্দোলন করতে করতে অনেক বড় মাপের নেতা বা নেত্রী হয়ে গেছি। আবার অনেকে উচ্চ মাত্রার পর্দা করেও চলছি অথচ আল্লাহ তা'আলার ফরয হুকুম হালাল রুজীর বেলায় আমরা উদাসীন, তখন আমরা এই সিম্পল ব্যাপারটা আর

বুঝি না। অন্যকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছি কিন্তু নিজের ঘর ঠিক নেই। আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত ফরয বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন আল কুরআনে। বড় ও উচ্চমানের কাজের লিষ্টও আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সেসব জানা বা পড়ার সময়তো নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

তোমরা পূর্বদিকে মুখ করিলে কি পশ্চিম দিকে, তাহা কোন প্রকৃত পূণ্যের ব্যাপার নয়। বরং প্রকৃত পূণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহকে, পরকাল ও ফিরিশতাকে এবং আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও নাবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে; (সংক্ষেপিত) সূরা বাকারা ঃ ১৭৭

কখনও কখনও বৈধ কাজ অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা যেসব কাজে গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কখনও বৈধ কাজ অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোন মু'মিনের সামনে কেবল বৈধতার দিকটিই উপস্থিত থাকবে না; বরং এই বৈধ কাজ কোথাও যেন হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ না হয় সেদিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়িশা! ছোটখাট গুণাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এ জন্যও আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কবীরা গুনাহ যেমন কোন মুসলিমদের মুক্তিলাভকে বিপদগ্রস্ত করে দেয়, তেমনি ছোটখাট গুনাহও কম বিপদ নয়। ছোটখাট গুনাহ বাহ্যত হালকা ও তুচ্ছ মনে হলেও তা বারবার করার কারণে অন্তরাত্মায় মরিচা ধরে যায় এবং কবীরা গুনাহর প্রতি ঘৃণাবোধ নিঃশেষ হয়ে যায়।

একটি বাস্তব উদাহরণ ঃ লটারী বা জুয়া ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এক ভাইকে সতর্ক করতে যেয়ে উনি প্রতিউত্তরে বলেছিলেন "আমি লটারী/জুয়া খেলে কোটি

টাকা পেলে দেশের অসহায় মানুষদের সেবা করব।" যা হোক আমরা জানি দুই নাম্বারী পথের টাকা আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই।

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের যাকাত দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। বরং এ অর্থ বহন করা মানে জলন্ত অঙ্গার বহন করা। সুতরাং এ পুঁজ যত তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা যায় আপন স্বাস্থ্যের জন্য তত ভাল।

রসূল ﷺ বলেছেন, হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোন বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ কোন সম্পদের সাথে যাকাতের সম্পদ মিশ্রিত হলে তা উক্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। (সহীহ বুখারী)

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ জীবনে নিয়ে আসতে পারে অশান্তি

- সন্তান-সন্ততি মানুষ নাও হতে পারে।
- স্ত্রী বা স্বামী কথা নাও শুনতে পারে।
- অভাব সবসময় লেগেই থাকতে পারে।
- সংসারে আয়-বরকত নাও হতে পারে।
- ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি নাও হতে পারে।
- কর্মক্ষেত্রে শান্তি নাও পাওয়া যেতে পারে।
- একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই থাকতে পারে।
- যে কোন ধরণের বিপদ-আপদ আসতে পারে।
- পরিবারে এবং নিজের মনে সবসময় অশান্তি লেগেই থাকতে পারে।
- জীবনে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

- সবসময় মনে হবে আরো চাই! আরো চাই! কখনো মনে তৃপ্তি আসে না।
- টাকা একদিক দিয়ে আসবে আর একদিক দিয়ে ডাবল চলে যেতে পারে।
- আখিরাতে চরম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ কোন আদম সন্তানই আখিরাতের ময়দানে ৫টি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত এক কদমও নড়তে পারবে না।

১) তার জীবনকাল কোন কাজে অতিবাহীত করেছে?
২) যৌবনের শক্তি সামর্থ কোন কাজে লাগিয়েছে?
৩) কোন উপায়ে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে?
৪) কোন উপায়ে সেই ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে?
৫) অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?

কার জন্য এই এতো কষ্ট?

আমি কার জন্য এই এতো কষ্ট করছি? কার জন্য এই গাড়ি, বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স করছি? মনে রাখা উচিত যাদের জন্য আমি আজ এই অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নিচ্ছি তারাই একদিন আখিরাতের ময়দানে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিবে এবং বলবে আমরা তো উনাকে এভাবে আয় করতে বলিনি। সূরা মুনাফিকুন এর ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সতর্ক করে বলেন ঃ "মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়।" তিনি আরো বলেন ঃ

"কোন বোঝা বহনকারী অন্য কোন লোকের বোঝা বহন করবে না। মানুষের জন্য তাই যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। তার চেষ্টা প্রচেষ্টা খুব শীঘ্রই দেখা যাবে।" (সূরা নাজম ঃ ৩৮-৪০)

অবৈধ ইনকামের বিশ্লেষণ ও সমাধান

১. কিসের অভাবে আমরা অন্যায়কে অন্যায় মনে করি না?
২. কিসের অভাবে আমরা লোভ সামলাতে পারি না?
৩. কিসের অভাবে আমরা সামান্য লাভের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেই?
৪. কিসের অভাবে আমরা অন্যায় করেও মনে করি আমি ঠিকই আছি?
৫. কিসের অভাবে আমাদের বিবেক ভোতা হয়ে গেছে?
৬. কিসের অভাবে আমাদের মনে অপরাধ বোধ জাগে না?

এবার আসুন এর সমাধান কোথায়? সূরা কিয়ামাহর ১৪-১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"বরং মানুষ নিজেই নিজেকে খুব ভালভাবে জানে, সে যতই অক্ষমতা পেশ করুক না কেন।"*

আমার নিজের সমাধান আমি ভালই জানি। আসুন নিজের কথা ভাবি। নিজের সমাধান নিজেই করি। আল্লাহকে ভয় করি, চোখ বন্ধ করলে সব শেষ, কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না শুধু দুই টুকরো কাফনের কাপড় ছাড়া। সন্তানদের সঠিক পথে মানুষ করি, না পারলে এরাই একদিন আমার কষ্টে গড়া সম্পত্তি বিক্রি করে খাবে আর আমাকে দোষারোপ করবে। আসুন অনেক ভাল ভাল কাজ করে পূর্বের গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করি। আমি কোথায় কী করি, কবে কি করেছি একজন তার সবই জানেন। তাই তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কী সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সে সব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর।" (সূরা হাশর ঃ ১৮)

যে আমলে রিযক বাড়ে

১ম আমল ঃ তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা।
২য় আমল ঃ তাওবা ও ইস্তিগফার করা।
৩য় আমল ঃ আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা।
৪র্থ আমল ঃ নাবী ﷺ -এর উপর দুরূদ পড়া।
৫ম আমল ঃ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা।
৬ষ্ঠ আমল ঃ বারবার হাজ্জ-উমরা করা।
৭ম আমল ঃ দুর্বলের প্রতি সদয় হওয়া বা সদাচার করা।
৮ম আমল ঃ ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হওয়া।
৯ম আমল ঃ আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা।
১০ম আমল ঃ আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।
১১শ আমল ঃ বিয়ে করা।
১২শ আমল ঃ অভাবের সময় আল্লাহমুখী হওয়া এবং তার কাছে দু'আ করা।
১৩শ আমল ঃ গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দ্বীনের উপর সদা অটল থাকা এবং নেকীর কাজ করে যাওয়া।

দান-সদাকার গুরুত্ব

সদাকা খুবই শক্তিশালী একটি জিনিস। সদাকা দানকারীকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র করেন। কিভাবে করেন? সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে মেরে ফেলে। রসূল ﷺ -এর একটি হাদীসের সারমর্ম হচ্ছে এক পাল ভেড়ার মধ্যে যদি দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে ছেড়ে দেয়া হয় তা হলে ঐ ক্ষুধার্ত নেকড়ে দু'টি ঐ ভেড়ার পালের যতোটা না ক্ষতি করতে পারবে, সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মার, মনের, চরিত্রের তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করে ফেলবে। আর যখন এই সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে ফেলে, তখন সদাকা ঐ মৃত আত্মাকে জীবিত করে অর্থাৎ পবিত্র করে।

কুরআনে সদাকার সর্বনিম্ন হার এবং সর্বোচ্চ হারের নির্দেশ

- *"সলাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর।" [২.৫%] (সূরা বাকারা ঃ ৪৩)*
- *"তারা জিজ্ঞেস করে [আল্লাহর রাস্তায়] কি খরচ করবো? বলে দাও যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা, তাই খরচ করবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)*

উপরের আয়াত দু'টি যদি আমরা পর্যালোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে একই সূরায় অর্থ ত্যাগের বিষয়ে দু'টি সীমা দিয়েছেন। একবার বলেছেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব দান করে দাও। যেমন- একজনের মাসে ইনকাম ৫০ হাজার টাকা আর তার মাসে খরচ হয় ৩০ হাজার টাকা। এখানে প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আল্লাহ তা'আলা সব দান করে দিতে বলেছেন। আবার বলেছেন অন্ততপক্ষে ২.৫% দিতেই হবে এর কম দিলে হবে না। এখন এটা নির্ভর করবে আমার তাকওয়ার লেভেল কোথায় তার উপর? আমি কি সর্বোচ্চ লেভেল অনুসরণ করবো নাকি সর্বনিম্ন লেভেল অনুসরণ করবো? সকল নাবী-রসূলগণ (আ'লাইহিস সালাম) এবং সাহাবাগণ (রা.) সর্বোচ্চ লেভেলই অনুসরণ করেছেন। তারা শুধু ২.৫% নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। এটা খুবই সাধারণ একটি অংক, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে যতো বেশী ব্যয় করবে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ততো বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

অর্থ উপার্জনে শর্ত

- অর্থ উপার্জনে বৈধতা, রাহবানিয়াত নিষেধ।
  - উত্তম নিয়ত;
  - হালাল উপায়ে উপার্জন;

- কারো হক নষ্ট না করে উপার্জন;
- প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপার্জন;
- দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা না করে উপার্জন;

- উপরের শর্তগুলো মেনে অর্থ উপার্জন করলে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে।

অর্থ উপার্জনে সতর্কতা

লোভ থাকা যাবে না

রসূল ﷺ বলেন, মানুষ বৃদ্ধ হলেও তার দু'টি জিনিস বৃদ্ধ হয় না – ধন-সম্পত্তি অর্জনের লালসা ও দীর্ঘ জীবনের আশা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেন, বনি আদমের কাছে যদি ২ উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকা কামনা করবে, তার পেট মাটি ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে ভরবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অহংকার থাকা যাবে না

"অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলো না; কারণ আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না।" (সূরা লুকমান ঃ ১৮)

কৃপণতা করা যাবে না

"যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে, তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।" (সূরা আন নিসা, ৪ ঃ ৩৭)

"মানুষ খুবই অস্থিরচিত্ত, সে বিপদে পড়লে হাহুতাশ করে এবং সম্পদশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে; তবে তারা নয় যারা ইবাদত করে।" (সূরা আল মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৯-২২)

দ্বীনি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা যাবে না

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা, এবং আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।" (সূরা আল আনফাল, ৮ ঃ ২৮)

"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে, এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।" (সূরা তাকাসুর, ১০২ ঃ ১-২)

রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য অবসর অন্বেষণ কর, তা হলেই আমি তোমার অন্তরকে শান্তি দ্বারা পূর্ণ করে দেব। যদি তা না কর, তোমার হাত অজস্র কাজে ভারাক্রান্ত রাখবো এবং দারিদ্রতা দূর করব না। (ইবনে মাজাহ)

সম্পদ জমিয়ে রাখা নিষেধ

ধনীর হিসাব দীর্ঘ হবে, আমানত বেশী হওয়াতে খিয়ানতের সম্ভাবনা বেশী। আব্দুল্লাহ ইবনুস শিখখির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূল ﷺ -কে সূরা তাকাসুর পড়তে দেখলাম। তারপর তিনি বললেন, মানুষ বলে, আমার ধন, আমার সম্পদ। অথচ হে মানুষ, ততটুকুই তোমার সম্পদ, যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করেছ, পরিধান করে পুরানো করেছো ও দান খয়রাত করে সঞ্চয় করেছ। (সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেন, প্রত্যেক জাতির জন্য একটা ফিতনা আছে। আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ। (তিরমিযী)

রসূল ﷺ বলেন, ৩টি বস্তু ছাড়া মানুষের আর কিছুর অধিকার নেই ঃ তার বসবাসের জন্য একটি ঘর, শরীর ঢাকার জন্য কিছু বস্ত্র এবং কিছু রুটি ও পানি। (তিরমিযী)

সদাকার প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"(তোমাদের মধ্যে) কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, আল্লাহ তার জন্য (তা) বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন।" (সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৪৫)

"যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বের হলো, আর প্রতিটি শিষে আছে একশ শস্য দানা; আল্লাহ যাকে চান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রাচুর্যময়।" (সূরা আল বাকারা, ২ ঃ ২৬১)

সদাকা দানকারীর মর্যাদা

রসূল ﷺ বলেন, দুই ধরনের লোককে ঈর্ষা করা যায়, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন তারপর তাকে তা আল্লাহর পথে খরচ করার তওফিকও দিয়েছেন আর এমন লোক যাকে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী সে ফায়সালা করে ও লোকদের তা শেখায়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

দান করলে আমার কী লাভ?

যাকাত প্রদানে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ঃ শয়তানের প্রতারণা ও প্ররোচনার উপর ভিত্তি করে মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে দানে সম্পদ কমে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন দানের ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

"... তোমরা যে যাকাত আদায় কর - একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার উদ্দেশ্যে তা অবশ্যই বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।" (সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্থিব দুঃখ দূর করে দেবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের যে কোন দুঃখ অবশ্যই দূর করে দেবেন। কোন মানুষের সংকট যে দূর করে দেবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার যাবতীয় সংকট সহজ করে দেবেন। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্যে কাজে লিপ্ত থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাহায্যকারী থাকেন। (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ প্রত্যহ বান্দা যখন সকালে উঠে, তখন দু'জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, "হে আল্লাহ! খরচকারীর ধন আরও বৃদ্ধি করে দাও" এবং দ্বিতীয় জন বলেন, "হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দাও।" (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হতে বেঁচে থাকার সামর্থ রাখে সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও তাই করে। (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ব্যয় কর আর কত ব্যয় করলে তার হিসাব রেখ না। আর তা করলে আল্লাহ তোমাদের গুণে গুণে দেবেন। আর জমা করে রেখ না, তবে আল্লাহও জমা করে রাখবেন। (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিয়ে বললেন ঃ 'উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম' । উপরের হাত হল দানকারী । আর নীচের হাত হলো দান গ্রহণকারী । (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে মালামাল রয়েছে তা ব্যয় করতে থাক, এটা তোমার জন্য উত্তম । আর তুমি তা দান না করে কুক্ষিগত করে রাখলে এটা তোমার জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে । কিন্তু প্রয়োজন পরিমাণ রাখায় কোন দোষ নেই । এজন্য তোমাকে ভর্ৎসনাও করা হবে না । যাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে তাদেরকে দিয়েই দান শুরু কর । উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম । (সহীহ মুসলিম)

অর্থ ব্যয়ের কিছু শর্ত

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভালো এবং যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভালো। আর তিনি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আল বাকারা, ২ ঃ ২৭১)

"তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয়ও করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং এর মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বণ করে।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৭)

"তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই কল্যাণ লাভ করবে না। আর যা কিছুই তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন।" (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯২)

আল্লাহর দৃষ্টিতে সুখী ও সম্পদশালী কে? ধনী না গরীব?

রসূল ﷺ বলেন, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে ধনী করে না বরং অন্তরের আনন্দই মানুষকে প্রকৃত ধনী করে । (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেন, সেই ব্যক্তিই সুখী যে আল্লাহর অনুগত হয়, তাঁর দেয়া রিযিককে যথেষ্ট মনে করে এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকে । (সহীহ মুসলিম)

সন্তুষ্টি আল্লাহ তা'আলার ফায়সালাতে ।

“এই পার্থিব জীবন তো খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।” (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৪)

রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শারীরিক নিরাপত্তার সাথে ও সুস্থ দেহে সকালে উপনীত হলো এবং তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য একদিনের খাবার আছে, তাকে যেন দুনিয়ার সবকিছুই দান করা হলো। (তিরমিযী)

রসূল ﷺ বলেন, সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার কাছে প্রয়োজনমাফিক রিযিক রয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতেই তাকে সন্তুষ্ট রেখেছেন। (সহীহ মুসলিম)

দান-সদাকার বিকৃত রূপ

লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদাকা ঃ *“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন একটি চাতাল, যার উপর মাটির আস্তর পড়ে আছে। এর উপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়লো তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়ে গেল এবং গোটা চাতালটি পরিস্কার হয়ে গেল। এসব লোক দান-সদাকা করে যে পূণ্য অর্জন করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না।” (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)*

সদাকার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে মনের মধ্যে নামের পুলক অনুভব করা, এর প্রচার আশা করা, দাতার নাম বারবার উচ্চারিত হওয়া, বিনিময়ে দাতা কারো কাছে স্পেশাল সম্মান আশা করা ইত্যাদি শয়তানের প্ররোচনা। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব প্রকাশ ও প্রচার হয়ে পড়ে তার জন্য আল্লাহর কাছ হতে বিশেষ ছাড়ের আশা করতে পারি। আল্লাহ তা’আলা যেন আমাদের অনিচ্ছাকৃত প্রচারকে ক্ষমা করেন।

অগত্যা সদাকা ঃ এটি আরেকটি বিকৃত রূপ। দাতা দান করার সময় এমন ভাব দেখায় যে সে বড্ড বিপদে পড়ে গেছে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে প্রার্থীকে অগত্যা কিছু দান করে। তার চেহারার মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী বড় বিষাদের ছায়া আসর করে।

“সলাতের জন্য তারা আসে বটে, কিন্তু মনক্ষুন্ন হয়ে; আর দান করে কিন্তু বিরক্তি সহকারে।” (সূরা তাওবা ঃ ৫৪)

অথচ দাতাদের একটি বিষয় সর্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, একজন গ্রহীতা অর্থ গ্রহণ করে দাতাকে করুণা করেন। উল্টোটি নয়। যদি কোন বঞ্চিত বা প্রার্থীই না থাকতো তা হলে দাতা এতবড় সওয়াবের কাজ হতে বঞ্চিত থেকে যেতেন। বরং আন্তরিকভাবে দাতার ভাবখানা এমন হওয়া উচিত যে গ্রহীতা দয়া করে দান গ্রহণ করে দাতার বিরাট উপকার করেছেন। কারণ দাতা তার অর্থ দিয়ে বঞ্চিতকে সাহায্য করলেন, সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা এর যে প্রতিদান দেবেন তা কোন মানুষের চিন্তা শক্তির বাইরে।

দান করে খোঁটা দেয়া ঃ এটি একটি জঘন্য রোগ। অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা প্রকৃত বিষয়ের রূপ, এর উদ্দেশ্য ও ফলাফল না জানার কারণে দান করে খোঁটা দেয়। কারণ যে সম্পদ দান করা হলো তার মূল মালিকই তো দাতা নয়। তাকে কিছু দিনের জন্য এর দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। এটা কিছু দিন আপনার তত্ত্বাবধানে, কিছুদিন আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। আবার কিছুদিন পর সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ তা'আলা অপর কাউকে হিফাযতের দায়িত্ব দেবেন। তা হলে যে সম্পদের মালিক আপনি আমি নই সেই সম্পদের মূল মালিকের হুকুমে আমি যদি এর হকদারকে বুঝিয়ে দেই আর এ কাজের জন্য সম্মান আশা করি, আর সম্মান করতে ব্যর্থ হলে খোঁটা দেই, তা হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমার উপর নারায হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"যারা আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করে, অতঃপর এ কারণে খোঁটা দেয় না, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য যথার্থ প্রতিদান রয়েছে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬২)

অর্থ ব্যয় কার জন্য?

১) নিজের জন্য ২) পরিবারের জন্য ৩) প্রতিবেশীর জন্য ৪) আত্মীয় স্বজনের জন্য ৫) দেশের জন্য ৬) উম্মাহর জন্য ৭) দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর পথে ব্যয়।

আল্লাহর পথে ব্যয় করার গুরুত্ব

রসূল ﷺ বলেছেন, হে আদম সন্তান, যদি তোমার উদ্ধৃত্ত সম্পদ খরচ কর তা হলে তা তোমার জন্যে কল্যাণকর হবে। আর যদি তা সঞ্চয় করে রাখ তা হলে তা হবে তোমার জন্যে অকল্যাণকর। তবে হ্যাঁ, তোমার জীবন ধারণের ন্যূনতম সম্পদের জন্যে তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। এ খরচের সূচনা কর তোমার পরিবার থেকেই। (সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেছেন, দানকারী আল্লাহ্‌র নিকটতম, জান্নাতের নিকটতম এবং মানুষেরও নিকটতম হয়ে থাকে। আর দূরে থাক জাহান্নাম থেকে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি অবস্থান করে আল্লাহ্‌ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, জাহান্নামের নিকটে। অবশ্য অবশ্যই একজন মুর্খ দাতা একজন কৃপণ ব্যক্তির তুলনায় আল্লাহ্‌র কাছে অধিকতর প্রিয়। (তিরমিযী)

আজকের দিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন এমন একদল আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌র মাধ্যমে বিজয় লাভে সক্ষম হবে যারা শেষ নাবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কিরামের ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে কিরাম মাল ও জানের কুরবানীর যে নযিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন- তার প্রেরণার উৎস ছিল আল্লাহ্‌র কুরআন ও এবং রসূল ﷺ -এর সুন্নাহর সার্থক অনুসরণ। তাই আমরা এটাকে উপলব্ধি করার জন্য এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার কুরআন এবং রসূল ﷺ -এর সুন্নাহর মূল দিক নির্দেশনা উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো।

বাস্তবে কী হচ্ছে? সূরা মুহাম্মাদের আয়াতের সাথে এই যুগের সাথে অনেকটা মিলে যাচ্ছে। ইউরোপ এবং নর্থ আমেরিকাতে যারা নিজেদের জান-মাল দিয়ে দ্বীন ইসলামের কাজ করছেন তাদের বেশীরভাগই নতুন মুসলিম অর্থাৎ অন্য ধর্ম থেকে converted। যেমন-

ড. ইউসুফ স্টেস, তিনি ছিলেন আমেরিকার একজন সফল মিউজিক্যাল ইন্সট্রুম্যান্ট ব্যবসায়ী এবং বিলিওনিয়র। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজকে নিয়েছেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে। তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করে দিয়েছেন দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার অমুসলিম প্রতিনিয়ত তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করছেন। জার্মানিতে তার একটি ইসলামিক কনফারেন্সে একসাথে ১,২৫০ জন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন (আল্লাহু আকবার)।

ড. ইউসুফ ইসলাম, যার আগের নাম ছিল 'ক্যাট স্টিভ্যান'। তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত পপ গায়ক (মাইকেল জ্যাকসনের মত সুপার স্টার)। তিনিও বিলিওনিয়র ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার সমস্ত অর্থ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করে দিয়েছেন। আর তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে দ্বীন ইসলাম প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। বর্তমানে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ইসলামিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তিনি, যে স্কুলে মুসলিম ছেলেমেয়েরা ভর্তি হওয়ার জন্য নাম লিখিয়ে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে থাকে (আল্লাহু আকবার)।

সপ্তম অধ্যায়

সুদ বা রিবার উপর কিছু কথা

সুদ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

"যারা সুদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে; এটা এ কারণে, যেহেতু এরা বলে, ব্যবসা-বাণিজ্য তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার যার কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সুদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌঁছেছে, সে অতঃপর সুদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, আগে (এ আদেশ আসা পর্যন্ত) যে সুদ সে খেয়েছে তা তো তার জন্যে অতিবাহিত হয়েই গেছে, তার ব্যাপার একান্তই আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের উপর; কিন্তু (এরপর) যে ব্যক্তি (আবার সুদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

"আল্লাহ তা'আলা সুদ নিশ্চিহ্ন করেন, (অপর দিকে) দান সদকা (-র পবিত্র কাজ)-কে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন; আল্লাহ তা'আলা (তাঁর নিয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৬)

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সুদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো, আগের (সুদী কারবারের) যেসব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনো।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৮)

"যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের (ঘোষণা থাকবে), আর যদি (এখনো) তোমরা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে, (সুদী কারবার দ্বারা) অন্যের উপর যুলুম করো না, তোমাদের উপরও অতঃপর (সুদের) যুলুম করা হবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৯)

"হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩০)

"এবং তারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ করত এবং তারা অন্যায়ভাবে লোকদের ধনসম্পদ গ্রাস করত এবং আমি তাদের মধ্যস্থ অবিশ্বাসীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" (সূরা নিসা ঃ ১৬১)

"মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাক; আল্লাহর কাছে তা বর্ধিত হয় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।" (সূরা রুম ঃ ৩৯)

"হে নাবী! তাদের বল, আমার আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই নির্লজ্জতার কাজ প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৩)

- সুদের প্রথম আয়াত নাযিল হয় মক্কী যুগে ৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে।
- সুদের দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় মদীনার যুগে হিজরী চতুর্থ সনে।
- সুদের তৃতীয় আয়াত নাযিল হয় মদীনার যুগে উহুদ যুদ্ধের পরে।
- সুদের চতুর্থ বা শেষ আয়াত নাযিল হয় মক্কা বিজয়ের পরে।

সুদ সম্পর্কে রসূল ﷺ -এর নির্দেশ

১. ইবনে মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহর নাবী ﷺ সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লিখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

২. যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশ বার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। (আহমদ, বায়হাকী)

৩. সুদের তিয়াত্তরটি দরজা। তন্মধ্যে সহজতর দরজার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করল। আর সর্বোচ্চ সুদের কাজটি হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির সম্মান ও ধন মাল হরণ। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

৪. জাহিলিয়াতের সুদী কারবার রহিত করা হল। আর সর্বপ্রথম আমি রহিত করছি আমাদের নিজেদের অর্থাৎ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদী কারবার, তা সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গেল। (বিদায় হজ্জের ভাষণ)

৫. আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মিরাজের রাতে আমি এমন কতগুলো লোকের পাশ দিয়ে এসেছিলাম, যাদের পেট ছিল একটি বিশাল ঘরের মতো, আর সে পেটগুলো ছিল সাপে ভরপুর, যা বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো সুদখোর। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ সুদের অর্থ জমা করার পরিণাম হয় অস্বচ্ছলতা। অন্য একটি বর্ণনার ভাষা এরূপ ঃ সুদের অর্থ যতোই অধিক হোক না কেন, অবশেষে তার পরিণতি হয় অস্বচ্ছলতা। (ইবনে মাজাহ ও হাকিম)।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ৪০ টিরও অধিক হাদীস দ্বারা সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং এখানে অবশ্যই বুঝতে হবে এটি কতটা মানবতা বিরোধী একটি জঘন্যতম কাজ।

সুদ একটি সুস্পষ্ট কবীরাহ গুনাহ

আমরা জানি নিঃসন্দেহে সুদ একটি কবীরাহ গুনাহ। আমরা অনেকেই সুদী অর্থনীতির সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তা'আলার আইন অমান্য করে নিজেদেরকে কবীরাহ গুনাহর সাথে জড়িয়ে ফেলছি এবং আল্লাহ তা'আলার সীমালংঘন এবং নাফরমানী করে ফেলছি। আমরা হয়তো কেউ কেউ বলে থাকি

যে এই আধুনিক যুগে সুদ থেকে দুরে থাকা সম্ভব নয়! কিন্তু চৌদ্দশ বছর আগে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ﷺ বর্তমান আধুনিক যুগ এবং ভবিষ্যৎ যুগের কথাও চিন্তা করে সুদকে হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানতেন যে এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ অমুসলিম দেশে বসবাস করবে, এমনকি মুসলিম দেশেও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থাকবে না, ইসলামিক ফাইন্যান্স থাকবে না। তাই আল্লাহ তা'আলাও এই যুগের কথা মাথায় রেখেই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির একটি রাস্তা বের করে রাখতেন এবং রসূল ﷺ -কে দিয়েও তা বাস্তবতার উদাহরণ সৃষ্টি করে রাখতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, যতটুকু আমাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সুদ সুদই, এটা সবসময়ের জন্য হারাম এবং কবীরাহ গুনাহ। কোনভাবেই এটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে হালাল করার কোন উপায় নেই। আর আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সাথে যুক্তি তর্কেরও কিছু নেই, তিনি যা করেছেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেছেন।

সুদ এমন একটি কবীরাহ গুনাহ যা সামাজিক ব্যাধি এবং গোটা সমাজের ক্ষতি করে। যিনাও একটি কবীরাহ গুনাহ যা মানুষ গোপনে একাকী করে থাকে। কিন্তু সুদ একটি প্রকাশ্য কবীরাহ গুনাহ যা মানুষ সকলের সামনে করে থাকে। সেজন্য রসূল ﷺ বলেছেন সুদের সবচেয়ে নিম্নতম অন্যায় হচ্ছে নিজ মার সাথে যিনা করা।

শয়তানের প্ররোচনা

আমরা জানি শয়তান নানাভাবে আমাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তবে সে খুব সহজেই দুর্বল ঈমানের অধিকারীদেরকে প্ররোচনা দিতে পারে কিন্তু শক্ত ঈমানদারদের খুব সহজে ধোকা দিতে পারে না, তখন সে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। যেমন ঃ আমি একজন খুবই পরহেজগার লোক অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে নিয়োজিত করেছি। কিন্তু দেখা গেল শয়তান আমার মনের মধ্যে এমন চিন্তা ঢুকিয়ে দিল যে - "তুমি তো ইসলামের জন্য অনেক কিছু করেছো, সারাদিন এর জন্যই কাজ করছো, নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছো, এখন তুমি দুই একটা গুনাহ করলে তেমন কিছু আসে যাবে না, কারণ তোমার ত্যাগের কাছে এই দুই একটা গুনাহ তেমন কিছুই না"। তখন আমরা শয়তানের এই ধরণের ধোকায় পরে মনে করতে পারি যে ঠিকই তো আমি তো সব কিছু করছি দ্বীনের জন্য, আমি সুদ লেনদেন করছি, সুদে বাড়ি কিনছি, গাড়ি

কিনছি তাও দ্বীনের জন্য, এতে দ্বীন উপকৃত হবে, এতে তো দোষের কিছু দেখছি না। এভাবে আস্তে আস্তে আমরা কবীরাহ গুনাহর সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি।

মহান আল্লাহ তা'আলা যে সকল নির্দেশ সরাসরি কুরআনে দিয়ে দিয়েছেন তা কোন ভাবেই অমান্য করা যাবে না। আর আমাকে যদি একান্তই নিরুপায় হয়ে কুরআনের কোন আদেশ অমান্য করতে হয় তাহলে যেন নিজের একার বুদ্ধিতে না করি, সেই বিষয়ে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে বিভিন্ন অথেন্টিক স্কলারদের সাথে পরামর্শ করি কারণ সমস্ত ফরয হুকুমের ব্যাপারে আল-কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে সমাধান রয়েছে। যেমন কোন কোন অবস্থায় সলাত ছেড়ে দেয়া যাবে, কোন কোন অবস্থায় সিয়াম ছেড়ে দেয়া যাবে ইত্যাদি সবই পরিষ্কারভাবে রয়েছে। আমরা একজন সাহাবীর ঘটনা জানি যে, তিনি রসূল ﷺ -এর কাছে এসে বলেছিলেন যে, তিনি যিনা করতে চান। রসূল ﷺ তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর আর তিনি তা করেননি বরং এই ধরণের ইচ্ছার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং তাওবা করেছিলেন।

ইসলামিক ব্যাংক এবং নন-ইসলামিক ব্যাংক

এখন অনেক অমুসলিম দেশেও কিছু কিছু ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর মুসলিম দেশগুলোতে তো রয়েছেই। তারপরও আমরা মুসলিমরা অনেকেই নন-ইসলামিক ব্যাংকের সাথে লেনদেন করি, টাকা ব্যবসায় সুদে খাটাই, সুদে লোন নেই, সুদে বাড়ি কিনি, সুদে গাড়ি কিনি। যেমন একজন ইসলামিক ব্যাংক থেকে লোন না নিয়ে সুদী ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি কিনেছেন। তার যুক্তি হচ্ছে সুদী ব্যাংকে সুদের রেট কম আর ইসলামিক ব্যাংকে মাসিক কিস্তির মুদারাবা (লভ্যাংশ) একটু বেশী দিতে হয়। এর উত্তরে একজন স্কলার উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন, একটি দোকানে দুই রকমের মাংস বিক্রি করে। একটি শুকরের মাংস যার দাম প্রতি পাউন্ড ৪ ডলার আর অন্যটি গুরুর মাংস যার দাম প্রতি পাউন্ড ৫ ডলার। দু'টোই কিন্তু মাংস, একটির দাম একটু বেশী অন্যটির দাম একটু কম। এখন আমি কোনটি কিনবো? ঠিক তেমনি দু'টোই ব্যাংক একটি ইসলামিক অন্যটি নন-ইসলামিক, একটি সুদ অন্যটি মুনাফা। পার্থক্য এতোটুকুই যে একজন আল্লাহ তা'আলার আইন মান্য করছে অন্যজন করছে না। আল্লাহ তা'আলার আইন মানার জন্য যদি কিছু টাকা প্রতি মাসে বেশী দিতে হয় তাহলে তো লাভ ছাড়া কোন ক্ষতি নেই। আর ইসলামিক ব্যাংকের

মর্গেজের রেট বেশী হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের ক্লাইয়েন্ট কম যার জন্য ব্যবসাও কম ।

আবার আমরা কেউ কেউ ইবলিস শয়তানের প্ররোচনায় পরে বলে থাকি যে, "সুদ এবং মুনাফা একই । অর্থাৎ ইসলামিক ব্যাঙ্কিং এবং সুদী ব্যাঙ্কিং একইভাবে ব্যবসা করে থাকে । একজন সরাসরি বলে সুদ আর একজন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলে লাভ বা মুনাফা, আসলে সব রসুনের গোঁড়াই এক । আর এই যুগে সুদ খেলে কোন অসুবিধা নেই কারণ সুদ আধুনিক যুগের ফাইন্যান্‌শ্যল অবকাঠামো ।"

আসলে এই ধরণের উক্তি এবং ধারণা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সাথে পান্ডিত্য দেখানো । বিষয়টা এমন যে আল্লাহ ও তার রসূল ﷺ আধুনিক ফাইন্যান্স বুঝেন না (নাউযুবিল্লাহ) । আমার যদি ইসলামিক ব্যাংকিং অথবা Interest Free Economy নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে যার তার সাথে আলাপ না করে বা ইসলামিক ব্যাংকের সাধারণ অফিসারদের সাথে আলাপ না করে ব্যাংকের কোন উর্ধতন কর্মকর্তা বা কোন ইসলামিক ইকোনোমিষ্ট এর সাথে আলাপ করা উচিত । তাহলে ইনশাআল্লাহ সন্তুষ্টিজনক উত্তর পাওয়া যাবে । আমরা জানি যে, এখন আমেরিকা/ইউরোপের অনেক ইউনিভার্সিটিতেই Islami Banking ও Islamic Economics সাবজেক্ট তাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করছে ।

সেভিংস একাউন্টস

আমরা জানি ব্যাংকগুলো সাধারণতঃ সেভিংস্ একাউন্টস হোল্ডারদের deposit basis interest দিয়ে থাকে । তাই আমাদের যাদের সেভিংস্ একাউন্টস, আমি না চাইলেও আমার একাউন্টসে সুদ জমা হতে থাকে । তাই সেভিংস একাউন্ট ওপেন না করে কারেন্ট বা চলতি একাউন্ট ওপেন করা উচিত । যদি কোন কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার নিকট সুদ এসে যায় তাহলে আমি যেটা করতে পারি তা হলো, মাস শেষে অথবা তিন মাস পর পর অথবা ছয় মাসে একবার অথবা বছর শেষে একাউন্টস স্টেটমেন্ট দেখে সুদটাকে আলাদা করে ফেলতে পারি এবং সাথে আরো কিছু এমাউন্ট যোগ করে (কারণ সুদটা চক্রবৃদ্ধি হারে হয়) দেশে কোন গরিব মানুষকে দিয়ে দিতে পারি অথবা যে কোন জনকল্যাণমূলক কাজেও লাগাতে পারি কিন্তু অবশ্যই আমার নিয়্যত থাকতে হবে যে, "আমি এটা করছি কোন সওয়াবের উদ্দেশ্যে না, অথাৎ আল্লাহর কাছ

থেকে আমি এর জন্য কোন রিউয়ার্ড আশা করতে পারবো না।" কারণ এ টাকাটা আমার না, এটা হারাম (সুদ) এবং আমার কাছে এসেছে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

ক্রেডিট কার্ড

আমরা যারা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করি এবং minimum bill দিয়ে থাকি এখানেও আমি সুদের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি। তবে due date-এর মধ্যে পুরো বিল পরিশোধ করে দিলে আর সুদ আদান-প্রদান হবে না। তবে তাকওয়ার প্রশ্নে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার না করাই উত্তম। কারণ ক্রেডিট কার্ড নেয়ার সময় সুদের হারের সাথে চুক্তি বদ্ধ হতে হয় যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

ফিক্সড ডিপোজিট

ফিক্সড ডিপোজিট অথবা প্রভিডেন্ট ফান্ড যাদের জমা হচ্ছে এই সেভিংস সরকার বা সুদী ব্যাংক সাধারণতঃ কোন ইন্‌ভেস্টমেন্ট কোম্পানীগুলেতে সুদে খাটিয়ে থাকে, এছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন এই সেভিংস যদি এমন কোন কোম্পানীতে ব্যবহার হয়ে থাকে যারা হারাম প্রোডাক্ট উৎপাদন করে থাকে বা হারাম প্রোডাক্টের সাথে জড়িত তাহলেও এ ক্ষেত্রে আমার ইন্‌ভেস্টমেন্টও হারামের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে।

স্টক এক্‌চেঞ্জ এবং শেয়ার মার্কেট

যারা স্টক এক্‌চেঞ্জ বা শেয়ার ব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরকে অবশ্যই বেছে বেছে শুধুমাত্র ঐ কোম্পানীগুলোর শেয়ার কিনতে হবে যারা হালাল পণ্য উৎপাদন করে বা কোন প্রকার হারাম লেনদেন এর সাথে জড়িত নয়। যেমন ঃ উদাহরণস্বরূপ আমরা জানি যে সুদী ব্যাংক, সুদী ইন্সুরেন্স কোম্পানী, সুদী ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, মদ বা বিয়ার উৎপাদনকারী কোম্পানী, লটারী বা ক্যাসীনো কোম্পানী, খারাপ মুভি বা মিউজিক প্রোডাকশন কোম্পানী, হারাম খাদ্য উৎপাদনকারী ইত্যাদি কোম্পানীর শেয়ার হালাল নয়। এমনকি অনেক আইটি (IT) কোম্পানীর শেয়ারও হালাল নয় কারণ তারা পর্নগ্রাফির ব্যবসা করে থাকে যা তাদের একটি খুবই লাভজনক ব্যবসা।

সুদ গ্রহণের কিছু কারণ

বাস্তবে দেখা গেছে যে অনেক দ্বীনি ভাই পরিবারের চাপে পরে সুদের সাথে জড়িয়ে যান, নিজ স্ত্রীকে খুশী করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার আইনকে অমান্য করেন। তখন ঐ মু'মিন ভাইকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে ইবলিস শয়তানের এটা এক ধরণের প্ররোচনা, সে সোজা পথে পারেনি বলে অন্য পথ ধরেছে। রসূল ﷺ-এর হাদীস থেকে আমরা জানি যে জন্মদাত্রী মাতার সন্তষ্টির জন্য সন্তানকে তার সব কথা শুনতে হবে কিন্তু যদি কোন মা তার সন্তানকে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করতে হুকুম করেন তাহলে তা অবশ্যই মানা যাবে না। এখন যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে আল্লাহর কোন ফরয হুকুম অমান্য করতে প্রেসার দেয় বা কোন কবীরাহ গুনাহ করতে বাধ্য করে তাহলে সেই স্ত্রীকে নিয়ে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, স্কলারদের সাথে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে হবে, কুরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক সমাধান বের করে আনতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৯)

সুদ গ্রহণের অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি ক্ষতিকারক কারণ হচ্ছে সুদে গাড়ি-বাড়ি কিনে প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে একপ্রকার indirect প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া এবং যা হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে 'রিয়া' এবং মহিলারাই সাধারণতঃ এই বিষয়ে অধিক দুর্বল।

মাহমুদ ইবনে লুবাইদ বর্ণনা করেছেন "আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন ঃ "আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল আশ-শিরক আল-আসগর (ছোট শিরক)।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন "হে আল্লাহর রসূল, ছোট শিরক কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "আর-রিয়া"– লোক দেখানো বা জাহির করা, কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, "দুনিয়ার জগতে যাদের কাছে তুমি নিজেকে জাহির করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং দেখ তাদের নিকট হতে কোন পুরষ্কার পাও কি না।" (আহমদ) তাই বিভিন্ন ধরনের ভাল কাজের মধ্যে অন্যকে দেখানোর এবং প্রশংসিত হবার জন্য যে ধরনের কাজ অনুশীলন করা হয়ে থাকে এই কাজগুলো হলো 'রিয়া'।

সুদের ক্ষতিকারক দিক

- সুদ মানুষের সচ্চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক।
- সুদ মানুষকে কর্ম বিমুখ করে।
- সুদ মানুষের মধ্যে নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়।
- সুদ মানুষকে পরস্পরের প্রতি উদার হবার পরিবর্তে কঠোর এবং প্রয়োজনে অত্যাচারী হতে শিক্ষা দেয়।
- সুদ মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে হ্রাস করে।
- সুদ মানুষকে দুঃচিন্তার মধ্যে ফেলে রাখে।
- সুদ মানুষের মধ্যে অর্থ লালসা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়।
- সুদ ভাইয়ে-ভাইয়ে, আত্মীয়ে-আত্মীয়ে, বন্ধু-বন্ধুতে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়।
- সুদ মানুষকে অভাব থেকে বের হতে দেয় না।
- সুদের অভিশাপে সংসারে বালা-মুছিবত লেগেই থাকে।

আরো মারাত্মক ক্ষতিকারক দিক

আমরা জানি ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল ইনকাম এবং হালাল খাওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয। আমি যদি সুদভিত্তিক জীবনযাপন করি তাহলে আমার উপার্জিত অর্থের সাথে হারাম সুদ মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। আর সেই অর্থ দিয়ে আমি আমার সন্তানদের খাওয়াচ্ছি, পড়াচ্ছি, মানুষ করছি। হারাম দিয়ে তাদের শরীরের প্রতিটি কোষ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেড়ে উঠছে, এবার গভীরভাবে চিন্তা করি তারা কি হারাম খেয়ে বড় হচ্ছে না হালাল খেয়ে!

সবশেষে পরামর্শ

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন কল্যাণকর পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, কর্ম, আচার-আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ তথা সমগ্র জীবন ধারার সাথে সমন্বিত ও সম্পৃক্ত রেখে আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ-ব্যবস্থা উপহার প্রদান ইসলামী জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

মানবজীবনে অর্থ খুবই প্রয়োজন। অর্থ ছাড়া জীবনধারণ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তাই বলে ইসলাম মানুষকে অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ দেয় না। উপার্জনের

পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ-অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে সম্পদ উপার্জন সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রবণতা ও কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম। এর মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধ সবচেয়ে বেশী কঠোর। তারপরও যারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তষ্ট হয়। ফলে তারা কোন দিক দিয়েই কোন বরকত পান না এবং নানা সমস্যায় জর্জড়িত থাকেন। সূরা আন'আম এর ১০৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ তা মানলে তার দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ না মানলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আমি তোমাদের সংরক্ষক নই"।

১. আমি যদি কোনভাবে সুদের সাথে জড়িত হয়ে থাকি, মনে করতে হবে সেটা আমার ব্যক্তিগত ঈমানী দুর্বলতা।

২. নিজে এই কাজ করি বলে সেটা অন্য সবার জন্য যেন হালাল বলে দাবী না করি এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা না করার চেষ্টা করি।

৩. সর্বপ্রথমে মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আমি অন্যায় করেছি, কবীরাহ গুনাহ করেছি।

৪. আল্লাহর কথা অনুযায়ী সুদ ইসলামে শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ এবং সব যুগের জন্য একটি কবীরাহ গুনাহ তা স্বীকার করতে হবে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে ।

৫. আমি যে সকল বিষয়ে সুদের সাথে জড়িত আছি তা ছেড়ে দিতে হবে এবং নুতন করে কোন সুদের সাথে জড়িত হওয়া যাবে না।

৬. অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে, তাওবা করতে হবে। প্রয়োজনে কাফ্ফারা দিতে হবে। এবং ভাল অংকের টাকা সদাকা করা উচিত।

৭. আমি যে দেশে থাকি সেখানে যদি ইসলামিক ব্যাংকিং না থাকে তাহলে সেখানে ইসলামিক ব্যাংকিং চালু করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা।

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামের সাথে আমাদের সম্পর্ক কতটুকু?

আমাদের ইসলামের জ্ঞান কতটুকু

আমরা যারা general education-এ educated যেমন ঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, একাউনটেন্ট, পাইলট, লইয়ার, সাংবাদিক, আর্মি অফিসার, এমপি, মন্ত্রী ইত্যাদি প্রোফেশনে আছি তাদের ইসলামের উপর একাডেমিক জ্ঞান আসলে কতটুকু? বিষয়টি একটু গভীরভাবে ভেবে দেখা যাক। স্কুলের প্রাইমারী ক্লাশ থেকে শুরু করে এসএসসি পর্যন্ত আমাদের "ইসলাম ধর্ম" নামে একটি সাবজেক্ট ছিল। ঐ বইতে কী পড়েছিলাম তা হয়তো অনেকেরই পরিষ্কার মনে নেই, তাছাড়া ঐ "ইসলাম ধর্ম" নামের বইটির মধ্যে আল-কুরআনের বাস্তব এপ্লিকেশন সম্পর্কে কতটুকু ছিল তাও ভেবে দেখার বিষয়। এবার আসি নবম ও দশম শ্রেণীতে আমরা এই বিষয়টি পড়েছি খুবই গুরুত্বসহকারে যার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল এস.এস.সি.তে লেটার মার্কস পাওয়া, ইসলামকে ভালভাবে জানা নয়। কারণ এই একটি বিষয়েই খুব সহজে লেটার মার্কস পাওয়া যায়।

যাহোক এস.এস.সি. পাশ করার পর কলেজ, তারপর ইউনিভার্সিটি, তারপর প্রফেশনাল লাইফ তারপর বিয়ে-শাদী ঘর-সংসার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এস.এস.সির পর থেকে শুরু করে বাকী জীবনের অংশটুকুতে ইসলামিক এডুকেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। যে কুরআন guideline for whole mankind বাকী জীবনে সেই কুরআনিক শিক্ষার কোন ছিটাফোটাও নেই। তাহলে আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করছি কীভাবে? তাহলে কি আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান ছাড়াই জীবন পরিচালনা করে যাচ্ছি? কিন্তু রসূল ﷺ

বলেছেন ঃ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

আবার যারা ইসলামিক স্টাডিস বা ইসলামিক হিস্ট্রিতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি এবং পাশ করছি তাদের বেশীরভাগই এই বিষয় বেছে নিয়েছি কারণ ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় অন্য কোন ভাল বিষয়ে চান্স পাইনি বলে। তার মানে এই বিষয়ে পড়ছি ইসলামকে জানার জন্যে নয় একরকম মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং শুধু মাত্র ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি অর্জনের জন্য। আমাদের পরিচিত একজন শিক্ষীকার ঘটনা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা যাক। তিনি ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রের একটি কলেজের ইসলামিক স্টাডিস এর প্রফেসর। আমরা তার বাসায় প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। তাকে দেখতাম তিনি আমাদের সাথে গল্প করছেন আর ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা কাটছেন এবং নম্বর দিচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা না পড়েই একটা করে পাতা উল্টাচ্ছেন আর খাতায় দাগ দিচ্ছেন। এভাবে তিনি একের পর এক খাতা দেখে যাচ্ছেন আর আমাদের সাথে গল্প করছেন। আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তিনি তো লেখা না পড়েই নম্বর দিচ্ছেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ইসলামিক স্টাডিস বা ইসলামিক হিস্ট্রির খাতা এভাবেই দেখতে হয়, কোন পড়ার প্রয়োজন হয় না আর এই বিষয়ের খাতা সব examiner-রাই এভাবে দেখে থাকেন, এটাই নিয়ম।

বাস্তবতা ঃ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের মূল শিক্ষা জীবনে ইসলামের উপর একাডেমিক কোন শিক্ষা পাচ্ছি না। এদিক সেদিক থেকে বা কোন হুজুর থেকে কিছু সূরা কিরাত পড়েছি, দেখাদেখি ওযূ-সলাত শিখেছি, অনেকে হয়তো ছোট বেলায় কায়দা পড়েছি, তারপর কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি। এই হলো আমাদের ইসলামের উপর সত্যিকার জ্ঞান। আরো যারা একটু আগ্রহী তারা ইন্টারনেট থেকে ক্লিক দিয়ে মাঝে মধ্যে দু একটা ইসলামিক ভিডিও দেখি বা এক দুই পাতা আর্টিক্যাল পড়ি বা কোন ইসলামিক সেমিনার বা ওয়াজ মাহফিলে যাই। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে একটা বিষয়কে ভালভাবে জানার জন্য ধারাবাহিকভাবে কোন সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশোনা নেই। কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে একটা বিষয়কে ভালভাবে জানার জন্য এবং আরো উন্নতির জন্য নানারকম সর্টকোর্স বা লংকোর্স করছি। যেমন ঃ যিনি আইটি প্রফেশনাল তিনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে এই বিষয়ে মাস্টার্স-গ্রাজুয়েশন তো করেছেনই

তারপরও আরো ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য আপগ্রেড কোর্স করেন, ডিপ্লোমা করেন বা পোষ্ট-গ্রাজুয়েশন করে থাকেন।

কিন্তু যে ইসলাম আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যে কুরআন আমাদের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন সেটা জানার জন্য কোন উদ্দ্যোগ কি আমরা নিয়েছি? তাহলে কি আমরা কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক নলেজ ছাড়াই জীবন চালিয়ে যাচ্ছি? প্রফেশনাল লাইফে যদি একটা বিষয়কে জানার জন্য মাস্টার্স, গ্রাজুয়েশন, সর্টকোর্স, সার্টিফিকেশন কোর্স ইত্যাদি করতে হয় তাহলে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান জানার জন্য মাঝে মধ্যে দুই একটা হাদীস বা দুই একটা ইসলামের বই পড়লেই কি যথেষ্ট? বিষয়টা কি এতোই সহজ? ইসলামকে জানার জন্য মিনিমাম তো একটা সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশোনা করা প্রয়োজন। তা না হলে কীভাবে নিজ পরিবারকে গাইড করবো? কীভাবে সন্তানদের প্রশ্নের উত্তর দেবো?

ইসলামকে জানার জন্য যে গতানুগতিক মাদ্রাসার ডিগ্রি অর্জন করতে হবে তাও বলা হচ্ছে না। কারণ আমাদের দেশের মাদ্রাসার সিলেবাসের মধ্যেও একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে যা পারিবারিক জীবন পরিচালনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। কারণ একজন মাদ্রাসার গ্রাজুয়েট একটি ফাইন্যানসিয়াল ইনিষ্টিটিউট চালাতে পারবেন না, তিনি একটি মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে পারবেন না বা তিনি প্লেন চালাতে পারবেন না বা তিনি ডাক্তারী করতে পারবেন না বা তিনি আর্কিটেক্চারাল ডিজাইন করতে পারবেন না অর্থাৎ মাদ্রাসা গ্রাজুয়েটরা দেশ পরিচালনার জন্য এডমিনিস্ট্রেশনে আসতে পারবেন না। আবার যারা এডমিনিষ্ট্রেশনে আছেন তারা নিজ পিতা বা মাতা মারা গেলে নিজে তাদের জানাযার সলাত পড়াতে পারবেন না এমনকি কবরে লাশ নামানোর সময় কী বলতে হবে তাও জানবেন না। তাই এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে। আমাদের প্রয়োজন এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্নয় সাধন। যেমন ঃ একজন থানার ওসি সলাতের ওয়াক্ত হলে থানার সকলকে নিয়ে ইমামতি করে জামাতের সাথে সলাত আদায় করবেন। বা একজন এমপি তার এলাকায় জুম্মার সলাতের খুতবা দিবেন এবং সলাত পড়াবেন।

এই আর্টিক্যাল পড়ে আমরা যেন কেউ ভুল না বুঝি বা মনে কোন কষ্ট না নেই। এখানে শুধু সতর্ক করা হয়েছে এবং গভীরভাবে চিন্তার কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। এই বইয়ের শেষের দিকে একটি মিনিমাম সিলেবাস দেয়া হয়েছে

যা আমরা ব্যক্তিগতভাবে অধ্যায়ন করে ইসলামের উপর জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায় অনেক ভাল ভাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, কলেজ, এডুকেশন সেন্টার বা ইন্সিটিটিউট রয়েছে, যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাস্টার্স, গ্রাজুয়েশন, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেশন কোর্স ইত্যাদি দিয়ে থাকে, যে কেউ এই ধরনের কোর্সে অংশগ্রহণ করে ইসলামের উপর বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হতে পারেন। আজকাল বাংলাদেশেও এই ধরণের কিছু ভাল ভাল ইসলামিক ইনিস্টিটিউট হয়েছে। এছাড়া নর্থ আমেরিকাতে অনেক ভাল ভাল অনলাইন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর যেকোন দেশে বসেই ইসলামের উপর ডিগ্রি অর্জন করতে পারি। যেমন- www.islamiconlineuniversity.com

এই কোর্সগুলো আমাদের দেশের গতানুগতিক মাদ্রাসার কোর্সের মতো নয়, এই কোর্সগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক বাস্তব জীবনধর্মী এবং খুবই হাই কোয়ালিটি সম্পন্ন, অর্থাৎ কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যে ইসলামের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে integrated করা হয়েছে। আর যারা ক্লাশ নিয়ে থাকেন অর্থাৎ লেকচারার তারাও খুবই প্রফেশনাল। নিম্নে এই ধরনের কয়েকটি Canadian Institute-এর web address দেয়া হলো। আমরা সময় করে এই websiteগুলো browse করে দেখতে পারি যে Islamic studies আজ কত এডভান্স এবং এদের single weekend course, double weekend course-এও অংশগ্রহণ করে নিজ প্রফেশনাল কাজের পাশাপাশি নিয়মিত দ্বীন ইসলামের উপর জ্ঞান অর্জন করতে পারি।
www.almaghrib.org, www.alkauthar.org,
www.torontoislamiccentre.com

আমাদের বিপর্যয়ের কারণ

আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো বিপর্যয় এসেছে তার মূল কারণ দু'টি। ১) মানুষ নিজেকে সেচ্ছাচারী মনে করেছে অর্থাৎ অবাধ স্বাধীনতা অবলম্বন করেছে এবং ২) নিজেকে দ্বায়িত্বহীন মনে করেছে অর্থাৎ আমি যা ইচ্ছে তাই করবো। এর পরিণামে যা হয়েছে তা হচ্ছে নিজেই নিজের

নফ্‌সকে ইলাহ বা প্রভু বানিয়ে নিয়েছে যার কারণে নিজেদের জীবনে এক সময় বিপর্যয় নেমে এসেছে।

দুনিয়ার অনুরাগ মন থেকে দূর করার উপায়

১) প্রত্যহ একটি নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুকে স্মরণ করা।
২) অতঃপর কবরের অবস্থা স্মরণ করা।
৩) অতঃপর হাশরের অবস্থা স্মরণ করা।
৪) এবং সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা ও মুসিবতের বিষয় চিন্তা করা।
৫) আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে স্মরণ করা।
৬) সব কাজকর্মের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে সে কথা স্মরণ করা।
৭) সমস্ত বিষয়ের হক একটি একটি করে আল্লাহ তা'আলার কাছে আদায় করতে হবে সে কথা চিন্তা করা।
৮) অতঃপর কঠিন আজাবের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা চিন্তা করা।

হাশরের ময়দানে আমার কী অবস্থা?

এবার খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি আমার কী অবস্থা। যদি মনে করি জীবন থেকে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু হতাশ হওয়া যাবে না। যে কোন সময়ই আমি নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে আবার সঠিক পথে ফিরে আসতে পারি। মহান আল্লাহর কাছে তাওবার পথ সবসময়ের জন্য খোলা। কিন্তু তাওবার সঠিক অর্থ ভালভাবে জানতে হবে। তাওবার অর্থ এই নয় যে আমি বারবার ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করবো আর তাওবা করে ফিরে আসবো, আবার সেই ভুল করবো। তাওবার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আমি যে ভুল করেছি ঐ ভুল আর দ্বিতীয়বার ইচ্ছাকৃতভাবে করবো না, পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসা (complete return to Allah's will).

আমরা কি কবরে প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত আছি?

কি বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা সবাই একমত। নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি যদি এই মূহূর্তে মারা যাই, আমাকে কবরে যে প্রশ্নগুলো করা হবে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি আমার জানা আছে? সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মত কাজ কি আমরা করেছি?

কবরে আমরা যখন লাশ রাখি তখন বলি “বিসমিল্লাহি ওয়া ’আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহি” । অর্থাৎ [আমরা এই লাশ] আল্লাহর নামে এবং রসূল ﷺ-এর আদর্শের উপর রাখছি। (আবু দাউদ)। এখন একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে, রসূল ﷺ -এর অনুসারী কে? রসূল ﷺ -এর অনুসারী সেই, যে রসূল ﷺ -এর নির্দেশিত পথে চলে। আমরা যারা নিজেদেরকে রসূল ﷺ -এর অনুসারী বলে দাবি করছি সেই দাবি অনুযায়ী আমাদের কী করণীয়? আমি পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় রসূল ﷺ -এর কথা বলতে পারলাম না, কুরআন পড়লাম কিন্তু কুরআন অনুযায়ী পথ চললাম না, সলাত আদায় করলাম কিন্তু প্রতিবেশীর হক আদায় করলাম না, সিয়াম পালন করলাম কিন্তু মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন করলাম না, হাজ্জ করলাম কিন্তু পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করলাম না। তা হলে কি আমরা রসূল ﷺ -এর অনুসারী হতে পারবো? উত্তরটা খুব সহজ নয়।

তাই সকলের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি ﷺ -কে জানার ও বুঝার চেষ্টা করি। রসূল ﷺ -কে জানার জন্য তাঁর জীবনী ও সহীহ্ হাদীস পড়ি। আল কুরআনকে বুঝার জন্য কুরআনের তাফসীর পড়ি।

আসুন আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই

ব্রিটেনের বিখ্যাত পপ গায়ক “ক্যাট স্টীভেনস” কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা সবাই জানি। তিনি তার জীবনের এক অশান্তিময় মূহূর্তে কুরআনের একটা অনুবাদের কপি হাতের কাছে পেয়ে খুলে পড়া শুরু করেছিলেন। পড়তে-পড়তে এক সময় তিনি এই বইয়ের লেখককে খুঁজতে গিয়ে এমন এক লেখকের সন্ধান পেলেন তিনি হলেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা। যিনি স্রষ্টা, আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। আর সে জন্য তিনি সেই লেখক মহান রব্বুল আ’লামীন এর নিকট মাথা নত করে স্বীকার করে নিয়েছিলেন “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” ﷺ ।

তোতা পাখিকে দিয়ে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” ﷺ বলাতে চাইলে হয়ত বলাতে পারবো, ময়না পাখিকে দিয়েও যদি বলাতে চাই তাও হয়ত বলাতে পারবো। কিন্তু সেই পাখি এই কালেমার অর্থ জানে না, তার উপর এই কালেমার কোন প্রভাব নেই। আমরা যদি তোতা পাখির মতো “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” ﷺ বলে দাবি করি যে, আমরা মুসলিম, তাহলে সে দাবি কি যুক্তিসংগত? ফযর, যোহর, আসর, মাগরিব, ইশার ওয়াক্ত চলে

যাচ্ছে! তাঁর দেয়া হাত, পা, চোখ, নাক, কান, হৃদয়, মস্তিষ্ক ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা যে সুন্দর জীবনযাপন করছি, সে সব নিয়ামতের জন্যে তাঁকে যদি ধন্যবাদ না দেই, তাহলে কি আমরা মুসলিম বলে পরিচয় দিতে পারব? তাকে কি আমাদের ধন্যবাদ দেয়া উচিৎ নয়? আসুন আমরা সকলে মিলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথে চলার চেষ্টা করি, এবং তাঁকে ধন্যবাদ দিই, বলি আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা যে সলাত আদায় করি এটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ আমরা তাঁর দেয়া খাচ্ছি, তাঁর দেয়া পরছি, তাঁর দেয়া অক্সিজেন গ্রহণ করছি। তাঁর দেয়া হাত পা দিয়ে চলছি ও কাজ করছি। চোখ দিয়ে দেখছি, তাঁর দেয়া সবকিছু ব্যবহার করছি। তাঁকে ধন্যবাদ দেব না? আর পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের মধ্য দিয়ে তিনি ধন্যবাদের একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আসুন আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর রহমতের জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ। (সমস্ত প্রশংসা তাঁরই)

ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হই

আমাদের সমাজে একটা কথা খুব প্রচলন আছে যে, যে একবার কালিমা পড়েছে সে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবেই অথবা সমস্ত মুসলিমরাই জান্নাতে যাবে আর অমুসলিমরা জাহান্নামে যাবে। একটা ইসলামিক সেমিনারে একজন অমুসলিমও অডিয়েন্স থেকে ড. জাকির নায়েককে এই প্রশ্নটাই করেছিলেন যে, "সমস্ত মুসলিমরাই নাকি জান্নাতে যাবে আর সমস্ত অমুসলিমরা জাহান্নামে যাবে এটা কি ঠিক?" উত্তরে ড. জাকির নায়েক একটা কুরআন হাতে নিয়ে বলেন, এই বইয়ের কোথাও এই ধরণের কথা লেখা নেই। তবে লেখা আছে যে, যারা এই বইটা অনুসরণ করবে তারাই জান্নাতে যাবে আর যারা অনুসরণ করবে না তারা জাহান্নামে যাবে।

এবার আসুন আমরা যারা জন্ম সূত্রে মুসলিম বা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করছি আমরা কি এই বইটি অনুসরণ করছি? নাকি নিজেদের মনগড়া স্টাইলে জীবন চালাচ্ছি? একবার কালিমা পড়লাম আর মুসলিম হয়ে গেলাম ব্যাপারটা কি এতই সহজ? দেখি সূরা আনকাবুতের ২নম্বর আয়াতে আল্লাহ কি বলেছেন ঃ

"মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে - তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না?" তিনি আরো বলছেন ঃ

“তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে?” (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

তাই কেউ মায়ের পেট থেকে মুসলিম হয়ে আসে না, সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মুসলিম হতে হয়। তাই প্রকৃত মুসলিম হতে হলে পুরোপুরি কুরআনকে মেনে চলতে হবে, সোজা হিসাব, এর কোন বিকল্প পথ নেই। আর এটাই কালেমার প্রকৃত অর্থ। সূরা আলে ইমরান এর ১০২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন ঃ

“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না ।”

ঈমান এমন কোন বিষয় না যে, একবার আনলাম আর চিরজীবন আমার সাথে সাথে থাকবে! আসলে ঈমান সবসময় আমার প্রতি মুহূর্তের কাজের উপর নির্ভর করে উঠা নামা করে। আবার এমনও হতে পারে যে আমার কোন ঈমান বিরোধী কাজের কারণে ঈমান চলেও যেতে পারে। পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হলে আমাদের ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হবে। প্রতিটি স্টেপে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে। তাই প্রতি মুহূর্তে ঈমান টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হয়।

আমাদের বেশীরভাগ মানুষের সমস্যা হচ্ছে আমরা ঈমান বিরোধী কাজ করেও নিজেদের মনে করি আমরা ঠিকই আছি। দুঃখের বিষয় আমরা বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষই দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যে জানি না এইটাই আমরা জানি না। আমরা দ্বীন ইসলামের পূণ্যের কাজ মনে করে খুব বেশী বেশী ইসলাম বিরোধী কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছি। আমরা কুরআন থেকে নিজেদেরকে অনেক দুরে সরিয়ে রেখে নিজেদের মনগড়া ইসলাম পালন করে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যে জীবনে একবার সম্পূর্ণ কুরআনটা বুঝে তাফসীর বা ব্যাখ্যাসহ পড়েছি। আল্লাহ বলছেন এটা আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান অর্থাৎ আমাদের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন।

কোন বিপদে পড়লে কি করবো?

কোন বিপদে পড়লে আমরা বেশীরভাগ সময়েই বিচলিত হয়ে পরি। কী করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। সবসময় মনে রাখতে হবে যে বিপদ দেয়ার

মালিক আল্লাহ তা'আলা আবার সেই বিপদ থেকে রক্ষা করার মালিকও মহান আল্লাহ তা'আলা। বিপদের মুহূর্তে আমরা নিম্মোক্ত উপায়ে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইতে পারি। যেমন ঃ

১. গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করে আল্লাহ তা'আলার কাছে কান্না-কাটি করা যেতে পারে।
২. যা যা চাওয়ার তা দীর্ঘ সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া যেতে পারে।
৩. পাঁচ ওয়াক্ত সলাত জামাতে আদায় করে প্রতি ওয়াক্তে সমস্যার কথা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে বলা যেতে পারে।
৪. সলাতের মধ্যে দুই সিজদার মাঝে, রুকুর পরে এবং শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর আগে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা যেতে পারে।
৫. জুম্মার সলাতে দুই খুতবার মাঝে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।
৬. অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ কুরআন বুঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।
৭. নফল সিয়াম রাখা যেতে পারে এবং সারাদিন সিয়ামরত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।
৮. দান-সদাকার পরিমাণ আরো অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। অন্যের হকগুলো ঠিক মতো পুরণ করতে হবে।
৯. বেশী বেশী ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা অর্থাৎ পরিচিত-অপরিচিত, মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া যেতে পারে।
১০. বেশী বেশী মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং সেখানে অধিক সময় কাটানো।
১১. কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আবার কারো সাথে বিরোধ থাকলে তা মিটিয়ে ফেলা।
১২. নিজের ভুলের জন্য সরাসরি মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে অর্থাৎ তাওবা করতে হবে এবং সেই ভুল দ্বিতীয়বার আর না করা।
১৩. আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ফরয হুকুমগুলো ঠিকমতো নিয়মিত পালন হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল দিতে হবে এবং এই ব্যাপারে সিরিয়াস হতে হবে।
১৪. আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে এই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ ও সময় দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।
১৫. আমাদের প্রকাশিত ১২ নম্বার বইতে (দু'আ ও নফল ইবাদত) বিপদ-আপদ ও দুঃশ্চিন্তার সময়ে আমরা কোন দু'আ পড়ব তা উল্লেখিত আছে। আমরা বিপদ আসার আগেই উক্ত দু'আগুলো নিয়মিত পড়তে পারি।

সচেতনতা ঃ আমাদের অভ্যাসটা যেন এমন না হয় যে আমরা শুধু বিপদে পড়লেই মহান আল্লাহকে ডাকি। যেমন একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আমরা ইনস্যুরেন্স কখন করি? দুর্ঘটনা হওয়ার আগে না পরে? অবশ্যই দুর্ঘটনা হওয়ার পরে নয় এবং ইনস্যুরেন্স কোম্পানীও দুর্ঘটনা হওয়ার পরে ইনস্যুরেন্স দিবে না। ঠিক তেমনি আমাদের জীবনে দুর্ঘটনা বা বিপদ আসার আগে আল্লাহর কাজ করতে হবে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে, এটিই ইসলামের শিক্ষা।

কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেকে নিজে মূল্যায়ণ করি

১. আমি কি আল্লাহ তা'আলা ও রসূল ﷺ -এর নিয়ম অনুযায়ী চলি?
২. দ্বীন ইসলামকে কি একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিয়েছি?
৩. আল কুরআনের কিছু অংশ মানি আর কিছু অংশ কি মানি না?
৪. কারো প্রতি সন্দেহ বা কুধারণা পোষণ কি করি?
৫. অন্যের গুজবে কি কান দেই।
৬. বিভিন্ন লোকের রটনা থেকে কি সাবধান থাকি?
৭. তর্ক-বিতর্ক কি এড়িয়ে চলি?
৮. সময়-অসময়ে কি আবেগাপ্লুত হয়ে যাই?
৯. অতি সহজেই কি হতাশ হয়ে যাই?
১০. ন্যায়পরায়ণতা কি অবলম্বন করি?
১১. স্বজনপ্রীতিকে কি আশ্রয় দেই?
১২. অন্যকে কি ঠকাই?
১৩. দুর্বলের প্রতি কি চাপ সৃষ্টি করি?
১৪. অকারণে কি বেশী কথা বলি?
১৫. মধ্যম পন্থা কি অবলম্বন করি?
১৬. রাগ বা ক্রোধ কি সংবরণ করতে পারি?
১৭. পরশ্রীকাতরতার লক্ষণ কি আছে?
১৮. হিংসা-ঈর্ষা কি মনের মধ্যে আছে?
১৯. সর্বদা কি সত্য কথা বলি?
২০. অপরকে সম্মান করে কি কথা বলি?
২১. নিজের সম্মান রক্ষা করে কি চলি?
২২. কারো গীবত কি করি?
২৩. চোগলখোরী কি করি?

২৪. এখানের কথা সেখানে গিয়ে কি লাগাই?
২৫. পরের কাছ থেকে শোনা খবর যাচাই না করেই কি মন্তব্য করি?
২৬. কেউ কথা বলতে থাকলে কি তা মনোযোগ দিয়ে শুনি?
২৭. প্রত্যেক বিষয় বুঝার পর কি মন্তব্য করি?
২৮. এক পক্ষের কথা শুনেই কি সিদ্ধান্ত নেই বা বিচার-বিবেচনা করি?
২৯. সবসময় হক (সত্য) কথা কি বলি?
৩০. কারো ভয়ে বা লজ্জায় কি হক (সত্য) কথা থেকে বিরত থাকি?
৩১. বেহুদা বিতর্কে কি জড়িয়ে যাই?
৩২. নিজের ভুল কি সবসময় স্বীকার করি?
৩৩. কারো ত্রুটি দেখলে কি সবার সামনে তাকে লজ্জা দেই?
৩৪. কাউকে আঘাত করে কি কথা বলি?
৩৫. কাউকে হেয় প্রতিপন্ন কি করি?
৩৬. কাউকে ব্যঙ্গ করে কি কথা বলি?
৩৭. কাউকে খোঁচা মেরে কি কথা বলি?
৩৮. কাউকে কথা দিলে কি সেই কথা রাখি?
৩৯. কারো আমানত কি খিয়ানত করি?
৪০. ছোটদেরকে বা স্ত্রীকে কি সালাম দেই?
৪১. কেউ সালাম দিলে কি তার উত্তর দেই?
৪২. অপরের মর্যাদা কি দেই?
৪৩. কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান কি করি?
৪৪. কাউকে কি ঘৃণা করি?
৪৫. উপকারীর প্রতি কি কৃতজ্ঞ থাকি?
৪৬. নিজেকে কি সবসময় বড় মনে করি?
৪৭. নিজেকে কি সবসময় জ্ঞানী ভাবি?
৪৮. নিয়মিত কি দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করি?
৪৯. নিজেকে কি সবসময় ছোট ভাবি?
৫০. কারো নিকট হাত পাতা থেকে কি দূরে থাকি?
৫১. দ্বীনি বিষয় ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কি প্রতিযোগিতা করি?
৫২. কারো পিছনে কি গোয়েন্দগীরি করি?
৫৩. সবসময় কি অন্যের ভুল খুঁজে বেড়াই?
৫৪. লোভ কি সামলাতে পারি না?
৫৫. সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কি থাকি?

৫৬. অপবিত্র কি থাকি?
৫৭. কাউকে ভালোবাসলে কি শুধু মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসি?
৫৮. শুধু নিজ স্বার্থের জন্য কি পরোপকার করি?
৫৯. বড়দেরকে কি শ্রদ্ধা করি?
৬০. ছোটদেরকে কি স্নেহ করি?
৬১. ভাল কিছু শেখার ব্যাপারে কি সবসময় জ্ঞানের দরজা খোলা রাখি?
৬২. অলস জীবনযাপন কি করি?
৬৩. কোন আলোচনায় বা প্রোগ্রামে না বুঝেই কি হ্যাঁ হ্যাঁ করি?
৬৪. কেউ কথা বলতে থাকলে তার মধ্য দিয়ে কি বলি বুঝছি বুঝছি?
৬৫. কারো কথার মধ্যে তাকে বন্ধ করে দিয়ে নিজের কথা কি বলা শুরু করি?
৬৬. অসভ্য ভাষায় কি গালাগালি করি?
৬৭. টাকা-পয়সার লেনদেনে কি পরিষ্কার থাকি?
৬৮. নেতার আনুগত্য কি করি?
৬৯. কোন প্রোগ্রামে বসলে কি সাইড টক করি?
৭০. কোন প্রোগ্রামে বসলে Moderator-এর অনুমতি না নিয়েই কি কথা বলি?

আল্লাহর কাছে কি কি চাওয়া উচিত?

১. জানা-অজানা, ইচ্ছাকৃত-অনৈচ্ছাকৃত সকল সগিরা ও কবীরা গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
২. সহজ সরল পথে (সীরাত্বল মুসতাক্বীমে) থাকার সামর্থ্য ও হিদায়াতের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা।
৩. সর্বপ্রকার শির্ক, বিদ'আত ও মুনাফিকি থেকে দূরে থাকার জন্য হিদায়াত।
৪. আল্লাহর ইবাদতে আন্তরিকতার (ইখলাসের) জন্যে সাহায্য।
৫. অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা (প্ররোচনা) থেকে আশ্রয়।
৬. নিয়মিত কুরআন পাঠ করে তার অর্থ বুঝে চলার ক্ষমতা।
৭. লোভ-লালসা, পরনিন্দা-পরচর্চা, ঈর্ষা, রাগ ও সর্বপ্রকার কুফর ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার সামর্থ্য। অল্পে তুষ্ট থাকার ও সবর করার ক্ষমতা।
৮. সুস্বাস্থ্য ও সুখী জীবন।
৯. ঈমানের সংগে জীবনযাপন ও ঈমানের সংগে মৃত্যু।
১০. কবর আযাব থেকে মুক্তি ও আখিরাতে জান্নাতে স্থান লাভ।

নবম অধ্যায়

ইসলামের দাওয়াতী কাজ নিয়ে আসতে পারে পরিবারে শান্তি

Dawah

দাওয়াত

একজন মু'মিনের দায়িত্ব কী?

একজন মু'মিন হিসেবে এবং রসূল ﷺ -এর উম্মত হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অনেক। রসূল ﷺ তার জীবদ্দশায় যে কাজগুলো করে গেছেন বিদায় হাজ্জের ভাষণে তিনি আমাদেরকে সেই দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তাই সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে আমরা খুবই ভাগ্যবান যে নাবী-রসূলদের (আ.) দায়িত্ব আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, আর এর কারণ হচ্ছে আর কোন নাবী-রসূল (আ.) আসবেন না, সেই কাজ আমাদেরকেই করতে হবে। গোটা কুরআন পড়লে আমরা দেখতে পাই যে এই দায়িত্ব এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এই দায়িত্ব পালন করা অবশ্যই প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

- *"এখন তোমরাই দুনিয়ার সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিয়ে থাক, দুস্কৃতি থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০)*

- *"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই হ'ল সফলকাম।"(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪)*

- *“যারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করবে, মূলতঃ তাদের জন্যই রয়েছে সিরাতুল মুসতাকীম বা সহজ পথের দিশা।” (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০১)*
- *“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে সংগ্রাম করে।” (সূরা সফ ঃ ৪)*
- *“যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।” (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯)*

মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা

“ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হল সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান। তারা সলাত কায়েম করবে এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে। তাদের প্রতি সত্বর আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ।” (সূরা তাওবা ঃ ৭১)

আমাদের সকলের কর্তব্য হচ্ছে “আম্‌র বিল মা’রূফ ওয়ান্‌ নাহ্‌য়ী আনিল্‌ মুন্‌কার” অর্থাৎ মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা। অর্থাৎ হক কথা বা সত্য কথা তা যত কঠিনই হোক না কেন তা বলতে হবে এবং কোন অন্যায় দেখলেই বাধা দিতে হবে। অন্যায় দেখলেই মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া (reaction) হতে হবে। অর্থাৎ no compromise. আমার কোন আত্মীয় অন্যায় করছে, আমাকে একবার হলেও তাকে গিয়ে বলতে হবে যে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন।

কোথাও কোন অন্যায় দেখলে সর্বপ্রথমে হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে, হাত দিয়ে বাধা দিতে না পারলে মুখের কথা দিয়ে প্রতিবাদ করে, মুখে বলতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে, আর এই শেষ পদক্ষেপটা হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। (সহীহ মুসলিম)

নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে

লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা [তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে] দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। (জামে আত তিরমিযী)

দাওয়াতী কাজ করা সকল মুসলিমের জন্য সার্বক্ষণিক ফরয

১. *"তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে?" (সূরা বাকারা ঃ ১৪০)*

২. *"আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিম।" (সূরা হা-মীম সিজদা ঃ ৩৩)*

৩. *"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর সাহায্যকারী হও [দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানানোর কাজে]।" (সূরা আস-সফ ঃ ১৪)*

৪. *"তুমি এদের বলে দাও ঃ আমার পথ তো এই, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮)*

৫. *"দ্বীন কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হয়ো না।" (সূরা আশ-শুরা ঃ ১৩)*

৬. *"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, আর সাবধান কর ও তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্বর ঘোষণা কর।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ১-৩)*

৭. *"হে মানুষ তোমাদের সেই রবের দাসত্ব কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২১)*

অধিকাংশ ঈমানদারগণ মনে করেন যে তাদের উপর কেবল সলাত (নামায), সিয়াম (রোযা), হাজ্জ, যাকাত এ কটি জিনিসই ফরয। এর বাইরে তারা আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ সলাত যেমন ফরয, দাওয়াতী কাজ করাও তেমনি ফরয। বরং সর্বাবস্থায় সকল ঈমানদারের জন্য ফরয এক কাজ হলো ইসলামের দাওয়াতী কাজ। রিসালাতের পয়লা নম্বর দায়িত্ব ছিল এ দাওয়াত। আল্লাহর বাণীকে জনতার মাঝে পৌঁছে দেয়াই ছিল সকল নাবী ও রসূলের প্রধান কাজ। নাবীর অবর্তমানে এ কাজ সকল ঈমানদারগণের উপর অবশ্যকরণীয়।

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বিদায় হাজ্জের সময়ও সকল ঈমানদারগণের উপর এ নির্দেশ দিয়ে গেছেন ঃ

নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে উম্মতের নিকট আমার এ বাণী পৌঁছে দেবে। (আহমদ, তিরমিযী)।

"ডাক তোমার প্রভুর দিকে হিকমত ও উত্তম নসিহতের সাহায্যে, আর লোকদের সাথে বিতর্ক কর সর্বোত্তম পন্থায়।" (সূরা আন নাহল, ১৬ ঃ ১২৫)

এখানে আল্লাহ হুকুম করছেন সবাইকে। এটা আল্লাহর আদেশ যে আমরা পথহারা মানুষকে কেবল আল্লাহর দিকে ডাকবো। আর ডাকবো উত্তম ভাষা ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। আরো হুকুম করছেন সর্বোত্তম ভাষায় বিতর্ক করার জন্য। সলাত (নামায) একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরয করা হয়েছে। ফরয সলাতের জন্য ওয়াক্ত জরুরী। যাকাত আদায়ের জন্য সম্পদের মালিক হতে হয়। যাকাতের দেয় অর্থও একটা নির্দিষ্ট হারের আওতায় আবদ্ধ। হাজ্জ ফরয হয় কেবল সামর্থ্যবানদের উপর। তাও আবার সারা জীবনে মাত্র একবার তা সম্পাদন করলেই দায়িত্ব শেষ। ফরয সিয়াম সারা বছরে কেবল একটা নির্দিষ্ট মাসের জন্য।

কিন্তু "ডাকো তোমার প্রভুর দিকে" বলে আল্লাহ ঈমানদারদের উপর এ কাজটি সর্বক্ষণের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। এখানে বলা হয়নি কোন নির্দিষ্ট সময়, কোন নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তি বা অন্য কোন শর্ত। অর্থাৎ এ ডাকার কাজ সকল মুসলিম-মুসলিমাহ ঈমানদারের উপর এক সার্বক্ষণিক ফরয। হিকমত অবলম্বন করে এ দাওয়াত দিতে হবে। প্রয়োজনে উপযুক্ত সময় ও সুযোগ খুঁজে নিতে হবে। অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টিও হিকমতের অংশ।

পরিসংখ্যানের বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী আল্লাহর রসূল ﷺ -এর সাহাবীদের (রা.) সংখ্যা ছিল ১,২০,০০০ (এক লাখ বিশ হাজার) বা এরচেয়ে কিছু বেশী। এ বিপুল সংখ্যক ঈমানদারদের মধ্যে মাত্র বিশ হাজারের কবর পাওয়া যায় আরব ভূমিতে। বাকি লক্ষাধিক সাহাবী যে কারণে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন তা আর কিছুই নয়, কেবল দাওয়াতে দ্বীনের কাজেই তারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। আমরা যেন এখানে ভুল না বুঝি যে সাহাবারা তাবলীগ জামাতের সাথে চিল্লা দিতে গিয়েছিলেন। চিল্লা বলতে ইসলামে কিছু নেই। তারা গিয়েছিলেন অমুসলিম দেশে অমুসলিমদের নিকট

দাওয়াত পৌঁছে দিতে। তৎকালীন সময়ে আরব ছাড়া আর কোথাও ইসলাম ও মুসলিম ছিল না। রসূল ﷺ এসেছিলেন আরবে কিন্তু আজ সারা বিশ্বে আনাচেকানাচে অনেক মুসলিম দেশ। এর ফসল হচ্ছে সাহাবীদের ত্যাগ। মনে রাখতে হবে রসূল ﷺ তাঁর জীবনে যা করে গেছেন তাই আমাদের মিশন।

দাওয়াত কাদেরকে দিব?

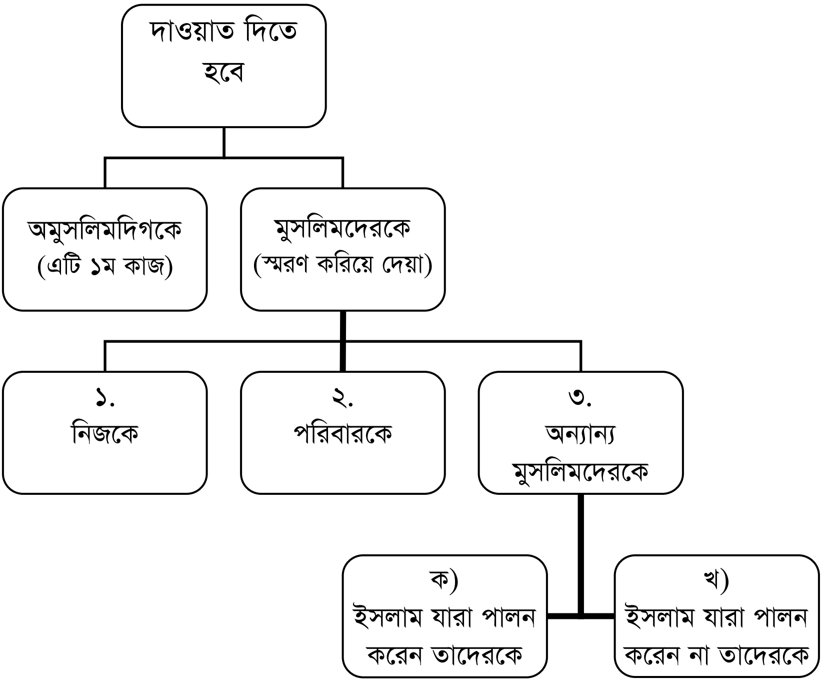

ভুল ধারণা দূর হওয়া প্রয়োজন

আমরা দাওয়াত কাদেরকে দেব? দাওয়াতী কাজে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করবো রসূল ﷺ -এর সুন্নাহ থেকে। আমরা রসূল ﷺ -এর জীবনী পড়লে দেখতে পাই যে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন মূলতঃ অমুসলিমদেরকে। মক্কী জীবনে সর্বপ্রথম কাফিরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, আশেপাশের অমুসলিম দেশে দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, যেমন ইথিওপিয়া, ইজিপ্ট, ইরান, রোম,

বাহরাইন, ইয়ামেন, সিরিয়া এবং ওমান। এই দেশগুলো পূর্বে অমুসলিম দেশ ছিল। আমরা জানি যে রসূল ﷺ -কে আল্লাহ পাঠিয়েছেন-ই মুশরিক অমুসলিমদের মাঝে, তিনি তার মিশন শুরু-ই করেছেন অমুসলিমদের মাঝ থেকে।

এছাড়া সাহাবীরা (রা.) আরবের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে। ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে বিদায় হাজ্জের সময় এক লক্ষ বিশ হাজার এর মতো সাহাবা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। রসূল ﷺ তাদেরকে বলেছিলেন যে "আজ যারা উপস্থিত হতে পারেনি তাদের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছে দিবে।" এই এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবা যদি অমুসলিমদের নিকট না গিয়ে শুধু নিজেদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকতেন তাহলে আজ সারা বিশ্বে ২ বিলিয়ন মুসলিম হতো না। আমরাও বাংলাদেশের মানুষরা মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতাম না। তাই আমাদের প্রথম ফরয কাজ হচ্ছে অমুসলিমদের মাঝে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।

আমরা রসূল ﷺ -এর জীবনী পড়লে দেখতে পাই যে যারা তাঁর দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মুসলিম হয়েছিলেন তাদের ঈমানকে আরো মজবুত করার জন্য রসূল ﷺ নিয়মিত তারবিয়া বা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রেখেছিলেন, তাদের তাকওয়ার লেভেল বাড়ানোর জন্য তাদেরকে নিয়মিত তাগিদ দিতেন। সাহাবা (রা.) একে অপরকে ঈমান রিনিউ (renew) করার তাগিদ দিতেন। তাই কাজটি এখন প্যারালাল অর্থাৎ অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে, তার পাশাপাশি নিজেদের ক্রমোন্নতির জন্যও মুসলিমদেরকেও তাগিদ দিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে non-practicing মুসলিমদের পিছনে আরো বেশী করে কাজ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে non-practicing মুসলিমদের অবস্থা আর অমুসলিমদের অবস্থার মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই।

আমরা যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করি তারা অবশ্যই অমুসলিমদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেব এবং যারা বাংলাদেশে বসবাস করি সেখানেও হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ এবং নাস্তিকদের মাঝে নিয়মিত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এছাড়াও নিজ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রীবর্গ, সামরিক প্রধান, সংসদ সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেম্বার, কাউন্সিলর এবং দেশের বুদ্ধিজীবীগণ যদি অমুসলিম হন বা সেক্যুলার হন বা নন-প্র্যাকটিসিং মুসলিম হন তাদেরকেও

সম্মানের সাথে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। তাদেরকে গিফ্ট হিসেবে আল কুরআনের অনুবাদ পাঠানো যেতে পারে। এছাড়া মিডিয়া, ই-মেল এবং ফেইসবুকের মাধ্যমেও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। কারণ রসূল ﷺ আদেশ করেছেন যে একটি আয়াতও যদি জানো তাহলে তা অপরের নিকট পৌঁছে দাও।

আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে প্রায় একশ কোটি অমুসলিম রয়েছে, বার্মায় প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি অমুসলিম রয়েছে, বাংলাদেশী মুসলিমদের দায়িত্ব তাদের প্রতিবেশীকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়া।

অমুসলিম দেশে থাকতে হলে দাওয়াতী কাজের বিকল্প নেই

১ম হাদীস ঃ রসূল ﷺ -এর সহীহ বুখারীর একটি হাদীসের সারমর্ম হচ্ছে যে, রসূল ﷺ -এর মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই তবে দু'টি কারণে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে হিজরত করা যেতে পারে অর্থাৎ ইমিগ্রেশন নেয়া যেতে পারে।

১) প্রথম কারণ হচ্ছে জিহাদ এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে,

২) যদি কেউ অমুসলিমদের মধ্যে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন অমুসলিম দেশে সিটিজেনশিপ নিয়ে বসবাস করে তাহলেও তার জন্য হিজরত করা জায়িয হবে। অন্যথায় শুধুমাত্র ক্যারিয়ার, বাড়ি, গাড়ি, ডলার, উন্নত জীবনযাপন, সন্তান মানুষ করণ ইত্যাদির জন্য কোন অমুসলিম দেশে ইমিগ্রেশন নিয়ে বা সিটিজেনশিপ নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি নেই।

উপরের দু'টি শর্তের মধ্যে প্রথমটি আমাদের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এবার আসি দ্বিতীয় শর্তটিতে, এটি আমাদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে যদি আমরা অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করি। হয়তো আমরা অমুসলিম দেশে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, বাড়ি, গাড়ি, ডলার, উন্নত জীবনযাপন, সন্তান মানুষ করণ ইত্যাদির জন্য এসেছি এবং এই চাওয়াটা কোন দোষের নয়, কিন্তু আমাদের এই অমুসলিম দেশে থাকাটা আমরা অতি সহজেই জায়িয করে নিতে পারি শুধুমাত্র নিয়্যতের পরিবর্তন করে। অর্থাৎ আমার প্রথম নিয়্যত হবে

অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত তারপর উন্নত জীবনযাপন। এতে আমরা দু'টো দিক থেকেই লাভবান হতে পারি। অর্থাৎ আখিরাত এবং দুনিয়া দুই-ই পেতে পারি। নিয়্যতের বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত। নিয়্যত শুধু মুখে বা অন্তরে করলে হবে না তার পরিবর্তন বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা সব জানেন।

২য় হাদীস ঃ রসূল ﷺ বলেছেন যে, কোন মুসলিমের যদি কুফরের দেশে মৃত্যু হয় (অর্থাৎ অমুসলিম দেশে মৃত্যু হয়) আখিরাতের ময়দানে আমি তার কোন দায়-দায়িত্ব নিতে পারবো না। (আবু দাউদ)। এই হাদীসটি বলার সময় রসূল ﷺ কথাটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তাঁর দুই হাত উপরের দিকে উঠিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন।

২য় হাদীসটি উপরের ১ম হাদীসের সাথে সম্পর্কিত। আমরা জানি আখিরাতে আল্লাহর অনুমতিতে রসূল ﷺ তাঁর যোগ্য উম্মতদের জন্য শাফায়াত করবেন। যদি কেউ উপরের ১ম হাদীস অনুযায়ী শুধুমাত্র দাওয়াতী উদ্দেশ্যে কুফরের দেশে থাকে এবং মৃত্যু হয় তাহলে তারা ২য় হাদীসের ঐ দলভুক্ত নয়। এছাড়া যারা শুধুমাত্র ডলার কামাই ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য থাকবে তাদের দায়-দায়িত্ব রসূল ﷺ নিবেন না।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে অমুসলিম দেশে বসবাস

আমরা জানি যে মুসলিমদেরকে জামাতবদ্ধভাবে থাকতে বলা হয়েছে। জামাতবদ্ধভাবে বসবাস করা এবং জীবনযাপন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। যেমন রসূল ﷺ -এর জীবনী থেকে জানা যায়, মুসলিম দেশে হোক আর অমুসলিম দেশে হোক যে এলাকায় মুসলিম বসতি বেশী সেই এলাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার (1st preference & 1st recommended)। তারপর আবার ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদের আশেপাশে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করা 1st priority। সূরা নিসার ৯৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে,

"যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল, ফিরিশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা [পৃথিবীতে] কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম; তারা [ফিরিশতাগণ] বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না

যে, তন্মধ্যে তোমরা হিজরত করতে পারতে? অতএব, ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং কত নিকৃষ্ট ঐ জায়গা!”

উপরের এই আয়াতের ব্যকগ্রাউন্ড কী তা দেখতে হবে। কোন অবস্থায় এবং কোন প্রেক্ষাপটে অমুসলিম দেশে হিজরত করা যাবে। অবশ্যই রিযকের সন্ধানে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া যাবে কিন্তু কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে আর কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে না তা আবার রসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীস দ্বারা protect/control এবং filtering করা হয়েছে। যেমন আমরা সহীহ বুখারী এবং আবু দাউদের হাদীস দু'টি দেখেছি, সেখানে বলা হয়েছে যে অমুসলিম দেশে কোন হিজরত নেই। রিযকের সন্ধানে অমুসলিম দেশে যেতে বলা হয়নি, যদি যেতেই হয় তাহলে মুসলিম দেশগুলোতে রিযকের সন্ধানে যেতে হবে। মাইগ্রেট করার জন্য যদি কোন মুসলিম দেশ পাওয়া না যায় এবং নিজ দেশের সরকার জালিম হওয়ার কারণে পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবন নাশের হুমকির সম্মুখীন হতে হয় তখন অমুসলিম দেশে যাওয়া যেতে পারে।

অমুসলিম দেশে যাওয়ার বিষয়ে দু'টি দিক। ১) অস্থায়ীভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পড়া-লেখা করতে যাওয়া অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের জন্য যাওয়া ২) মাইগ্রেট করে সিটিজেনশিপ নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা।

প্রথমটি করা যেতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়টি সহীহ বুখারী এবং আবু দাউদের হাদীস আনুযায়ী করা যাবে না শুধু মাত্র অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত অথবা আল্লাহর পথে সংগ্রাম ব্যতীত।

রিযকের সন্ধানের ব্যাপারে তাকওয়া এবং ঈমানের বিষয় জড়িত। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি চিন্তা করা যাক। আমি একটি চাকুরীর অফার পেলাম দু'টি দেশ থেকে। একটি সিঙ্গাপুর অন্যটি মালয়েশিয়া। অথবা ক্যানাডা এবং সৌদি আরব থেকে। সিঙ্গাপুর এবং ক্যানাডার চাকুরীর বেতন অনেক বেশী এবং সুযোগ-সুবিধাও অনেক বেশী। আর মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরবের চাকুরীর বেতন কম এবং সুযোগ-সুবিধাও অনেক কম। এখন আমি কোন দেশে যাবো? যদি রিযকের সন্ধানে হয় তাহলে ইসলাম এবং তাকওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম দেশকেই বেছে নিতে হবে। আর যদি ভাল বেতন এবং সুযোগ-সুবিধা বেশী হওয়ার কারণে অমুসলিম দেশকে বেছে নেই তাহলে রসূল ﷺ -এর কথাকে অমান্য করা হবে।

আশা করি বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। অমুসলিম দেশে ইমিগ্রেশন নিয়ে বা সিটিজেনশিপ নিয়ে বসবাস করা যাবে তবে প্রথম উদ্দেশ্য (নিয়্যত) হবে অমুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। তার পাশাপাশি non-practicing মুসলিমদেরকে দ্বীনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং ঈমান বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ (encourage) করে তোলা।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতী কাজের প্রাথমিক যুগে পুরো সমাজটাই ছিল অজ্ঞতার মুঠোয়। তিনি যে দ্বীন প্রচারে নেমেছিলেন তাতে মানুষের দ্বীন গ্রহণের প্রবণতা অতি কম ছিল। তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বীন গ্রহণের মূলে কাজ করেছে ব্যক্তিগত সম্প্রীতি, ভাল ব্যবহার, উদ্দেশ্যের খোলামেলা প্রকাশ ও আলোচনা, গোঁজামিলের আশ্রয় না নেয়া, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ন্যায়বিচার, ইনসাফ ও ইহসান ইত্যাদি। আমরা যদি দাওয়াতী কাজ করে ভাল ফল পেতে চাই তাহলে নিজেদের সেভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। আশা করা যায় নিয়মিত দাওয়াতী কাজ একজন ব্যক্তির আত্মগঠনে ব্যাপক সাহায্য করবে। এভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে। তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই আমরা সকল কাজ করে থাকি।

আলহামদুলিল্লাহ, Islamic Circle of North America, Toronto Islamic Centre, Islamic Education and Research Academy এবং Canadian Dawah Association টরন্টো ইউনিভার্সিটি ও রায়ারসন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা প্রতি শনিবার এবং রবিরার দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন শপিং মলের সামনে (Street Dawah) অর্থাৎ মুসলিমদের নিকট ইংলিশ ট্রান্সলেটেড কুরআন, বিভিন্ন ইসলামিক লিটারেচার, প্যাম্প্লেট এবং ডিভিডি ডিস্ট্রিবিউট করে থাকে। প্রতি উইকেন্ডে হাজার হাজার এইসব দাওয়াতী কপি অমুসলিম পথচারীদের হাতে আমাদের ইয়ং মুসলিম ভাই-বোনেরা তুলে দিচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, এ পর্যন্ত শত শত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও street dawah-র পাশাপাশি এই সকল অর্গানাইজেশন Hospital Dawah, Church Dawah, Jail Dawah, Billboard Dawah, Online Dawah, Radio Campaign, Television Campaign ইত্যাদি করে থাকে।

দ্বীন হচ্ছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য

সমাজ সংস্কার ও পরিগঠনে ব্রতী মু'মিনদের ফরয কাজ হলো আল্লাহর বাণী অমুসলিমদের মাঝে প্রচার করা। দ্বীনের প্রতিষ্ঠা নিছক আমাদের জীবনে একটি আকাঙ্ক্ষার পর্যায়ভুক্ত হবে না বরং এটিকে আমাদের জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে। এক ধরনের লোক দ্বীন সম্পর্কে অবগত হয়, তার উপর ঈমান রাখে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে কিন্তু তার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তাদের জীবনের লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয় না বরং সততা ও সৎকর্ম করে একই সংগে নিজেদের দুনিয়ার কাজ কারবারে লিপ্ত থাকে। নিঃসন্দেহে এরা সৎ লোক। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে তারা ভালো নাগরিকও হতে পারে। কিন্তু যেখানে অজ্ঞ জীবন ব্যবস্থা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তাকে সরিয়ে তদস্থলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন দেখা দেয়, সেখানে নিছক এ ধরনের সৎ লোকদের উপস্থিতি কোনো কাজে আসে না বরং সেখানে এমন সব লোকের প্রয়োজন হয় যাদের জীবনোদ্দেশ্যরূপে এ কাজ বিবেচিত হয়। দুনিয়ার অন্যান্য কাজ তারা অবশ্যই করবে কিন্তু তাদের জীবন একমাত্র এই উদ্দেশ্যের চারিদিকে আবর্তন করবে। এ উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্যে তারা হবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এ জন্যে নিজেদের সময়-সামর্থ্য, ধন-সম্পদ ও দেহ-প্রাণের সকল শক্তি এবং মন-মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ব্যয় করতে তারা প্রস্তুত হবে। এ ধরনের লোকেরাই অজ্ঞতার আগাছা কেটে ইসলামের পথ পরিষ্কার করতে পারে।

দ্বীনের সঠিক নির্ভুল জ্ঞান, তার প্রতি অটল বিশ্বাস, সেই অনুযায়ী চরিত্র গঠন এবং তার প্রতিষ্ঠাকে জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করা এগুলো এমন সব মৌলিক গুণ যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টারত প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে থাকা উচিত। এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ এ গুণাবলী অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ছাড়া এ কাজ সম্পাদনের কল্পনাই করা যেতে পারে না। বলাবাহুল্য, এহেন ব্যক্তিরা যদি সত্যিই কিছু করতে চায় তাহলে তাদের একটি দলভুক্ত হয়ে এ কাজ করা অপরিহার্য। তারা যে কোন দলভুক্ত হোক এবং যে কোন নামে কাজ করুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জানে, নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমাজ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনা যেতে পারে না। এজন্যে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা নয়, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

কিসের অভাবে আমরা দ্বীনের কাজে আগ্রহ বোধ করি না?

- কিসের অভাবে আমরা দ্বীনের জন্য সময় বের করতে পারি না?
- কিসের অভাবে আমরা দ্বীনের পথে খরচ করতে বাধা প্রাপ্ত হই?
- কিসের অভাবে আমরা ইসলামিক প্রোগ্রামে বসলে উঠে যাওয়ার জন্য ঘড়ি দেখতে থাকি?
- কিসের অভাবে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রামে না এসে অন্য কাজে চলে যাই?
- কিসের অভাবে আমরা ঘরে বসে থেকেও ইসলামিক প্রোগ্রামে আসি না?
- কিসের অভাবে ইসলামকে জানার জন্য নিয়মিত পড়াশোনা করি না?
- আমি হয়তো এসব চাই কিন্তু মনে রাখতে হবে ইবলিস (শয়তান) তা চায় না, সে প্রকাশ্য শত্রু। তাই শয়তান থেকে সচেতন থাকতে হবে।

একজন মু'মিনের ইসলামের জন্য ত্যাগ

- আমার মেধা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু কাজে লাগছে?
- আমার হাত-পা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু কাজে লাগছে?
- আমার ডিগ্রি/শিক্ষা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু কাজে লাগছে?
- আমার গাড়ি দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু কাজে লাগছে?
- আমার বাসাবাড়ি দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু কাজে লাগছে?
- আমার কম্পিউটার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু কাজে লাগছে?
- আমার সেলফোন/মোবাইল দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু কাজে লাগছে?
- আমার পরিবার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু কাজে লাগছে?
- আমার মাসিক আয় দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু কাজে লাগছে?
- আমার দিনের ২৪ ঘণ্টা সময়ের কতটুকু সময় দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে লাগছে?

নিজ দেশের জন্য কী করছি?

যারা প্রবাসে বসবাস করে তাদেরও নিজ দেশের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। নিজ দেশে ইসলামের দাওয়াতী কাজ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা হচ্ছে কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখা উচিত। নিজ দেশেও ইসলাম প্রচারের কাজে অর্থ ব্যয় করা উচিত। সকলকে সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাই বিদেশে বসেই এই কাজ করা যেতে পারে। বিদেশে থাকি, অনেক দূরে থাকি, দেশের ব্যাপার আমার না। এই ধরনের মানসিকতা ঠিক নয়। আমাদের দেশের গরিব-অসহায় মানুষের প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আমরা বিদেশে

বসে যা আয় করছি তার কতটুকু অংশ গরিব-অসহায়দের জন্য ব্যয় হচ্ছে? না কি শুধু ব্যাংক ব্যালেন্সই বাড়ছে? এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

আমাদের ব্যস্ততা সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেন?

১. 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, আমার দ্বীনের কাজের জন্য তুমি (দুনিয়ার) ব্যস্ততা কমাও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দরিদ্রতা ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না কর, তবে তোমার হাত (আমি) ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।' (তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ, ইবনে মাজাহ)

২. যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তার (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব থেকে পৃথক থাকেন। তিনি (আল্লাহ) তার (ঐ ব্যক্তির) চোখের সামনে দরিদ্রতাকে তুলে ধরেন আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যা তাকদিরে লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত ঐ ব্যক্তির জন্য আর কিছুই আসবে না। আর যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির (ভাল-মন্দের) দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন, তাকে অন্তরে সমৃদ্ধি দান করেন, আর পৃথিবী তার কাছে ছুটে আসে আকুল হয়ে। (ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান)

৩. আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের পরম ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তার যাবতীয় অভাব-অনটনের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর যে ব্যক্তির আগ্রহ-আরাধনা হয়েছে পার্থিব বিষয়াদি তবে আল্লাহ তার বিষয়ে কোনো জামিনদার নন। (ইবনে মাজাহ)

যারা দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা নিয়ে চিন্তাভাবনা করল না!

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর দ্বীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে [দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে পিছুটান দেবে তারা যেন জেনে নেয়] আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এই কাজের সুযোগ করে দেবেন। তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি হবে দয়ালু এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা সংগ্রাম করে যাবে আল্লাহর পথে। কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না- এটাতো

হবে আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে চান এভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি তো সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হল না, কিংবা দ্বীন প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না আর এই অবস্থায়-ই মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে) দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। *[জামে আত তিরমিযী]*

স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দ্বীনের কাজের জন্য তৈরী করা

আমরা অনেকেই একটা ভুল করি আর তা হচ্ছে, আমি নিজে দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ করি কিন্তু আমার স্ত্রী বা সন্তানরা এই বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। আমি নিয়মিত ইসলামিক প্রোগ্রামে যাই, মিটিং-এ যাই, পড়াশোনা করি, স্টাডি সার্কেল করি, ইসলামিক অর্গানাইজেশনে প্রচুর সময় দেই কিন্তু এর পাশাপাশি আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সমান তালে এই কাজে যুক্ত করি না। এতে একই পরিবারে দিন দিন gap তৈরী হতে থাকে। এক সময় আমার দ্বীনের জন্য sacrifice পরিবারের অন্যান্যদের কাছে অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তারা সঠিক বুঝে উঠতে পারে না যে আমি সারাদিন কী করি। তাদের কাছে মনে হয় অযথা কিসের জন্য সময় নষ্ট করি! মনে রাখতে হবে নিজ পরিবার মানে একটা নৌকা, আমরা পরিবারের সবাই ঐ একই নৌকার যাত্রী, তাই পরিবারের সবারই সাঁতার জানা প্রয়োজন।

তাই আমি নিজে দ্বীনের জন্য যা যা করি ঠিক একইভাবে আমার স্ত্রী ও সন্তান-দেরকেও ঐ একই পথে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এই ভুল করা যাবে না যে, আমি নিজে আগে একা অগ্রসর হয়ে নেই তার পরে তাদেরকে এই পথে আনবো বা আমাকে দেখে তারা নিজে নিজেই এই পথে এসে যাবে। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। আর কাজটাও এতো সহজ নয়। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি আমাদের বেশী বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত এই জন্য যে, তারা নানা কারণে সঠিক ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। যেমন একজন পুরুষ বাইরে যতো লোকের সাথে মেলামেশা করে, বিভিন্ন ইসলামিক স্কলারদের এবং জ্ঞানী

ব্যক্তিদের সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ পায়, এবং পুরুষরা আউটডোর থেকে অনেক বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষাও পায়। কিন্তু মহিলারা সেই সুযোগ পান না। নানা কারণে মহিলাদের practical experience অনেক কম বিধায় তাদের শিক্ষার প্রতি আরো বেশী জোর দেয়া উচিত।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

বাস্তবে দেখা গেছে যে, আমি নিজে যখন কোন ইসলামিক প্রোগ্রামে যাই তখন পরিবারকে সময় কাটানোর জন্য তার কোন বান্ধবীর বাসায় বা কোন আত্মীয়র বাসায় রেখে আসি। সে ঐদিকে সাধারণ গল্পগুজব (unproductive gossiping) করে সময় কাটায় আর আমি দ্বীন ইসলামের কাজ করে ফেরার পথে তাদেরকে নিয়ে বাসায় ফিরি। অনেক সময় তাদেরকে ইসলামের কোন প্রোগ্রামে নিয়ে আসতে চাইলেও তারা আগ্রহ দেখায় না বা আসতে চায় না। তখন এই বিষয়ে আরো বেশী সিরিয়াস হতে হবে যে কীভাবে তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় এই পথে নিয়ে আসা যায়।

শেষ কথা

- রসূল ﷺ নবুয়াত পাওয়ার দিন থেকেই মক্কায় অমুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াতী কাজ শুরু করেছেন। এবং তাঁর ﷺ দাওয়াতী কাজ-ই শুরু হয়েছে মক্কায় অমুসলিমদের দিয়ে। তারপর মদীনায় ঈহুদী ও নাসারাদের মধ্যে। রসূল ﷺ -এর জন্মই হয়েছে অমুসলিমদের মাঝে।

- ঈমান নিয়ে বসবাস করা না গেলে অমুসলিম দেশে বসবাস করা যাবে না। শুধু অমুসলিম দেশে নয় ঈমান রক্ষা করে চলতে না পারলে ঐ মুসলিম দেশেও থাকা যাবে না। যেখানে ঈমান নিয়ে বসবাস করা যাবে সেই দেশে চলে যেতে হবে।

- ঈমান নিয়ে বসবাস করা গেলেও এবং অমুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত না পৌঁছালে অমুসলিম দেশে থাকা যাবে না।

- দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে না নিলে অমুসলিম দেশে থাকা যাবে না।

- শুধু মাত্র ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, বাড়ি, গাড়ি, উচ্চ ডিগ্রি, ব্যাংক ব্যালেন্স, উন্নত জীবনযাপন ইত্যাদির জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস করা যাবে না।

Appendix - 1

একটি মুসলিম দেশ থেকে একটি অমুসলিম দেশে এসে নতুন করে ইসলাম গ্রহণ

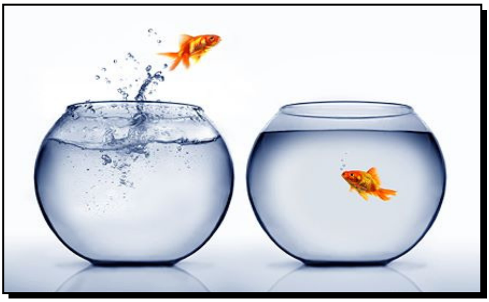

আমাদের জীবনের কিছু শিক্ষণীয় গল্প

আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মূলতঃ আইটি প্রফেশনাল। আমি আমির জামান নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার এবং আমি নাজমা জামান সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। শিক্ষণীয় হিসেবে আমরা আমাদের জীবনের কিছু বিষয় নীচে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে আমাদেরকে কেউ যেন ভুল না বুঝেন। আমরা কীভাবে প্রকৃত দ্বীন ইসলামের দেখা পেলাম এবং তা শেখা ও পালন করার চেষ্টারত বিষয়গুলো এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ।

নর্থ আমেরিকায় এসে সঠিক ইসলামের সাথে সাক্ষাত

আমরা আজ থেকে পনেরো বছর আগে ক্যানাডায় এসেছি। ক্যানাডা একটি মাল্টিন্যাশনাল এবং মাল্টিকালচারাল দেশ অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উচ্চ শিক্ষিত প্রফেশনাল লোকেরা এই দেশে এসেছেন ইমিগ্রেশন নিয়ে। এখানে ইসলাম পালন করতে গিয়ে দেখি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলিমরা ইসলাম পালন করে একভাবে আর বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের মুসলিমরা ইসলাম পালন করে অন্যভাবে। বিশেষ করে এরাবিয়ান, আফ্রিকান, নর্থ আমেরিকান, ইউরোপিয়ান মুসলিমগণের ইসলাম পালন বাংলাদেশীদের ইসলাম পালনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। নিজেদের মনে প্রশ্ন জাগলো। এই পার্থক্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে ইসলামের উপর অথেন্টিক সোর্স থেকে পড়াশোনা শুরু করলাম। ইসলামের উপর বিষয়ভিত্তিক একের পর এক কোর্স করতে লাগলাম। পৃথিবীর বড় বড় ইসলামিক স্কলারদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামকে জানার চেষ্টা করতে লাগলাম, সহীহ আকীদা সম্পন্ন শায়েখদের থেকে সব তথ্য যাচাই-বাছাই করার

সুযোগ পেলাম। এক এক করে ইসলামের জট খুলতে লাগলো। মনে হলো একটি মুসলিম দেশে থেকে একটি অমুসলিম দেশে এসে আবার নতুন করে মুসলিম হলাম। নতুন ইসলামের দেখা পেলাম। বাংলাদেশে ইসলাম মনে করে অনেক কিছুই পালন করেছি যা আসলে ইসলামের অংশ নয়, আবার অনেক কাজই করিনি যা ছিল ইসলামের ফরয কাজ।

ইসলামী শিক্ষার অপূর্ব সুযোগ

আলহামদুলিল্লাহ, নর্থ আমেরিকায় সঠিক ইসলামকে জানার জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এবং ইসলামিক সেন্টারগুলোতে নিয়মিত ইসলামের উপর নানা বিষয়ে কোর্স হচ্ছে, ওয়ার্কশপ হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে। বড় বড় ইন্টারন্যশনাল কনভেনশন সেন্টারে কয়েকদিন ব্যাপী আন্ত র্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্স হচ্ছে। এই কনফারেন্সে সারা পৃথিবী থেকে বড় বড় স্কলারগণ আসেন বক্তা হিসেবে। মুসলিম পরিবারগুলো অনেক টাকা দিয়ে টিকিট কেটে সপরিবারে তিন-চার দিনের জন্য কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে। আমরাও সপরিবারে কয়েকদিনের জন্য চলে যাই কনফারেন্স উপভোগ করার জন্য হোটেলে। মনে হয় এটি একটি ইসলামিক ফেস্টিভ্যাল। এরকম একটি ইসলামিক কনফারেন্সে ২০ থেকে ২৫ হাজার লোকের উপস্থিতি হয়। কয়েকদিনের কনফারেন্সকে এমনভাবে সাজানো হয় যে সেখানে বড়দের প্রোগ্রামের পাশাপাশি সারাদিন ব্যাপী ইয়ুথদের প্রোগ্রাম, ছোটদের প্রোগ্রাম, মহিলাদের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম থাকে। এছাড়া এন্টারটেইনমেন্ট সেশন থাকে যেখানে বড় বড় ইসলামী শিল্পীরা আসেন, হালাল উপায়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে থাকেন। এই কনফারেন্সের পাশাপাশি থাকে বিশাল ইসলামী পন্যের বাজার।

জুম্মার সলাত এবং ঈদ উদযাপন

নর্থ আমেরিকার প্রতিটি মসজিদে মহিলাদের সলাত আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি শুক্রবার জুম্মায় মসজিদে পুরুষ যেমন হয় তেমনি মহিলাও হয়। মহিলারাও মসজিদে গিয়ে ওয়াক্তের সলাত আদায় করেন। এখানে জুম্মার খুতবাহ আরবীতে দেয়া হয় না, ইংরেজীতে দেয়া হয় যাতে মুসল্লিরা সব বুঝতে পারেন এবং এটাই ইসলামের নিয়ম। অনেকেই সপরিবারে মসজিদে গিয়ে জুম্মার সলাত আদায় করেন। জুম্মার খুতবা এক একটি লেসন, মুসল্লিগণ জুম্মার খুতবা থেকে প্রতি সপ্তাহে অনেক কিছু শিক্ষাগ্রহণ করেন। এবার আসি ঈদের কথায়। আল্লাহর রসূল ﷺ ঈদগাহে মহিলাদের অবশ্যই নিয়ে যেতে

বলেছেন। এখানে তারই অনুসরণ করা হয়। এখানে খুবই বড় বড় ঈদের জামাত হয় এবং ঈদের জামাতে মন্ত্রী-এমপিদেরও দাওয়াত দেয়া হয়, তারা আসেন এবং বসে খুতবাহ শুনেন। ঈদের খুতবাহ ইংরেজীতে দেয়া হয় সমসাময়িক বিষয়ের উপর। প্রায় সকলেই সপরিবারে ঈদগাহে চলে যান।

নর্থ আমেরিকায় দাওয়াতী কাজ

কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে জানতে পারলাম যে, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যেমন ফরয, সিয়াম যেমন ফরয, হাজ্জ-যাকাত যেমন ফরয ঠিক তেমনি দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য ফরয এবং এই ফরয কাজটি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, বরং ২৪ ঘন্টার জন্য ফরয। এই কাজটি কোন নিদিষ্ট এলাকার জন্য ফরয নয়, যে যেখানে থাকবে তার জন্য সেখানেই ফরয। তবে ইসলামের দাওয়াত কাদেরকে দিব? হ্যাঁ, ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে সর্বপ্রথমে অমুসলিমদের মাঝে, তারপর মুসলিমদের মাঝে। আর অমুসলিম দেশে থাকতে হলে দাওয়াতী কাজের কোন বিকল্প নেই। দাওয়াতী কাজ করতে হলে একটি প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন এবং সেই প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ইসলামিক অর্গানাইজেশন। নর্থ আমেরিকায় এই ধরনের বেশ কিছু অর্গাইজেশন রয়েছে যারা দল নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যার মাধ্যমে প্রায় প্রতি মাসেই অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

কুরআন পোড়ানোর ঘোষণার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ

নর্থ আমেরিকায় গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরকম ফেসটিভ্যাল হয়ে থাকে। আমরা অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে এই ফেসটিভ্যালগুলোতে দাওয়া বুদ (স্টল) দিয়ে থাকি। সে বছর আমেরিকার ফ্লোরিডার একজন ধর্মযাজক (Pastor Terry Jones) আল-কুরআন পোড়ানো ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরেই ছিল টরন্টোতে ক্যাবেজ টাউন ফেসটিভ্যাল। আমরা প্রতি বছর এই ফেসটিভ্যালে দাওয়া বুদে অমুসলিমদেরকে ডেকে ডেকে কুরআনের কপি বিতরণ করে থাকি। কিন্তু সে বছর আর আমাদের কোন অমুসলিমকে ডেকে কুরআনের কপি দিতে হয়নি। শত শত অমুসলিম খুঁজে খুঁজে আমাদের বুদে এসে নিজে আগ্রহ করে চেয়ে চেয়ে কুরআনের কপি নিয়ে গেছেন। প্রথম দিনই আমাদের স্টকে থাকা সব কুরআনের কপি শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারা পড়ে দেখতে চায় এই বইয়ের ভিতর এমন কী আছে যে চার্চের একজন পাদ্রী ঘোষণা দিয়ে ঘটা করে তা পোড়াতে চায়! আলহামদুলিল্লাহ, এই পাদ্রী ইসলামের দাওয়াতী কাজ অর্ধেক করে দিয়েছেন। পরিসংখ্যানে দেখা

গেছে যে আল-কুরআন পোড়ানোর ঘটনার পরে অসংখ্য অমুসলিম নরনারী ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

নর্থ আমেরিকায় উইকেন্ড স্কুল

নর্থ আমেরিকায় অনেক উইকেন্ড ইসলামিক স্কুল রয়েছে। মুসলিম ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরাও টরন্টো সিটিতে একটি উইকেন্ড ইসলামিক স্কুল পরিচালনা করে থাকি যেখানে গ্রেড ১ থেকে ১২ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা ইসলামের উপর দুই বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করে থাকে। এই স্কুলের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ইসলামিক স্টাডিজের উপর ১২টি বইয়ের একটি সিলেবাস পড়ানো হয় যা থেকে ছেলেমেয়েরা Islamic Way of Life শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে (Course syllabus followed by Madina University)।

ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা

এই প্রবাসে বসবাস করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বাংলাদেশী পরিবার গুলোর মধ্যে কোন কিছুর শূন্যতা রয়েছে। বাংলাদেশে থাকতে যে সকল পরিবারগুলো সুখে-শান্তিতে ছিল এই দেশে এসে তাদের মধ্যে অনেকেই কেন জানি সুখ-শান্তি হারিয়ে ফেলছে। স্বামী একদিকে, স্ত্রী অন্য দিকে আর সন্তানরা আরেক দিকে। অনেক পরিবারেই একরকম অশান্তি দেখা দিচ্ছে যা তাদের অজান্তেই ঘটছে। কিন্তু কেন ঘটছে তা তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই এই প্রবাসে বাংলাদেশী পরিবারগুলোকে সঠিক গাইডেন্স দেয়ার উদ্দেশ্যে আমরা গত নয় বছর যাবত (২০০৭ সাল থেকে) ‘দি মেসেজ’ (The Message) নামে একটি ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছি।

ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ

আমরা যখন প্রকৃত ইসলামকে জানার জন্য পড়াশোনা শুরু করলাম তখন দেখলাম জ্ঞানের রাজ্যে এ এক মহাসমুদ্র। সেই সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা। আমরা ইসলামকে জানার জন্য সহীহ স্কলারদের সংস্পর্শে থেকে পড়াশোনা করতে লাগলাম, একটানা ১২ বছর পড়াশোনা করার পর মনে হলো আমরা যা শিখেছি তা অন্যান্যদেরকেও জানানো প্রয়োজন। কারণ এই জ্ঞানের রাজ্যে মুসলিমদের জন্য একটি সঠিক গাইডলাইন ও সিলেবাস থাকা প্রয়োজন যে কোথা থেকে জ্ঞান অর্জন শুরু করতে হবে এবং কী কী বিষয় একজন মুসলিমকে জানতেই হবে। অনেকেই হয়তো প্রফেশনাল লাইফ নিয়ে খুব ব্যস্ত, ইসলামকে

জানার জন্য পড়াশোনা করে প্রচুর সময় দেয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই আমরা তাদের সুবিধার্থে ইসলামের সকল দিক কাভার করে একটি সিলেবাস প্রণয়ন করি। যার মধ্যে রয়েছে বড়দের জন্য ১২টি বই, বাংলা মিডিয়ামের ছোটদের জন্য ১২টি বই বাংলায় এবং ইংরেজী মিডিয়ামের ছোটদের জন্য ১২টি বই ইংরেজীতে। কোন পরিবার যদি এই ১২টি বই খুব মনোযোগ দিয়ে এক বছর অধ্যয়ন করেন তাহলে তাদের সঠিক ইসলামের উপর ওভারঅল নলেজ হবে। এটি ইসলামের উপর একটি ডিপ্লোমা কোর্স বলা যেতে পারে।

মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন

আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রায়ই ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট ও প্যারেন্টিং-এর উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করে থাকি। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০টির মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রেজেনন্টেশন রয়েছে। এই প্রেজেন্টেশনগুলো অথেন্টিক সোর্স থেকে ডিজাইন করা। প্রেজেন্টেশনগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে রয়েছে যা অতি সহজেই ডাউনলোড করা সম্ভব। এছাড়া প্রতি বছর যারা হাজ্জে যান তাদের জন্যও আমরা প্রাকটিক্যাল অরিয়েন্টেড অডিও-ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ফ্রী হাজ্জ সেমিনারের আয়োজন করে থাকি যেন মুসলিমগণ ইসলামকে বুঝে সহীহভাবে তৃপ্তিসহকারে হাজ্জ পালন করতে পারেন। যে কেউ চাইলেই নিম্নের ওয়েব সাইট থেকে এই প্রেজেন্টেশনগুলো কপি করে তাদের পারিবারিক দাওয়াতী কাজে লাগাতে পারেন। www.themessagecanada.com

Appendix - 2

কিছু বাস্তব চিত্র থেকে শিক্ষাগ্রহণ

সুখী পরিবার এক সময় অসুখী পরিবারে পরিণত হওয়ার করুণ চিত্র

পরিচিতদের মধ্যে যখন কোন পরিবার নতুন ইমিগ্র্যান্ট হয়ে ক্যানাডা আসেন তখন আমরা সাধারণতঃ তাদেরকে আমাদের বাসায় গেষ্ট হিসেবে ডিনারের দাওয়াত দিয়ে থাকি। ডিনারের পরে আমরা Family Development-এর উপরে একটি Power Point Presentation-এর আয়োজন করি। এই পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, সন্তানদের গাইড করার পেছনে বাবা-মায়ের ভূমিকা, পাশ্চাত্যের নেগেটিভ দিক এবং পজিটিভ দিকগুলো নিয়ে Presentation-টি সাজানো। শেষে Self study-র জন্য কিছু বইপত্র এবং ডিভিডি দিয়ে থাকি। অর্থাৎ প্রবাস জীবনের শুরুতেই একটি সঠিক গাইড দিয়ে দেয়া হয় কিভাবে চললে কি হবে ইত্যাদি।

যাহোক, এ রকম একটি পরিবারের ঘটনা। তারা দেশ থেকে নতুন ইমিগ্র্যান্ট হয়ে এসেছেন। আমাদের থেকে প্রবাস জীবনের শুরুতেই যা যা গাইড পাওয়ার তা পেয়েছেন। ভাই-ভাবী দু'জনেই জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর জন্যে খুবই সিনসিয়ার। ক্যানাডায় সেটল হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তা তারা লিষ্ট ধরে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভাই কিছুদিনের মধ্যেই একটা চাকুরী পেয়েছেন, তারপর আরো উন্নতির জন্য চাকুরীতে প্রচুর সময় দিচ্ছেন, ওভার টাইম করছেন, ফলে সময়মত প্রমোশনও হয়েছে। প্রথম প্রথম মাসিক ইসলামিক প্রোগ্রামে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন তারপর আস্তে আস্তে হারিয়ে

গেছেন। স্ত্রীও চেষ্টা করছেন দিন দিন আরো উন্নতির জন্য, ইংলিশ কোর্স করছেন, তারপর চাকুরী নিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা পাবলিক স্কুলে পড়ে, তারাও প্রচুর ব্যস্ত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যে তারা গাড়ি কিনেছেন তারপর আরো কিছুদিনের মধ্যে একটি বাড়ি কিনেছেন। নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধব হয়েছে, বাসায় বাসায় পার্টি চলছে, সবাই দাওয়াত আর ওয়েষ্টার্ন লাইফ নিয়ে ব্যস্ত, ডলার আর্নিং আর পার্টি ইত্যাদি। এখন আর কোন কিছুর অভাব নেই। ক্যানাডার সব কিছুই তারা মোটামুটি পেয়ে গেছেন।

যাহোক, চার বছর পরের ঘটনা। হঠাৎ ঐ ভাইয়ের সাথে একদিন দেখা। তিনি আমাদেরকে পেয়ে আবেগজরিত কণ্ঠে বললেন, জরুরী কথা আছে। কথা হচ্ছে তার পরিবারটি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার এতো দিনের সুখের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। তার স্ত্রী এক দিকে, ছেলে আরেক দিকে আর সে নিজেই তো আরেক দিকে। যে যার মতো চলছে, কেউ কারো কথা শুনছে না, পুরো পরিবারটি কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে। পরিবারে সুখ বলতে আর কিছু নেই।

ঘটনার বিশ্লেষণ ঃ আমাদের প্রকাশিত "দি মেসেজ" পত্রিকার কোন এক সংখ্যায় "উন্নত জীবনের সন্ধানে" নামে একটি আর্টিক্যাল ছিল যেখানে এই সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছিল। যাহোক, এখানে সমস্যার মূল কারণটা হচ্ছে ভারসাম্যহীনতা। অর্থাৎ পরিবারে কর্তা এবং কর্ত্রী দু'জনই জীবনকে নিয়ে চিন্তা করেছেন ওয়ান ওয়ে। অর্থাৎ শুধু ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, চাকুরী, প্রোমোশন, ডলার, গাড়ি, বাড়ি, বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে স্ট্যাটাস, একপ্রকার ইনডাইরেক্ট প্রতিযোগিতা। ইসলামী পরিবেশ ছেড়ে দিয়ে নন-ইসলামী পরিবেশের সাথে জীবনযাপন করেছেন। তারা শুধু চিন্তা করেছেন বৈষয়িক কিন্তু নিজেদের আত্মার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

এখন এই সমস্যার সমাধান খুব সহজ নয়। কারণ সমস্যাটা খুব প্রকট আকার ধারণ করেছে। যদি সমস্যাটা শুরুর দিকে ধরা যেত তাহলে সমাধান অনেকটা সহজ হয়ে যেত। একজন মানুষের পরিবর্তন রাতারাতি হয় না, দিনের পর দিন আস্তে আস্তে এতো বড় আকার ধারণ করেছে। যাহোক, পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, হাল ছাড়া যাবে না, ধৈর্যধারণ করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইলে ইন্‌শাআল্লাহ তিনি সাহায্য করবেন।

একটি সত্য ঘটনা ও ঘটনা হতে শিক্ষা

দুর্ঘটনা ঃ ভদ্রলোক একটি ভাল চাকুরী করেন, এলাকায় তার খুব নাম এবং সবাই তাকে খুবই সম্মান করেন এবং তিনি অবসর সময়ে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজও করে বেড়ান। ভদ্রলোক স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সুখে শান্তিতেই বসবাস করছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর এক বান্ধবী প্রায়ই ভদ্রলোকের স্ত্রীর কাছে আসা-যাওয়া করেন। বান্ধবীটি আবার কোন কারণে স্বামীহারা এবং কয়েক সন্তানের মা। যাহোক, এভাবে আসা-যাওয়ার মধ্যে দিয়ে দুই পরিবারে মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক ডেভেলপ করে। মাঝে মধ্যে ভদ্রলোকের স্ত্রী বান্ধবীকে অনুরোধ করেন তার স্বামীকে ডাইনিংয়ে খাবারটা বেড়ে দিতে। অনেক সময় স্ত্রী বান্ধবীকে নিজ বাসায় রেখে কোন জরুরী কাজে বাইরে গেছেন এবং বান্ধবীকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন যে তার স্বামী ঘুম থেকে উঠলে যেন নাস্তাটা তৈরী করে দেন। এভাবে চলতে থাকে কিছু দিন। দুই পরিবারের মধ্যে খুবই ভাল সম্পর্ক।

কিন্তু ইবলিস শয়তান তো আর বসে নেই সে অপেক্ষায় ছিল সুযোগের। কিছু দিনের মধ্যেই যা ঘটার তাই ঘটে গেছে। ভদ্রলোকের স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বান্ধবীর সাথে ভদ্রলোকের সম্পর্ক হয়ে গেছে। ঘটনা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। ভদ্রলোক ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে স্ত্রীর বান্ধবীকে বিয়ে করবেন। যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। ভদ্রলোক ঐ মহিলাকে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর এবার মাথায় হাত, কিন্তু যা হবার হয়েই গেছে, এখন আর কিছুই করার নেই।

ঘটনা হতে শিক্ষা ঃ আশা করি আমরা সকলে এ ঘটনা হতে শিক্ষা নেব। ভদ্রলোকের স্ত্রী কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তার ফিরিশতাতূল্য স্বামী এমন একটি কাজ করতে পারেন। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার জন্য ভদ্রলোকের স্ত্রীই রাস্তা বাতলে দিয়েছেন। আফসোসের বিষয় হলো আমরা কেউ নিজেকে Vulnerable মনে করি না। আমাদের আত্মবিশ্বাস ও শয়তানের ব্যাপারে অস্বচ্ছ জ্ঞান নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনায় সহায়তা করে। সকল স্বামী মনে করেন আমার স্ত্রী পৃথিবীর সেরা, সকল স্ত্রী মনে করেন আমার স্বামী সচ্চরিত্রবান। কথা ঠিক, স্বামী ফুলের মত পবিত্র, স্ত্রী বিশ্বস্তা। কিন্তু শয়তানকেও কি বিশ্বাস করা যায়? মূল ঘটনা তো ঘটায় শয়তান। আমাদের আপত্তি এখানে। আমরা যেন শয়তানকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস না করি। শয়তানের ঘোষণাই তো মানুষের ক্ষতি করা। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা। আর

সময় ও সুযোগ পেলেই কাজে লাগিয়ে ভাল মানুষদের ধ্বংস করে দেয়া। সূরা আ'রাফের ১৭ নং আয়াতে শয়তান ডিকলারেশন দিয়ে বলছে ঃ

"আমি (শয়তান) এদের (মানবজাতির) সামনে থেকে আসবো, পিছন থেকে আসবো, ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো"।

কর্মক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশার করুণ পরিণতি

একটি সত্য ঘটনা ঃ সদরুল ভাই (ছদ্ম নাম) একজন ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছেন। একটি কম্পিউটার কোম্পানিতে চাকুরী চাকুরী করেন। একার আয়ে সচ্ছলভাবে সংসার চলে না বলে স্ত্রীও চাকুরী নিয়েছেন। ঘটনার শুরু এখানেই।

বন্ধের দিনগুলো ছাড়া একে অপরের সাথে ঠিকমতো দেখাই হয় না, সদরুল ভাই অনেক চেষ্টা করেছেন স্ত্রীকে চাকুরী ছাড়ানোর জন্যে, কিন্তু কিছুতেই তিনি রাজি নন। মাঝে মধ্যে এ নিয়ে তাদের মধ্যে মনোমালিন্যও হয়েছে।

যা হোক এভাবে চলতে থাকে বেশ কিছুদিন। একদিন সদরুল ভাইয়ের স্ত্রী অফিস ছুটির পর আর বাসায় আসেননি এবং তিন-চার দিন পর হঠাৎ একদিন বাসায় হাজির, উনি এসেছেন উনার প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জিনিস-পত্র এবং কাপড়-চোপর নেয়ার জন্যে। অর্থাৎ এতো বছরের সংসার এখানেই সমাপ্ত। পরে জানা গেল উনি যে লোকটির সাথে পাশাপাশি এক অফিসে চাকুরী করতেন তার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে গেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সদরুল ভাইকে ডিভোর্স দিয়ে নতুন জীবন শুরু করবেন। মা তার একমাত্র ছেলের কথা একবারও চিন্তা করলেন না! এর মধ্যে স্ত্রী, সদরুল ভাইয়ের জয়েন্ট একাউন্ট থেকে একমাত্র সঞ্চয় সমস্ত টাকাগুলোও না জানিয়ে তুলে নিয়েছেন। দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল খুব দ্রুত এবং সদরুল ভাইয়ের স্ত্রী হয়ে গেলেন আরেক জনের স্ত্রী। এ ধরনের ঘটনা ঘটছে অনেক! কিন্তু কেন? আমরা কি একবারও গভীরভাবে ভেবে দেখবো না? আমার জীবনেও তো ঘটে যেতে পারে এমন ঘটনা! আমি কি এখনও সজাগ হবো না?

ঘটনার বিশ্লেষণ ঃ এতো কিছু ঘটে যাচ্ছে কিন্তু সদরুল ভাই কিছুই টের পাননি। ঘটনা সিনেমার মতো হলেও বাস্তব, সদরুল ভাই কল্পনাও করতে পারেননি যে উনার স্ত্রী এমনটি করতে পারেন! সদরুল ভাইয়ের স্ত্রী নিজেও কোনদিন হয়তো

চিন্তাও করেননি যে উনার জীবনে এমনটি ঘটতে পারে, কারণ ইবলিস শয়তানের কাছে তিনি হেরে গেছেন। সদরুল ভাই মানসিকভাবে খুব বেশী ভেঙ্গে পড়লেন। মনে রাখতে হবে, যখনই কোন পরপুরুষ ও নারী কোন জায়গায় দু'জনে একাকী থাকে তখন অবশ্যই সেখানে তৃতীয় আর একজন উপস্থিত থাকে আর সে হচ্ছে "ইবলিস শয়তান", এবং এই ইবলিস শয়তান দু'জনকে দিয়ে অবৈধ কাজ করানোর চেষ্টা করে। আমি যতোই মজবুত ঈমানদার বা পরহেজগার হই না কেন! ইবলিসকে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করা যায় না। (এখানে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই বলা হচ্ছে)। কেন একে অপরে নিজেদেরকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলবো? নিজেদেরকে কেনইবা অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিবো?

নারী-পুরুষের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পর্দা বা দূরত্ব বজায় রেখে চলা উচিৎ। পর্দা বা দূরত্বের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে পুরুষের অনভিপ্রেত আকর্ষণ হতে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। নারীদের চেহারা-সুরত ও ভাবভঙ্গির মতো তাদের কণ্ঠস্বরও পুরুষদেরকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে নারীদেরকে অনাকর্ষণীয় স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন কণ্ঠস্বর শুনে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে। সূরা আহযাবের ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"চাপা গলায় (আকর্ষণীয় ভাবে) কথা বলো না নতুবা যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা (পরপুরুষরা) প্রলুব্ধ হবে।"

ঘটনা হতে শিক্ষা ঃ যেসব মহিলারা আগে মোটামুটি পর্দা করে চলতেন তাদের অনেকেই চাকুরী করতে গিয়ে পর্দা করা ছেড়ে দিয়েছেন। মাশাআল্লাহ অনেকেই আবার আরো বেশী পর্দানশীন হয়েছেন। তবে যারা পর্দা করা ছেড়ে দিয়েছেন তাদের অবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই করুণ। অনেকেই মেয়েদের পোশাক ছেড়ে দিয়ে রীতিমতো ছেলেদের পোশাক পড়ে ওয়েস্টার্ন কালচার ফলো করছেন।

যাহোক, যারা পর্দা করেন না তাদেরকে এই বেপর্দা পোশাকেই প্রতিদিন ৮-১০ ঘন্টা অন্যান্য পুরুষদের সাথে থাকতে হয় এবং কাষ্টমার সার্ভিস দিতে হয়। মনে রাখতে হবে এই কাষ্টমার বা সহকর্মীরা কেউই আমার স্বামী, পিতা বা ভাই নন। আসলে আমি হয়তো এ ব্যাপারটা এতোটা গভীরভাবে কখনও চিন্তা করে

দেখিনি। তাই আসুন একটু ভেবে দেখি যে, যাদের দৃষ্টি আমার সৌন্দর্য উপভোগ করছে তারা নিশ্চয়ই পবিত্র মন নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নেই।

তাই বাছবিচার না করে এবং অতিরিক্ত পয়সার প্রতি না ঝুকে দেখে-শুনে এমন কাজ নেয়া উচিত যেন পর্দা করে চলা যায় এবং পরপুরুষের সাথে একটা নির্দিষ্ট পর্দা বা দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করা যায়। একটু কম পয়সার চাকুরি হলেও আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। ইন্‌শাআল্লাহ আল্লাহ আমাকে অন্যদিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বরকত দিয়ে দিবেন কারণ আমি মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করছি।

প্রকৃত ঈমানদারের জীবনে কোন দুঃখ থাকে না, থাকে না কোন হতাশা। তারা সবসময়ই সুখী। ইন্‌শাআল্লাহ গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় যে কুরআনের আলোকে নিজের পারিবারিক জীবনকে গড়ে তুলতে পারলেই আমি সবচেয়ে বেশী সুখী, আমার পরিবারে কোন দুঃখ নেই, নেই কোন অশান্তি, চারিদিকে সুখ আর সুখ। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন আমাদের প্রকৃত সুখ কিসে। কিন্তু আমরা আল্লাহর দেয়া শান্তির পথকে বাদ দিয়ে যখন নিজেদের মনগড়া স্টাইলে শান্তি খুঁজতে থাকি তখনই জীবনে নেমে আসে অশান্তি। আসুন আমরা কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করি, নিয়মিত কুরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যা) অধ্যয়ন করি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালনা করি।

আরেকটি ভিন্নরকম ঘটনা

একটি সত্য ঘটনা। এক ভাই, তিনি নিজ স্ত্রী দ্বারা নির্যাতিত। আমরা সাধারণতঃ পত্র-পত্রিকায় দেখে থাকি স্বামী দ্বারা স্ত্রী নির্যাতিত। কিন্তু এই ঘটনা উল্টো। এখানে অনেক স্বামীরাই তাদের স্ত্রী দ্বারা মানসিকভাবে নির্যাতিত। অনেক স্বামীরাই নীরবে কাঁদেন, কাউকেই কিছু বলতে পারেন না।

যেমন এই ভাই তার সমস্যাটা তুলে ধরেছেন। সারাক্ষণ তাকে স্ত্রীর কথায় উঠা-বসা করতে হয়, স্ত্রী সারাক্ষণ তাকে হুকুমের মধ্যে রাখেন। নিজে চাকুরী করেন কিন্তু বেতনের সব টাকাই স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে হয়। নিজের বাবা-মার জন্য কোন টাকা পাঠাতে পারেন না কারণ স্ত্রী এটা পছন্দ করেন না।

এই সমস্যার সমাধান কোথায়? এখানে কয়েকটা দিক। (১) স্বামী-স্ত্রী দু'জনের জেনারেল লেভেল অব এডুকেশন এক নয় অথবা এখানে একটা বড় ধরণের গ্যাপ রয়েছে (২) দুই পারিবারিক স্ট্যাটাসের মধ্যে হয়তো বড় ধরণের গ্যাপ রয়েছে (৩) হয়তো দু'জনের বয়সের বড় ধরনের ব্যবধান রয়েছে (৪) ভালোবাসা ও বিশ্বাসের অভাব রয়েছে (৫) প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অভাব রয়েছে।

এখানে শেষের ৫নং পয়েন্টটাই মূল। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী হচ্ছেন পরিবারের মূল গার্ডিয়ান, স্বামীর যদি প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান না থাকে তাহলে পুরো পরিবারটাই ধ্বসে পরতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে তাকে পড়াশোনা করে নিজে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তারপর স্ত্রীকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। আর স্ত্রী যদি সত্যিই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যান তাহলে এই সমস্যা সকলের অজান্তেই সমাধান হয়ে যাবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

স্বামীকে হেয়-প্রতিপন্ন করা

আসুন একজন স্বামী এবং পিতার কষ্টের কথা শুনি। স্বামী, স্ত্রী এবং টিনএইজ মেয়ে নিয়ে তিনজনের পরিবার। স্বামী একটি সাধারণ চাকুরী করেন এবং হালাল উপায়ে সংসার চালান। স্বামী অফিস থেকে বাসায় ফিরলেই স্ত্রী তার মেয়ের সামনে স্বামীকে নানা ভাষায় কটাক্ষ করেন। স্বামী কোন উত্তর দেন না এবং মুখ বুজে সহ্য করেন। যেমন, একদিন মেয়ে মাকে একটি ড্রেসের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে বলছে কী সুন্দর! মা প্রতি উত্তরে বলে উঠছে যে, তোর বাবার কি মরদ আছে এই সকল ড্রেস কিনে দেবার? তোর বাবা তো অথর্ব! অকর্মন্যা। তোর বাবা জীবনে কী করতে পেরেছে? বাবা চুপ করে থাকেন, নীরবে কষ্ট পান, নিজ মেয়ের সামনে ইনসাল্ট ফিল করেন। এভাবে নিজ মেয়ের সামনে সবসময় স্ত্রী তার স্বামীকে নানাভাবে অপদস্ত এবং আজেবাজে কথা বলতে বলতে এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, মেয়েও এখন থেকে তার বাবাকে আর সম্মান করে না, তার মার মতো বাবাকেও সে আজেবাজে ভাষায় কথা বলে। বাবার কোন কথাতো শুনেই না বরং উঠতে বসতে বাবাকে নানারকম কটুক্তি করে।

ঘটনা থেকে শিক্ষা ঃ হয়তো এরকম ঘটনা অনেক পরিবারেই হয়ে থাকে আর স্বামীরা নিরবে কাঁদেন। কিন্তু কিসের অভাবে আজ এই কষ্ট? স্বামীরা কেন স্ত্রীদের কথার মাধ্যমে কষ্ট দেন বা স্ত্রীরা কেন স্বামীদেরকে কথার মাধ্যমে কষ্ট

দেন? কেন একে অপরকে কটাক্ষ করেন? কেন সন্তান পিতা-মাতাকে ইনসাল্ট করে? এই বিষয়ে দু'জনকেই শুরু থেকে সাবধান হওয়া উচিত। সন্তানেরা পিতা-মাতাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে, তারা ছোট থেকেই ঘরে যা দেখে তাই শিখে। তাই বাবা-মার আচরণ তাদের মনে প্রভাব ফেলে। স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে যদি হেয় প্রতিপন্ন করেন, সারাক্ষণ নানাভাবে কটাক্ষ করেন তাহলে নিজ ঘরে তো অশান্তি ছাড়া আর কিছু থাকার কথা নয়। এতে লাভ কার হচ্ছে? দু'জনই তো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন! এই বইয়ের বিভিন্ন চ্যাপ্টারে নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, একজন আরেকজনের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত, একজন আরেক জনের প্রতি কীভাবে ভালোবাসা বাড়ানো উচিত ইত্যাদি। তবে দু'জনেরই ধৈর্য এবং সহনশীলতা আরো বাড়ালে অনেক বিষয়েই অতীসহজে সমাধান এসে যায়। আমরা যদি একে অপরে কিছু বেসিক নিয়ম মেনে চলি এবং কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি না করি তাহলেই সংসারে শান্তি বিরাজ করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

আমানত খিয়ানত করার সত্য ঘটনা

এই সত্য ঘটনাটি আমাদের দেশে খুবই কমোন। ছোট ভাই এখনো বিয়ে করেননি, মধ্যপ্রাচ্যে থাকেন, সেখানে অনেক কষ্টের কাজ করেন। কোম্পানী থেকে থাকার জায়গা দিয়েছে কিন্তু খাওয়া নিজের। চাকুরী করেন এবং ওভারটাইম করে যা বেতন পান তার সামান্য কিছু অংশ নিজের খাওয়ার জন্য রেখে প্রতি মাসে বাকি টাকাটা দেশে পাঠিয়ে দেন। প্রতি মাসে এই টাকা পাঠান বড় ভাইয়ের নামে, বড় ভাইয়ের একাউন্টে। বড় বইয়ের সাথে বোঝাপড়া হলো, প্রতিমাসের টাকা থেকে কিছু অংশ পরিবারের জন্য খরচ করবেন আর বাকিটা ব্যাংকে জমা করতে থাকবেন। ইতিমধ্যে ছোটভাই জানতে পারলো যে বড় ভাই তার জমানো টাকা থেকে তার জন্য একটি প্লটও কিনে দিয়েছেন এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি দোকানও কিনে দিয়েছেন এবং বাকী টাকা ব্যাংকে জমা আছে। এভাবে ছোট ভাই প্রতি মাসে বড় ভাইয়ের নামে টাকা পাঠান। দেশেও দীর্ঘদিন যাবত বেড়াতে যান না খরচ হবে বলে। মনে মনে নিয়ত বেশ কিছু টাকা জমলে একেবারে দেশে চলে যাবেন, দেশে ফিরে ভাল একটা ব্যবসা করবেন এবং অতঃপর বিয়ে করে সংসার করবেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ছোট ভাই দশ বছর পর দেশে ফিরলেন। প্রথম এক সপ্তাহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে খুবই আনন্দে কাটলো। এবার বাস্তবাতার সম্মুখীন।

হিসাব-কিতাব নিয়ে বড় ভাইয়ের সাথে বসলেন তার জমানো টাকা, দোকান এবং প্লট বুঝে নিতে। কিন্তু ঘটনা ভিন্ন, ছোট ভাইয়ের মাথায় বাজ পড়লো। এই দশ বছরে যতো টাকা পাঠিয়েছেন তার কিছুই নেই, তার নামে কোন দোকান বা প্লট কোনটাই নেই। বড় ভাই সব খেয়ে বসে আছেন! এখন কোন হিসাবই দিতে পারেন না!

শিক্ষা ঃ এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সর্বপ্রথম ভুল ছোট ভাইয়ের, সে তার বড় ভাইকে সুযোগ করে দিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী খোঁজ-খবর নেন নাই, নিজের নামে ব্যাংকে টাকা রাখেন নাই, নিজের নামে দোকান এবং প্লট হলো কিনা, দলিল হলো কিনা তা খোঁজ খবর নেন নাই, দলিলের কপি কখনো চান নাই, ব্যাংকের স্টেটমেন্ট কখনো চান নাই। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যে কোন লেনদেনে সাক্ষীসহ এগ্রিমেন্ট, দলিল বা যে কোন ডকুমেন্ট করে নিতে হবে, মৌখিকভাবে কোন কিছু করা যাবে না, এটি কুরআনের আদেশ। যদি সব কিছু নিয়ম অনুযায়ী লিখিত থাকে তাহলে কাউকে অবিশ্বাস করারও প্রশ্ন আসে না। তারপরও চোখ-কান খোলা রেখে সবসময় সজাগ থাকতে হবে, কাউকে সুযোগ দেয়া যাবে না।

Appendix - 3

উন্নত দেশ থেকে কিছু শিক্ষণীয়

কিছু শিক্ষণীয় বিষয়

ক্যানাডার মোট লোক সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৩৪,৪৮২,৭৭৯ এবং আয়তন হচ্ছে ৯.৯ মিলিয়ন স্কয়ার কিলোমিটার। ক্যানাডা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম শান্তিপ্রিয় দেশ এবং তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) ব্যবহারের দিক থেকে দ্বিতীয়। দীর্ঘদিন ক্যানাডায় থেকে আমরা যে বিষয়গুলো এখানে দেখেছি এবং আমাদের কাছে শিক্ষণীয় হিসেবে মনে হয়েছে তার কিছু অংশ আমাদের বাংলাদেশে বসবাসকৃত মানুষের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে আমাদের যেন কেউ ভুল না বুঝেন যে আমরা একটি উন্নত দেশের প্রশংসা করছি আর নিজ দেশের বদনাম করছি। আসলে বিষয়টা মোটেও তা নয়। এখানে পৃথিবীর একটি উন্নতদেশের কিছু ভাল ভাল নিয়ম-কানুন তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য আমাদের দেশেও যেন আমরা এরচেয়েও আরো উন্নতমানের সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারি এবং বাংলাদেশকেও পৃথিবীর বুকে একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি ও নিজেরা শান্তিতে বসবাস করতে পারি।

আমরা জানি বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, আর স্বাভাবিকভাবেই সে দেশে ইসলামী নীতি পালিত হওয়ার কথা বেশী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে আমরা মুসলিম হিসেবে যতটা না ইসলামী নিয়ম-কানুন পালন করি ক্যানাডা একটি অমুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেদেশের মানুষ আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ইসলামী নিয়ম-কানুন পালন করে যাচ্ছে। আমরা মুসলিম

হয়ে ইসলামী নিয়ম-কানুন ত্যাগ করেছি আর অমুসলিমরা তা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে। আসুন আমরা ক্যানাডার কিছু নিয়ম-কানুন দেখি।

১) **মৌলিক চাহিদা ঃ** এ দেশের সরকার প্রতিটি নাগরিকের জন্য তাদের basic needs-এর পাঁচটি বিষয় (খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা ও চিকিৎসা) নিশ্চিত করেছে। যাতে এই কয়টি বিষয়ে কেউ কোন প্রকার কষ্ট ভোগ না করে। আর আমরা জানি এটা মূলতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব যা আমীরুল মু'মিনীন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) সর্বপ্রথম চালু করেছিলেন। যেমন ঃ

ক. কেউ খাদ্যের অভাবে কষ্ট করে না বা কেউ না খেয়ে মারা যায় না।
খ. কেউ বস্ত্রে অর্থাৎ কাপড়ের অভাবে শীতে কষ্ট পায় না।
গ. কেউ চিকিৎসা বা ঔষুধের অভাবে কষ্ট পায় না বা মারা যায় না। চিকিৎসা করাতে কোন টাকা লাগে না। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের চিকিৎসা সরকারের দায়িত্ব।
ঘ. যদি কারো থাকার জায়গা না থাকে সরকার তার ব্যবস্থা করে থাকে।
ঙ. শিক্ষার বিষয়ে সরকার খুবই সচেতন, প্রতিটি শিশুকে অবশ্যই স্কুলে যেতে হবে এবং তাদের ১২ গ্রেড অর্থাৎ আমাদের দেশের এইচ.এস.সি পর্যন্ত সমস্ত পড়াশোনার সকল খরচ সরকার বহন করে।

২) **স্কুল ঃ** প্রতিটি এলাকাতে হাঁটার দূরত্বের মধ্যে একটি করে প্রাইমারী বা এলিমেন্টারী স্কুল রয়েছে। যাতে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে মা বা বাবা হেঁটেই স্কুলে যেতে পারেন। প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্য ১২ গ্রেড হাইস্কুল পর্যন্ত পড়ালেখা করা বাধ্যতামুলক। হাইস্কুল শেষ করে ছেলেমেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়।

৩) **স্কুলে পড়া-লেখা ঃ** প্রতিটি স্কুলে স্কুল পিরিয়ডের মধ্যেই লেখাপড়া শিখিয়ে দেয়া হয় যাতে বাসায় গিয়ে আর পড়তে না হয়। এখানে প্রাইভেট পড়ার কোন কালচার নেই বা কোচিং সেন্টারের কোন কালচার নেই। যদিও এশিয়ান কমিউনিটির লোকেরা এদেশে আসার পর কোথাও কোথাও এই কালচার কিছুটা শুরু করেছে তবে সেটা ওদের সমাজেই সীমাবদ্ধ। তবে মূলতঃ ক্যানডিয়ানরা প্রাইভেট পড়া বা কোচিং কি বস্তু তা চিনেই না। বন্ধের দিনে সাধারণতঃ বাসায় কোন হোমওয়ার্ক দেয়া হয় না যাতে বাচ্চারা বন্ধের দিনগুলো আনন্দের সাথে কাটাতে পারে।

৪) **সেশন, পরীক্ষা ও স্কুল ছুটি ঃ** ক্যানাডার সমগ্র দেশে যতো স্কুল আছে (গ্রেড ১ থেকে ১২) সবার সেশন এবং পরীক্ষা একই দিনে শুরু হয় একই দিনে শেষ হয়। এবং দেশের যতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, (যেমন ঃ স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি) ওদের ভেকেশন একই দিনে শুরু হয় এবং শেষ হয়। ইউনিভার্সিটিগুলোতে কোন সেশনজট নেই।

৫) **স্কুলের উপস্থিতি ঃ** কোন বাচ্চা যদি স্কুলে পনের মিনিট দেরীতে যায় তাহলে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাসায় বাবা-মাকে ফোন দিয়ে জানায়। আর যদি কোন বাচ্চা স্কুলে একদিন না যায় তাহলে তো অবশ্যই কর্তৃপক্ষ বাসায় বাবা-মাকে ফোন দিয়ে জানায় এবং অনুপস্থিতির কারণ জানতে চায়। এতে কোন বাচ্চার স্কুলে ফাঁকি দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া উপায় নেই। স্কুলে পি.এ.ডে, এই দিনে স্কুলে বাচ্চার প্রতিটি অভিভাবককে আমন্ত্রণ করা হয় এবং তার বাচ্চার বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে এক এক করে আলোচনা করা হয় (বাচ্চার উন্নতি ও অবনতি ইত্যাদি)।

৬) **স্কুল বাস এবং বাচ্চাদের নিরাপত্তা ঃ** বাচ্চাদের জন্য রয়েছে হলুদ রংঙের স্কুল বাস। এই বাস যেকোন রাস্তায় সিগনাল দিয়ে যদি দাঁড়ায় তাহলে অন্য কোন গাড়ি তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না যতক্ষণ পযর্ন্ত না সকল বাচ্চারা নিরাপদে গাড়িতে উঠবে অথবা নামবে, তারপর ড্রাইভার সিগনাল বন্ধ করলে অন্যান্য গাড়ি যেতে পারবে। অন্যথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী হলেও তার গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

৭) **ছাত্র-ছাত্রীদের ভলান্ট্যারি ঃ** প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে কোন নন-প্রফিট সোশ্‌ল অর্গানাইজেশনে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সময় ভলান্ট্যারি কাজ করতে হয় এবং এই ভলান্ট্যারি ঘন্টাগুলো তার পরীক্ষার সাথে ক্রেডিট হিসেবে যোগ হয়। এতে দিন দিন প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ছোট বয়স থেকেই স্বয়ং কাজ করতে স্বাবলম্বি হয়। আবার যাদের বয়স ৬৫ হয়ে যায় এবং রিটায়ার করেন তারা শুধু গল্পগুজব আর পেপার পরে দিন কাটান না। তারাও প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট ঘন্টা ভলান্টারী করেন, এতে তার শরীরও ভাল থাকে এবং মনও ভাল থাকে।

৮) **সিকিউরিটি ঃ** দেশের প্রতিটি নাগরিকের ২৪ ঘন্টা সিকিউরিটি দেয়া সরকারের দায়িত্ব। রাত দু'টার সময়ও কোন একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে সোনার অলংকার পরে একটি নিরিবিলি রাস্তা দিয়ে নির্দ্বিধায় হেঁটে যেতে পারে। তাকে কেউ কিছু বলবে না। আবার ব্যাংক থেকে যে কেউ বড়

অংকের টাকা উত্তোলন করে হেঁটে বাসায় চলে আসতে পারে, কেউ রাস্তায় বোমা ফাটিয়ে টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় না ।

৯) **শীত নিবারণ ঃ** ক্যানাডা একটি শীত প্রধান দেশ । শীতকালে স্থান বিশেষে এদেশে তাপমাত্রা minus 50/minus 60 degree centigrade-এ নেমে যায় । তবে যে সকল বাড়ির মালিক তাদের বাড়ি ভাড়া দেন তারা কোনভাবেই তার ভাড়াটিয়াকে শীতে কষ্ট দিতে পারবেন না । অর্থাৎ বাড়িতে হিটিং সিস্টেম ভালভাবে কার্যকরী থাকতে হবে । এখানে প্রতিটি বাড়ি বা এপার্টমেন্টে হিটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে ।

১০) **পানির সুবিধা ঃ** এ দেশের প্রতিটি বাড়ি, এপার্টমেন্ট, দোকান, শপিং মল, মসজিদ, চার্চ, স্কুল, কলেজ, অফিস সব জায়গায় সারা বছর গরম এবং ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা আছে । অর্থাৎ রান্নাঘরে বা বাথরুমের কল দিয়ে গরম এবং ঠান্ডা পানি উভয় বের হয়, এর জন্য দু'টি আলাদা tap বা faucet থাকে, ঠান্ডা এবং গরম । আবার সরকার সেইফটির জন্য আইন করে দিয়েছে যে, পানি এতোটা গরম হতে পারবে না যাতে কারো হাত বা শরীর পুড়ে যেতে পারে ।

১১) **ইনকাম ট্যাক্স ঃ** দেশের ধনী বা গরীব প্রতিটি নাগরিক বছরের শুরুতে গত বছরের ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করেন । এতে সরকার জানতে পারেন কার আয় কত । যাদের আয় বেশী তাদের থেকে ইনকাম ট্যাক্স কেটে নিয়ে সরকার যাদের আয় কম তাদেরকে দিয়ে থাকেন, এতে সমাজে একটা ব্যালেন্স আসে ।

১২) **বেকার ভাতা ঃ** কারো চাকুরী চলে গেলে এদেশে employment insurance করা থাকে । ঐ চাকুরীহারা ব্যক্তি তার gross ইনকামের ৮০% দশ মাস পর্যন্ত বেতন পাবেন । এই দশ মাসে তিনি আরেকটি নতুন চাকুরীর সন্ধান করবেন । এই দশ মাসে তিনি ক্যানাডার বাইরে খুব জরুরী কারণ ছাড়া বেড়াতে যেতে পারবেন না, গেলে ভাতা পাবেন না । এই দশ মাস সময়ে সরকার ঐ ব্যক্তির ক্যারিয়ার ডেভেলমেন্টের জন্য শর্ট কোর্স, লংকোর্স, কলেজ ডিগ্রি বা ইউনিভার্সিটি কোর্স করার জন্য ভাল অংকের টাকা দিয়ে উদ্বুদ্ধ (encourage) করে থাকে ।

১৩) **সময়মতো বিল পরিশোধ ঃ** কেউ কোন বিল বাকি রাখেন না । বিল সময় মতো পরিশোধ করার জন্য সবাই ব্যাকুল থাকে । কারণ সময় মতো বিল

পরিশোধ না করলে তার ক্রেডিট হিস্ট্রি খারাপ হয়ে যাবে, তাতে অনেক জায়গাতেই বিপাকে পড়তে হবে।

১৪) **শৃংখলা ঃ** কোথায় কোন লাইনে দাঁড়াতে হলে কেউ কাউকে ডিংগিয়ে আগে যাওয়ার চেষ্টা করেন না। আর কাউকেতো ধাক্কা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। সবাই সুশৃংখলভাবে ধৈর্য ধরে এগুতে থাকেন।

১৫) **সমাজ কল্যাণ ঃ** কারো যদি E.I. (Employment Insurance) শেষ হয়ে গিয়ে থাকে এবং তিনি কোন চাকুরী না পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি ওয়েলফেয়ার-এর জন্য আবেদন করতে পারেন। কোন চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত পরিবার চালানোর জন্য তিনি একটি নির্দিষ্ট অংকের ভাতা পেতে থাকেন। এই অংকও নির্ধারিত হবে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী। এই সময় সরকার ঐ ব্যক্তির ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য সর্ট কোর্স, লংকোর্স, কলেজ ডিগ্রি বা ইউনিভার্সিটি কোর্স করার জন্য ভাল অংকের টাকা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

১৬) **নৈতিক চরিত্র ঃ** লোকেরা সহজে মিথ্যা কথা বলেন না, চুরি করেন না, ডাকাতি করেন না, ছিনতাই করেন না, রাহাজানি করেন না, ধর্ষণ করেন না, রাস্তাঘাটে যুবতী মেয়েদেরকে কেউ উত্যক্ত করে না। এখানে কোন মলম পার্টি নেই। কোন ধোকাবাজ নেই।

১৭) **পুলিশ হচ্ছে জনগণের বন্ধু ঃ** পুলিশ হচ্ছে জনগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু। যে কোন বিপদে যে কেউ দিনে-রাতে যে কোন সময়ে ফোনে ৯১১ টিপে ডাকলেই মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ চলে আসবে। আর কোন মহিলা সাহায্য চাইলে তো কোন কথায়ই নেই, মিনিটের মধ্যে এসে হাজির। পুলিশরা কারো থেকে কোন ঘুষ নেন না বরং কেউ দিতে চাইলে তাকে এরেষ্ট করেন।

১৮) **অসুস্থ সেবা ঃ** কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে কোন রকম যদি সে তার ফোন থেকে ৯১১ টিপতে পারে, তাহলে সাথে সাথে পুলিশ, এম্বুলেন্স এবং ফায়ার সার্ভিস এসে তার বাসায় হাজির হয়। এমনকি অজানা কোন রাস্তার মোড় থেকেও কল করলে সেখানেই চলে আসবে। তিনটি সার্ভিস একসাথে আসার কারণ হচ্ছে যে, এম্বুলেন্স আসে রোগীর সেবা করতে, ফায়ার সার্ভিস আসে প্রয়োজনে বাড়ির দরজা ভেংগে ভেতরে ঢুকতে, পুলিশ আসার কারণ হচ্ছে যদি দুর্ঘটনায় অসুস্থ বা ইনজুরি হয়ে থাকে বা কেউ

আঘাত করে থাকে তাহলে কেইস লিখতে হবে। যারা খুবই বৃদ্ধ তাদের জন্য রয়েছে এক ধরণের ঘড়ি, যদি তিনি অসুস্থ বোধ করেন তাহলে তিনি শুধু ঐ ঘড়ির বোতামে চাপ দিলেই তার বাসায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই এম্বুলেন্স চলে আসবে, বাসার ঠিকানাও বলতে হবে না।

১৯) **হেলিকপ্টার এম্বুলেন্স ঃ** এদেশে হেলিকপ্টার এম্বুলেন্সও রয়েছে। রোগীর যদি এমন অবস্থা হয় যে তাকে অতি দ্রুত হসপিটালে নিতে হবে তখন হেলিকপ্টার এম্বুলেন্স চলে আসে। যেমন হাইওয়েতে কোন এক্সিডেন্ট হলে। অনেক হসপিটালের ছাদেই হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার জন্য হেলিপ্যাডের ব্যবস্থা থাকে।

২০) **পোষ্ট অফিস ঃ** পোষ্ট অফিস সার্ভিস হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত। প্রতিদিন প্রতিটি বাসায় প্রচুর চিঠিপত্র এসে থাকে। চিঠিপত্র সাধারণতঃ মিসিং হয় না। পাসপোর্ট অফিস ডাকযোগে বাসায় পাসপোর্ট পর্যন্ত পাঠিয়ে থাকে যা আমাদের দেশে কল্পনাও করা যায় না।

২১) **পাসপোর্ট অফিস ঃ** পাসপোর্ট অফিসে কোন দালাল নেই, কোন ঘুষ নেই, অতিরিক্ত কোন পয়সা দিতে হয় না। পুলিশ ভেরিফিকেশন নেই, ভেরিফিকেশনের নামে হয়রানী নেই। তারা মনে করে এটা সরকারের একটা সার্ভিস আর জনগণের জন্য সেবা। পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে এক সপ্তাহের মধ্যে বাসায় বাইপোষ্টে পাসপোর্ট চলে আসে।

২২) **হরতাল ও মিছিল ঃ** সরকারের বিরুদ্ধে কোন হরতাল হয় না, মিছিল হয় না। গাড়ি ভাংচুর হয় না, গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয় না, গাড়ির মধ্যে রেখে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারা হয় না। দেশের সরকারের এবং জনগণের কোন প্রকার ক্ষতি করা হয় না। গাড়ির চাকার টায়ারের পাম্প ছেড়ে দেয়া তো দূরের কথা রাস্তার পাশ থেকে একটা ছোট গাছের ডালও কেউ ভাঙে না।

২৩) **রাজনীতি ঃ** নোংরা রাজনীতি নেই। রাজনৈতিক দলে দলে দলাদলি নেই। কোন দল কোন দলের বিরুদ্ধে বা কোন নেতা আরেক নেতার বিরুদ্ধে কোন কটুক্তি করে না, মিথ্যা কথা বলে না, কোন অপবাদ দেয় না। জনগণের ভিতর থেকে কেউ রাজনৈতিক দলে সাধারণতঃ ভীড়ে না। রাজনৈতিক নেতাদের কেউ এখানে ঠিক মতো চিনেও না।

২৪) **মিনিস্টার ও এম.পি. ঃ** প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল মন্ত্রী এবং এম.পি-রা সরকার থেকে কোন প্রকার অবৈধ সুযোগ-সুবিধা নেন না। তারা যখন কোথাও যায় তখন তাদের পিছনে শতশত লোক হাঁটে না। প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রী কোথাও গেলে রাস্তাঘাট বন্ধ করে জনগণের অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় না।

২৫) **ড্রাইভিং ঃ** গাড়ি চালানোর জন্য কোন ড্রাইভার রাখা হয় না। সবাই নিজ নিজ গাড়ি নিজে চালায় যদি সে মন্ত্রীও হয়। সবাই ট্রাফিক সিগনাল ১০০% মেনে চলে। যেমন রাত দুটার সময় একটি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে কেউ একজন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে এবং রেড সিগনাল পড়লো, তৎক্ষণাৎ সে আইন মান্য করে দাঁড়িয়ে গেল।

২৬) **এক্সিডেন্ট ঃ** দু'টি গাড়িতে এক্সিডেন্ট হলে দুই গাড়ির মালিক গাড়ি থেকে নেমে একে অপরের সাথে ঝগড়া শুরু করে না। বরং দু'জনই পুলিশকে খবর দেয়, মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ স্পটে চলে আসে, তারপর ইনভেস্টিগেশন করে আসল রিপোর্ট দেয় যে কার ভুলের জন্য দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুই পক্ষই সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হয়ে দু'জন দু'জনের ইনসিওরেন্স কোম্পনীকে ক্ষতিপূরণের জন্য জানায় এবং সময়তো ক্ষতিপূরণ পেয়ে যায়।

২৭) **ফায়ার সার্ভিস ঃ** আগুন লাগাতো দূরের কথা কোথাও কোন ধূয়া উঠছে খবর পেলেই ফায়ার সার্ভিসের অত্যাধুনিক গাড়ি কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসে। প্রতিটি বাড়িতে বা বিল্ডিংয়ে দুইটি Exit থাকে, অর্থাৎ বাহির হওয়ার রাস্তা দু'টি থাকে। একদিকে আগুন লাগলে অন্যদিক দিয়ে লোক বের হয়ে যেতে পারে। এছাড়া প্রতিটি বাড়িতে উন্নত মানের পানি ছিটানোর sprinkler ও ফায়ার হোজের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি বাড়ির সামনে দিয়ে যে রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তার দুই পাশ দিয়ে কিছু দূর পরপর ফায়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য হাই ভলিউমের পানির কানেকশন রয়েছে। সাইরেন বাজাতে বাজাতে ফায়ার সাভির্সের গাড়ি বা পুলিশের গাড়ি বা এম্বুলেন্স যখন কোন রাস্তা দিয়ে যায় তখন রাস্তা দিয়ে চলন্ত অন্যান্য সাধারণ গাড়ি রাস্তার পাশে সাইড করে দাঁড়িয়ে যায় অর্থাৎ তাদেরকে যাওয়ার জন্য রাস্তা ক্লিয়ার করে দেয়। কোন গাড়ি যদি না থামে তাহলে তাকে ফাইন করা হয়।

২৮) **হিউম্যান রাইট্স ঃ** এই বিষয়টা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষের জীবনের মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার

জন্য সকল ব্যবস্থা করা হয়। যেমন কাউকে মানসিকভাব কষ্ট দেয়া যাবে না, বিনা কারণে দোষারোপ করা যাবে না, গ্রেফতার করা যাবে না, কাউকে নাজেহাল করা যাবে না, কারো দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না, কারো পোশাক নিয়ে বা চেহারা নিয়ে বা গায়ের বর্ণ নিয়ে কোন প্রকার মন্তব্য করা যাবে না। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, মহিলা-পুরুষ সকলের সমান অধিকার। একজন এম.পির যে অধিকার একজন লেবারেরও সেই অধিকার। চাইল্ড পর্নগ্র্যাফী সম্পূর্ণরূপে আইনত নিষিদ্ধ।

২৯) **এ্যানিম্যাল রাইট্স ঃ** মানুষের মতো এদেশে পশু-পাখিরও অধিকার রয়েছে। কোন পশু-পাখি মারা যাবে না, তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না। কোন পশু-পাখি যদি কোন বিপদে পড়ে তাহলে Animal control department-কে জানালে তারা এসে তাকে সাহায্য করবে। পশু-পাখি শিকার করতে হলে নির্দিষ্ট এরিয়া আছে সেখানে গিয়ে শিকার করতে হয় তবে অবশ্যই শিকারের লাইসেন্স নিয়ে নিতে হবে, তা না হলে ফাইন করা হবে। নদী-খাল-বিল থেকে মাছ শিকার করতে হলেও আগেই লাইসেন্স করে নিতে হয়। এই ধরণের লাইসেন্স বাৎসরিক দেয়া হয়।

একটি ঘটনার মাধ্যমে এ্যানিম্যাল রাইট্স এর গুরুত্ব দেখা যাক। একবার ট্রেন লাইনের দুই ফাঁকের মাঝে একটি বিড়ালের বাচ্চা আটকা পড়েছিল। সেই বিড়ালের বাচ্চাকে উদ্ধার করার জন্য হাজার হাজার ডলার ব্যয় করা হয়েছিল। যেমন ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, ইঞ্জিনিয়ার এবং ফায়ার সার্ভিস সাহায্য করেছিল, উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত টিভি চ্যানেলগুলো নিউজ প্রচার করেছিল।

৩০) **রিলিজিয়াস রাইট্স ঃ** প্রত্যেক ধর্মের লোকদের সমান অধিকার। কেউ কারো ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করতে পারবে না বা হেয় করতে পারবে না। যে যার ধর্ম অন্য ধর্মের লোকের নিকট প্রচার করতে পারবে। অর্থাৎ যার যার ধর্ম ঠিক মতো পালন করতে পারবে। যেমন ঃ অফিসে সলাতের সময় হলে সলাতের জন্য সময় দিতে হবে বা রমাদানে ইফতারের জন্য সময় দিতে হবে। আবার কেউ চাইলে যে কারো বাসার দরজায় গিয়ে নক করে তার ধর্মের দাওয়াত দিতে পারে, ধর্মীয় বইপত্র দিতে পারে। অথবা কোন শপিং মলে বা ব্যস্ততম রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যে কেউ যে কোন ধর্মগ্রন্থ বিলি ও প্রচার করতে পারেন।

৩১) **ড্রেসের স্বাধীনতা ঃ** যে যার ইচ্ছে মতো যে কোন প্রকারের ড্রেস পড়তে পারবে। হতে পারে সেটা এক হাতা আছে অন্য হাতা নেই বা দুই পায়ের দুই মোজা বা দুই ধরণের জুতা পরতে পারে এতে কেউ কিছু মন্তব্য করে না এবং আইনতঃ কোন মন্তব্যও করতে পারবে না। মুসলিম মহিলারা নিকাবসহ বোরকা পড়ে সব যায়গায় যেতে পারেন।

৩২) **শিক্ষকের মর্যাদা ঃ** শিক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয় সবচেয়ে বেশী। সেজন্য অন্যান্য প্রফেশনের চেয়ে তাদের বেতনও বেশী। কোন ছাত্র শিক্ষকের গায়ে হাত তুলে না। স্কুল কমিটিও অবৈধভাবে শিক্ষকের চাকুরী খান না।

৩৩) **সরকারী চাকুরী ঃ** এদেশে সরকারী অফিস আমাদের দেশের পুরো বিপরীত। তারা কাস্টমার সার্ভিস দেয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়ানো, কোন অবহেলা নেই। তাদের সার্ভিস প্রাইভেট কোম্পানীর চেয়েও উন্নত। এছাড়া সরকারী অফিসে কোন ঘুষ দিতে হয় না বা কোন কাজের জন্য মামা-খালু ধরতে হয় না, কোন তদবির করতে হয় না। টেলিফোনের মাধ্যমে বহু কাজই সমাধা করা যায়, সেই অফিসে যেতে হয় না। যেমন তাদের সার্ভিস তেমন তাদের কাজের কোয়ালিটি। সরকারী অফিস থেকে যে কোন কাজ নিশ্চিন্তে সমাধা করে বাসায় ফেরা যায়। এখানে পাবলিকের চলাচলের জন্য বাস, ট্রেন, লন্স ইত্যাদিও সরকারী। তাহলে বুঝাই যাচ্ছে তাদের সার্ভিস কতো উন্নত মানের। যেমন, একদিন একটি বাস ড্রাইভার বাস চালানোর সময় তার মোবাইলে এস.এম.এস পাঠাচ্ছিলেন এবং কোন যাত্রী সেই দৃশ্য ভিডিও করে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে এবং বাস ড্রাইভারের চাকুরী চলে গেছে।

৩৪) **পুলিশদের বেতন এবং পদবি ঃ** আইন শৃংখলা রক্ষার্থে পুলিশরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পুলিশরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত। এখানে পুলিশের চাকুরী শুরুই হয় অফিসার লেভেল দিয়ে, অর্থাৎ কোন সিপাই নেই। সব পুলিশ অফিসারদেরকে একটি করে গাড়ি দেয়া হয় ডিউটি পালন করার জন্য। পুলিশরা খুবই হাই স্কেলে বেতন পেয়ে থাকে। যেমন একজন নতুন পুলিশ অফিসারের বেতন বাংলাদেশী টাকায় আট লাখ টাকা। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সবগুলো গাড়ির দু'পাশে লেখা থাকে TO SERVE AND PROTECT.

৩৫) **কোথাও পাসর্পোট সাইজের ছবি লাগে না ঃ** কোথাও কোন কাজে গেলে আমাদের দেশের মতো কোন পাসর্পোট সাইজের ছবি লাগে না। যদি কোথাও লাগে তাহলে তারাই ঐ ব্যক্তির ছবি তুলে প্রিন্ট করে নেয়।

৩৬) **অরিজিনাল সার্টিফিকেট দেখাতে হয় না ঃ** চাকুরী নিতে গেলে কোথাও অরিজিনাল সার্টিফিকেট দেখাতে হয় না আর ফটোকপির সত্যায়নও লাগে না। বায়োডাটাতে যা লিখা হয় তাই বিশ্বাস করা হয়। তবে চাকুরী পাওয়ার পর কাজ দিয়ে তা প্রমাণ করতে হয়।

৩৭) **চারিত্রিক সার্টিফিকেট লাগে না ঃ** কোন চাকুরীর পদে আবেদনের জন্য কোন প্রকার চারিত্রিক সার্টিফিকেট লাগে না, চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট লাগে না। চারিত্রিক সার্টিফিকেট বলতে এখানে কেউ কিছু বুঝেই না।

৩৮) **চাকুরীর জন্য বায়োডাটা ঃ** বায়োডাটাতে কোন ব্যক্তিগত তথ্য থাকে না, যেমন ঃ বাবার নাম, মায়ের নাম, জন্ম তারিখ, দেশের বাড়ি কোথায়, পুরুষ না মহিলা, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি। ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা ইন্টারভিউ নেবেন তারাও প্রার্থীকে কোন প্রকার ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারবেন না। যেমন বয়স কত? কোন দেশী? বা আপনিতো মহিলা বা পুরুষ ইত্যাদি। চাকুরীর বিজ্ঞাপনের সময়ও লেখতে পারবেন না যে শুধু মহিলা বা শুধু পুরুষ প্রার্থী। এর কারণ হচ্ছে যে চাকুরীতে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে এই সকল বিষয় নিয়ে যেন কোন প্রকার ডিসক্রিমিনেশন করা না হয়।

৩৯) **এয়ারপোর্টের সার্ভিস ঃ** এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লাগেজ নিয়ে বের হয়ে আসা যায়। কোন প্রকার জটিলতা নেই, নেই কোন প্রকার নাজেহাল আর দুর্নীতি নেই।

৪০) **কেউ কারো দিকে তাকিয়ে থাকে না ঃ** রাস্তা-ঘাটে, শপিংমলে বা কোন স্টেশনে কেউ কারো দিকে সাধারণতঃ তাকায় না। কোন পুরুষ কোন সুন্দরী মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে না। আর কোন মেয়ে যদি কোন পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তার দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকিয়েছে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪১) **বাসে বা ট্রেনে কেউ ধাক্কা-ধাক্কি করে উঠে না ঃ** বাসে বা ট্রেনে কেউ ধাক্কা-ধাক্কি করে উঠে না, যতোই ভিড় হোক সবাই এক এক করে শৃঙ্গলাবদ্ধভাবে এগুতে থাকে, কেউ কারো গায়ের সাথে টাচ করে না। বাস ড্রাইভার একা এতোগুলো যাত্রী স্টপে স্টপে উঠায় এবং নামায়, কোন হেলপার নেই,

এছাড়া ভাড়া নেয়ার জন্য কোন কন্ডাক্টরও নেই। যাত্রীরা বাসের সামনের দরজা দিয়ে উঠার সময় ড্রাইভারের পাশে একটি sealed box/machine-এ ভাড়া ফেলে সিটে বসে যায়। নামার সময় পিছনের দরজা দিয়ে নেমে যায়। বাস, ট্রেন বা স্টিমারের ছাদের উঠার কথাও কল্পনাও করে না।

৪২) **হসপিটাল সার্ভিস ঃ** একটি উদাহরণ দিলেই হসপিটালের সার্ভিস সম্পর্কে বুঝা যাবে। আমার (আমির জামানের) চোখে একবার কিছু পাউডার গিয়েছিল। তখন আমি হসপিটালে গেলাম, তারা আমার হিস্ট্রি নিয়ে চোখ নানাভাবে পরীক্ষা করলো যে চোখের কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। তারপর একজন নার্স ঘন্টাখানেক আমার চোখে আই ওয়াশ ওয়াটার ঢাললো। আমার চোখে যে পাউডার গিয়েছে হসপিটালের ডাক্তার সেই পাউডার কোম্পানীর কাছে ফোন করেছে যে এই পাউডারের মধ্যে কী কী রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। ঐ পাউডার কোম্পানী আমেরিকার আরেক কোম্পানী থেকে র-মেটারিয়ালস ইম্পোর্ট করে তারা শুধু এসেম্বল করে, তাই তারা সঠিক উত্তর জানে না। এবার ডাক্তার ইন্টারনেট থেকে ঐ আমেরিকান কোম্পানীর ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে তাদেরকে ফোন দিয়েছে রাসায়নিক উপাদানগুলো জানার জন্য। ডাক্তার নিশ্চিত হয়ে তারপর আমার চোখের সঠিক চিকিৎসা শুরু করেছেন। আমার মনে হয় না আমাদের বাংলাদেশে কোন হসপিটাল বা কোন ডাক্তার এই কাজ করবেন।

৪৩) **সব কর্মক্ষেত্র কম্পিউটারাইজড ঃ** এদেশের প্রত্যেকটা কর্মক্ষেত্র কম্পিউটারাইজড, যে কোন কাজ কম্পিউটারাইজড। তাই যারা কম্পিউটার ব্যবহার করতে জানেন না তারাও একসময় ব্যবহার জেনে যায়। কারণ উপায় নেই। একটা সাধারণ ফর্ম পূরণ করতে হলেও সফ্ট কপি কম্পিউটারে বসে করতে হয়। কোথাও আবেদন করতে হলেও কম্পিউটারে করতে হয়।

৪৪) **ময়লা ফেলা ঃ** কেউ কোন বিস্কিট বা চকলেট বা আইসক্রিম খেলে রাস্তা-ঘাটে, পার্কে ময়লা-আবর্জনা ফেলে না। প্রয়োজনে হাতে বা ব্যাগে করে নিয়ে ঘুরে। তবে রাস্তা-ঘাটে, পার্কে কিছু দূর পরপরই ময়লা ফেলার জন্য বিন (bin) রয়েছে। প্রতি রাতে এক ধরণের বিশেষ গাড়ি ব্রাশ এবং শ্যাম্পু দিয়ে রাস্তা ওয়াশ করে থাকে। রাস্তা-ঘাটে কোথাও ময়লা-আবর্জনার দূর্গন্ধ পাওয়া যায় না। অনেকেই কুকুর পালেন, যখন কুকুর নিয়ে বাইরে বের হন

তখন সথে পলিথিনের ব্যাগ রাখেন এবং কুকুর মল ত্যাগ করলে তা নিজ হাতে পলিথিন ব্যাগে তুলে নিকটস্থ কোন ডাস্টবিনে ফেলে দেন ।

৪৫) **কেউ মিথ্যা কথা বলে না ঃ** আশ্চর্যের বিষয় এরা মুসলিম নয় কিন্তু তারা সাধারণতঃ মিথ্যা কথা বলে না । এই দেশের শিশুরা জন্মের পর থেকেই মিথ্যা কথা শিখে না । তারা জানেই না মিথ্যা কী? ছল-চাতুরী কী? চিটিং কী? দুই-নাম্বারী কী?

৪৬) **যার যার কাজ নিজে করা ঃ** এখানে যার যার কাজ সে নিজে করে । দেশে সে যতো বড় অফিসারই হোক না কেন । এখানে নিজের ঘর নিজে মুছতে হয়, নিজের থালা-বাটি-হাঁড়ি-পাতিল নিজে ধুতে হয় । নিজের রান্না নিজে করতে হয় । নিজের কাপড় নিজে ধুতে হয় । বাড়ীতে মালি নেই, কাজের বুয়া নেই, দারোয়ান নেই, গাড়ীর ড্রাইভার নেই । অফিসে পিয়ন নেই । পেট্রল পাম্পে নিজের গাড়িতে নিজে তেল ভরে নিতে হয় ।

৪৭) **বাকির সিস্টেম নেই ঃ** কোন দোকানে বাকির খাতা নেই । বাকিতে যে কিছু কেনা যায় এটা তারা জানেই না । তবে ক্রেডিট কার্ডের বিষয় ভিন্ন, ক্রেডিট কার্ড থেকে দোকানদার ঐ মুহূর্তেই টাকা পেয়ে যায় ।

৪৮) **WSIB ঃ** 'Workplace Safety & Insurance Board' কেউ যদি তার অফিসে বা কাজের জায়গায় কোন প্রকার দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং এর জন্য অফিসে বা কাজে যেতে না পারে তাহলে এই বোর্ড তাকে তার gross salary-র ৯০% প্রতি মাসে দিয়ে থাকে যতদিন সে কাজে যেতে না পারে অর্থাৎ তার সুস্থ হতে যতো দিন সময় লাগে । এমনও হতে পারে এক দুই মাস নয় পাঁচ-দশ বছরও লাগতে পারে, কিন্তু সে ঘরে বসে বেতন পাবে ।

৪৯) **ধনী-গরীব সবাই সমান ঃ** একজন লেবার যে দোকান থেকে কফি কিনে বা যে মার্কেট থেকে বাজার করে একজন ব্যাংকের এমডিও সেই দোকান থেকে কফি কিনে, সেই মার্কেট থেকেই বাজার করে । দুই শ্রেণীই কাজ শেষে বিকেলে রিক্রিয়েশনের জন্য একই জায়গায় যায় । এখানে ধনী-গরীবের কোন ভেদাভেদ নেই । কোন মালিকও তার কর্মচারীর প্রতি যুলুম করেন না, তাকে সবসময় তার কাজের জন্য appreciation করেন ।

৫০) **Human Resource Centre ঃ** রাস্তার মোড়ে মোড়ে হিউম্যান রিসোর্স সেন্টার রয়েছে জনগণের জন্য । এই রিসোর্স সেন্টারে রয়েছে নানারকম সুযোগ-সুবিধা যা সবই ফ্রী । যেমন ঃ উন্নত কম্পিউটার, লেজার প্রিন্টার,

স্ক্যানার, ফ্যাক্স, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ফটোকপি মেশিন এবং চাকুরী সন্ধানের জন্য নানারকম গাইড বুক, ডাইরেক্টরী, অনলাইন জব সার্চ সফ্টওয়ার, ট্রেইনার ইত্যাদি। এই সকল সেন্টারে বসে যে কেউ বিনা পয়সায় তার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য চেষ্টা করতে পারে। চাকুরীর ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীকে নানারকম ট্রেনিং দেয়া হয়। যারা কম্পিউটার ব্যবহার জানেন না তাদেরকে কম্পিউটার ট্রেনিং দেয়া হয়। যে কেউ এখানে বসে প্রতিদিন কম্পিউটার প্র্যাকটিস করতে পারেন।

৫১) **পাবলিক লাইব্রেরী ঃ** প্রতিটি এলাকায় একটি করে উন্নতমানের রেফারেন্স লাইব্রেরী রয়েছে। যে কেউ বিনা পয়সায় মেম্বার হতে পারেন এবং লাইব্রেরীতে বসে পড়া-লেখা এবং রিসার্চ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে বই, ডিভিডি বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। প্রতিটি লাইব্রেরীতেও কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। সব সার্ভিসই ফ্রী।

৫২) **সবার জন্য চাকুরী ঃ** এই দেশে ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সবাই সাধারণতঃ চাকুরী করেন। অর্থাৎ যে কেউ চাইলেই কিছু অর্থ আয় করতে পারেন। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা বেশীরভাগই পার্ট-টাইম চাকুরী করে থাকে। এতে অল্প বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। তাই যখন একটি ছেলে বা মেয়ে ১২ গ্রেড বা হাইস্কুল পাশ করে তখন সে অনেক অফিসেই চাকুরী করতে পারে। এমনকি হাইস্কুল পাশ করার পর ব্যাংকিং এর উপর একটি শর্ট কোর্স করেই ব্যাংকে চাকুরী করতে পারে, যে চাকুরী করতে আমাদের দেশে মিনিমাম মাস্টার্স পাশ হতে হয়।

৫৩) **নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দিন দিন কম ঃ** এই বিষয়টা আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। আমাদের দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম দিন দিন বাড়ে। এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম সারা বছর প্রায় একই ধরনের থাকে। যাতে সব শ্রেণীর লোকেরা কিনতে পারে। সেটা খাবার-দাবার থেকে শুরু করে ঘরের ফার্ণিচার এবং ইলেকট্রনিক্স জিনিষ। যে কেউ চাইলেই অতিসহজে একটা LCD TV কিনতে পারে, যে কেউ চাইলেই একটা কম্পিউটার কিনতে পারে। আবার কোন প্রকার দুর্যোগ হলে সাপ্লাই কম বলে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয় না।

৫৪) **ঈদে দাম বাড়ে না ঃ** এই বিষয়টাও আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। বিভিন্ন পালাপার্বনে আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়, আর এখানে কমে যায়। যেমন ঃ রমাদানে, ঈদে, কুরবানীর সময় আমাদের দেশে সব

কিছুর দাম বেড়ে যায়। এখানে খ্রীষ্টমাস বা অন্যান্য পর্বে এককেটা দোকানের সাথে অন্য দোকান কম্পিটিশান দিয়ে দাম কমিয়ে দেয়। মুসলিমদের রামাদানে-ঈদে এবং হিন্দু ও পাঞ্জাবী শিখদের দিওয়ালী উৎসবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (groceries) discounted price-এ বিক্রি হয়। ম্যানেজমেন্ট থিউরি হচ্ছে বিক্রি বেশী হলে লাভ বেশী, আর দাম কমিয়ে বিক্রয় যতো বাড়ানো যাবে লাভও ততো বেশী হবে এবং দেশের জনগণও উপকৃত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে উল্টো! বিক্রয়ও বেশী চাই আবার লাভও বেশী চাই আর জনগণকে যতো বেশী কষ্ট দেয়া যায়! প্রয়োজনে মাল স্টক করে বাজারে আর্টিফিসিয়াল ক্রাইসিস তৈরী করে দাম বাড়াতে হবে!

৫৫) **Exchange or Refund ঃ** বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটা এক আশ্চর্যের বিষয়। কেউ কোন জিনিস কিনলে এক মাসের মধ্যে exchange or refund করতে পারে। যেমন কেউ একজন একটি টিভি বা একটি কম্পিউটার কিনলো এবং একমাস ধরে ব্যবহারও করল, কিন্তু এক মাস পরে সে ভাবলো যে জিনিটা তার প্রয়োজন নেই, তখন সে দোকানে গিয়ে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে এবং ১০০% টাকা সাথে সাথে ফেরত পেয়ে যাবে। বড় বড় দোকান তিন মাসের মধ্যেও ফেরত নেয়।

৫৬) **পিছে লোকে কিছু বলে ঃ** আমাদের চরিত্রের মধ্যে আছে যে "লোকে কী বলবে?" এই ভয়ে অনেক সময় কোন একটা ভাল কাজ করতেও আমরা লজ্জাবোধ করি। আবার ভাল কাজ কিন্তু ছোট কাজ তা করতেও লজ্জাবোধ করি যে, কেউ কিছু মনে করবে কিনা! কিন্তু এই দেশের লোকেরা যেকোন কাজ করতে কোন লজ্জাবোধ করে না সেটা বড় কাজ হোক আর ছোট কাজ হোক। অপ্রিয় সত্যি কথা বলতেও লজ্জাবোধ করে না।

৫৭) **রিটায়ারমেন্ট ও পেনশন ঃ** দেশের প্রতিটি নাগরিকের বয়স ৬৫ হলেই রিটায়ার করেন এবং অবসর ভাতা পান। এছাড়া বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত আরো ভাতা পান যাকে বলে Old age benefit। তবে কেউ চাইলে বয়স ৫৫ বছর বয়সে early retirement নিতে পারে, এতে পেনশন একটু কম পাবে। আমাদের দেশে যারা সরকারী চাকুরী করেন বা যারা পাবলিক লিমিটেড কম্পানীতে চাকুরী করেন তারাই শুধু রিটায়ার করেন। কিন্তু এখানে সকল ধরনের চাকুরী, ব্যবসা, বেকার, কৃষক,

সুইপার, দাড়োয়ান, গৃহিনী সবাই ৬৫ বয়সে রিটায়ার করেন। আবার কেউ চাকুরী না করলেও বয়স ৬৫ হলেই রিটায়ার করেন এবং ভাতা পান।

৫৮) **সিনিয়রদের সম্মান সবচেয়ে বেশী ঃ** যাদের বয়স ৬৫-র উপরে তাদেরকে এদেশে সিনিয়র বলে এবং সব-জায়গায় তাদেরকে খুবই সম্মান করা হয়। এবং সরকার সিনিয়রদেরকে সকল ধরণের ফ্যাসিলিটি দিয়ে থাকে। রাস্তা-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে সকল জায়গায় ছোট-বড় সবাই সিনিয়রদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ায়। যেমন, বাসে সবাই বসে আছে এবং সব সিট ফুল, পথিমধ্যে একজন বা দু'জন সিনিয়র বাসে উঠলো, দেখা যাবে তাদের সম্মানে কয়েকজন সিট ছেড়ে দিয়েছে।

৫৯) **মানসিক প্রতিবন্ধি ঃ** কেউ যদি মানসিক প্রতিবন্ধি হয় তাহলে তার জন্যও রয়েছে নানারকম সুযোগ-সুবিধা। মানসিক প্রতিবন্ধির পিতা-মাতা বা পরিবার প্রতিমাসে স্পেশাল ভাতা পেয়ে থাকে। তাদের জন্য রয়েছে স্পেশাল স্কুল, স্পেশাল গাড়ি, স্পেশাল ডাক্তার ও হসপিটাল।

৬০) **Longterm Disability ঃ** কেউ যদি অসুস্থতার জন্য কোন চাকুরী বা ব্যবসা করতে না পারেন তাহলে সে লংটার্ম ডিজাবিলিটি পেনশনে যেতে পারেন। এবং সারাজীবন বসে বসে ভাতা পাবেন, বাড়ি পাবেন, চিকিৎসা পাবেন এবং স্পেশাল ট্রান্সপোর্ট পাবেন।

৬১) **ছাত্র রাজনীতি ঃ** কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলোতে কোন রাজনীতি নেই। শিক্ষক-শিক্ষীকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা কোন প্রকার রাজনীতি করেন না। তারা পড়া-লিখা নিয়ে এতোই ব্যস্ত থাকেন যে এগুলো করার সময় কোথায়? এছাড়া কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যে কেউ নিয়মিত পড়া-লিখা না করলে এবং ক্লাশে উপস্থিত না হলে পরীক্ষায় কোনভাবেই পাশ করতে পারবে না। কেউ কোন অস্ত্র বহন করতে পারে না আর রাজনৈতিক দলগুলোও কাউকে কোন অস্ত্র সাপ্লাই দেয় না।

৬২) **কেউ প্রভাবশালীদের জোর খাটায় না ঃ** ওমুক মন্ত্রী বা আর্মি অফিসার বা পুলিশ অফিসার বা এম.পি বা জয়েন্ট সেক্রেট্যারী আমার আত্মীয় এই ধরণের কোন কালচার এখানে নেই। কারো আত্মীয় থাকলেও কেউ এই পরিচয় দেয় না বা বড়াই করে না এবং তার দ্বারা কোন প্রকার প্রভাবও খাটাতে পারে না।

৬৩) **কোন লোড শেডিং নেই ঃ** আমরা আমাদের জীবনে গত পনের বছরে একবার দেখেছি যে কারেন্ট বা ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল। এই ধরণের ঘটনা কি আমাদের বাংলাদেশে চিন্তাও করা যায়। যেদিন ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল সেদিন মনে হচ্ছিল যে একটা উৎসবে পরিণত হয়েছে। সবাই মোমবাতি কিনছে, পানি কিনছে, শুকনো খাবার কিনছে। সবার কাছেই একটা আশ্চর্যের বিষয়, বিশেষ করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে, তাদেরকে স্পেশালি বুঝতে দিতে হচ্ছে যে কী হয়েছে।

৬৪) **একটি কুকুরকেও কেউ কষ্ট দিতে পারে না ঃ** একদিন টেলিভিশনের খবরে দেখছি যে, কোন একটি পরিবার তাদের কুকুরটিকে গাড়ির মধ্যে রেখে গাড়ি মলের সামনে পার্ক করে ভেতরে গিয়েছে শপিং করতে। এটা ছিল গরম কালে। পথচারী কেউ দেখে পুলিশকে ফোন করে দিয়েছে যে গরমে কুকুরটি কষ্ট পাচ্ছে। সাথে সাথেই পুলিশ চলে এসেছে এবং কুকুরের মালিককে খুঁজছে। গাড়ির গ্লাস একটু ফাঁক করাও ছিল। পুলিশের লোকেরা ফিডারে করে ঐ কুকুরকে পানি খাওয়াচ্ছে। পরবর্তীতে কুকুরের মালিককে ফাইনসহ চরম মাশুল দিতে হয়েছে।

৬৫) **পথচারী পারাপার ঃ** সিগনাল ছাড়া সাধারণতঃ কেউ হুট করে যেখান-সেখান দিয়ে রাস্তা পারাপার হয় না। পথচারী পারাপারের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট সাদা সিগনাল।

৬৬) **পুলিশরা কারো প্রতি অবিচার করেন না ঃ** পুলিশ কাউকে হয়রানী করেন না। যদি কোন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে তাকে কোর্টে যেতে হয় এবং বিচারে তার উপযুক্ত শাস্তি হয়। পুলিশ ঘুষ ছাড়াই সকল কাজ করেন। পুলিশ জনগণের কল্যাণের জন্য যা যা প্রয়োজন তা সবই করেন, জনগণের সেবায় তারা নিয়োজিত। কোন পুলিশ অফিসার যদি কোন গাড়িকে থামায় তখন পুলিশ অফিসার তার গাড়ি থেকে নেমে পাবলিকের গাড়ির নিকটে যান এবং ড্রাইভারকে স্যার বলে সম্মোধন করেন এবং তারপর যা প্রশ্ন করার তা করেন।

৬৭) **শ্লীলতাহানি ঃ** কোন পুরুষের বিরুদ্ধে যদি কোন নারী অভিযোগ করেন আর তা যদি সত্যি হয় তাহলে তার লাইফ শেষ। এ দেশে এটা একটি কঠিন আইন। কোন নারীকে কোন প্রকার উত্যক্ত, শ্লীলতাহানি, কমেন্টপাশ, শীষ দেয়া, তার দিকে কুনজরে তাকানো, তার শরীরে ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট স্পর্শ করা, ইভটিজিং, এস.এম.এস, ইমেইল, ফেউসবুকে কমেন্ট ইত্যাদি

কোনভাবেই allow না। কেউ যদি করে তাহলে তাকে জেলের ভাত খেতে হবে দীর্ঘ দিন।

৬৮) **অনুমতি ছাড়া কেউ কারো ছবি তুলতে পারে না ঃ** অনুমতি ছাড়া কেউ কারো ছবি তুলতে পারে না, কারো কথা রেকর্ড করতে পারে না। যদি কেউ গোপনে এধরনের কাজ করে তাহলে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। অনুমতি ছাড়া কেউ কারো দেহ তল্লাশী এবং বাড়ি তল্লাশী করতে পারেন না। গোয়েন্দা বা সিকিউরিটি অফিসার তল্লাশীর নামে কাউকে হয়রানী করেন না।

৬৯) **নিজ সন্তানদের নিরাপত্তা ঃ** কোন বাবা-মা তার ১২ বছর বয়সের নিচের ছেলেমেয়েদেরকে একা খালি বাসায় রেখে বাইরে যেতে পারেন না। যদি কোন বাবা-মা এ কাজ করেন তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়। কারণ ছোট ছোট বাচ্চারা বাসায় যে কোন ধরণের দূর্ঘটনা ঘটাতে পারে। যদি বাচ্চা রেখে যেতেই হয় তাহলে সাথে বড় কাউকে রেখে যেতে হবে।

৭০) **চাইল্ড বেনিফিট ঃ** প্রতিটি বাচ্চাকে তার ১৮ বয়স পর্যন্ত সরকার প্রতি মাসে একটি ভাল অংকের ভাতা দিয়ে থাকে। বাচ্চার বয়স যতো কম সে ততো বেশী অংক পেয়ে থাকে। যে পরিবারের সন্তান বেশী তারা ভাল এমাউন্টের টাকা পেয়ে থাকেন। এই টাকা দিয়ে বাবা-মা সন্তানের সঠিক মতো পরিচর্যা করতে পারেন। এর বাইরেও প্রতিটি বাচ্চা জন্মের দিন থেকে ছয় বছর পর্যন্ত অতিরিক্ত ডলার পেয়ে থাকেন। কারণ New born সন্তানের অতিরিক্ত অনেক কিছু প্রয়োজন হয়, যেমন দুধ, ডায়াপার, পুষ্টিকর খাবার, কার সিট, স্ট্রলার, খেলনা, নানারকম পোশাক ইত্যাদি।

৭১) **ফুটপাতের অবস্থা ঃ** এখানকার ফুটপাতে দোকান পেতে বসে না, ম্যানহলের ঢাকনাও চুরি হয় না। পথচারী ঢাকনা বিহীন ম্যানহলে পরে হাত-পাও ভাঙ্গেন না। কেউ কলা খেয়ে কলার ছিলকাও ফুটপাতে ফেলেন না। অনেকে ফুটপাত ধরে হাটেন এবং বই পড়েন যা আমাদের দেশে চিন্তাও করা যায় না।

৭২) **রাস্তা-কাটাকাটি ঃ** বাংলাদেশ ওয়াসা একবার রাস্তা কাটেন, আবার সিটি কর্পোরেশন কাটেন, আবার গ্যাসের লাইনওয়ালারা কাটেন, আবার টিএন্ডটি কাটেন আর সেই কাটা গর্তে বর্ষায় পানি ভরে জনগণের দূর্ভোগ বেড়েই চলে। এই ধরণের ঘটনা ক্যানাডায় কল্পনাও করা যায় না।

৭৩) **মসজিদ ফ্যাসিলিটি ঃ** এখন প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই মুসলিমদের জন্য রয়েছে মসজিদ। এই মসজিদগুলো আমাদের দেশের মসজিদের মতো পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর তালা দিয়ে রাখা হয় না। এই মসজিদগুলোতে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সলাতই হয় না এছাড়া রয়েছে নানারকম কমিউনিটি সার্ভিসেস। একেকটা মসজিদ একেকটা কমিউনিটি সেন্টার। প্রতিটি মসজিদে রয়েছে মহিলাদের জন্য সলাতের খুব ভাল ব্যবস্থা।

৭৪) **মসজিদে জামাতে সলাত ঃ** পিতা-মাতারা সন্তানদের সাথে নিয়ে পুরো পরিবারসহ মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করেন। অনেক মহিলারাই ওয়াক্তের সলাত, জুমু'আর সলাত, তারাবীর সলাত এবং তাহাজ্জুদের সলাত মসজিদে গিয়ে আদায় করেন। জামাতে সলাতের সময় বড়রা শিশু-কিশোরদেরকে একই লাইনে তাদের সাথে দাঁড় করান, পিছনে ঠেলে দেন না। অনেক মসজিদ থেকেই তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ সলাত ভিডিও টেলিকাস্ট করা হয়ে থাকে কারণ যে সকল মা-বোনরা এবং বয়স্করা মসজিদে আসতে পারেননি তারা যেন বাসায় বসে তা উপভোগ করতে পারেন। সবচেয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, কোন কোন মসজিদে তারাবীর চেয়ে তাহাজ্জুদে মুসল্লি বেশী হয়।

৭৫) **শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ঃ** বাংলাদেশের তুলনায় এখানে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেকটা শিরক ও বিদ'আতমুক্ত। যেমন, এখানে মিলাদ হয় না, কুলখানি হয় না, চল্লিশা হয় না, শবেবরাত পালন হয় না, মিলাদুন্নবী পালন হয় না। কোন পীর-দরবেশ নেই, পীরের দরগা নেই, কোন মাজার নেই আর মাজারকে ঘিরে কোন শিরকও নেই। তাবীজের কোন ব্যবহার নেই, ভন্ড কবিরাজ নেই।

৭৬) **কমিশনার, এম.পি. ঃ** কমিশনার, এম.পি. কেউ জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেন না। তারা ব্যস্ত থাকেন যে কীভাবে জনগণের জন্য কাজ করা যায়, কীভাবে তাদের অসুবিধা দূর করা যায়। এখানে কোন দোকান, মল, ইন্ডাস্ট্রি, পার্ক ইত্যাদি উদ্বোধনের জন্য কোন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দিয়ে লাল ফিতা কাটানো হয় না।

৭৭) **ফরমালিন মুক্ত খাবার ঃ** এখানে মাছে, ফলে কেউ ফরমালিন দেয় না, ইউরিয়া সার দিয়ে মুড়ি ভাঁজে না, ক্যামিকাল স্প্রে করে ফলমূল পাকায় না, শাক-সব্জিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ দেয় না, মসল্লাতে ইটের গুড়া মেশায় না, চালের মধ্যে পাথর মিশায় না। প্রতিটি খাবারের গায়ে expire

date থাকে, ঐ ডেটের পরে আর কেউ সেটা বিক্রি করতে পারে না। ক্ষতিকারক জিনিষ বিক্রয় নিষিদ্ধ যেমন, জর্দা, খয়ার, চুন, সাদার পাতা ইত্যাদি।

৭৮) **সিগারেট ঃ** উনিশ বছরের নিচে কেউ সিগারেট কিনতে পারে না। যদি কোন দোকানদার উনিশ বছরের কম কারো নিকট সিগারেট বিক্রি করেন তাহলে সেই দোকানের লাইসেন্স সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেয়। কোন দোকানে উন্মুক্ত দেখিয়ে সিগারেট বিক্রয়ও করতে পারে না অর্থাৎ কোন প্রকার প্রচার যেন না হয়, প্রতিটি দোকানে সিগারেটের সেলফ কাভার দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। প্রতিটি সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক ছবি দেয়া থাকে যা সিগারেট পানে মানুষের হয়। এখানে বাড়ি-ঘর, এপার্টমেন্ট, দোকান, শপিংমল, বাস, ট্রেন ইত্যাদির ভিতরে কেউ সিগারেট খেতে পারে না, খেতে হলে কোন খোলা জায়গায় গিয়ে খেতে হয়।

৭৯) **রেস্টুরেন্টের অবস্থা ঃ** রেষ্টুরেন্টগুলোতে বাসি খাবার বিক্রয় হয় না, মরা মুরগি রান্না করে খাওয়ানো হয় না। নিয়মিত সরকারী ইন্সপেক্টর এসে কিচেন চেক করে থাকে। খাবার তৈরী করার সময় অবশ্যই হ্যান্ড গ্লোভস্ পরে নিতে হয়। রেষ্টুরেন্টে খাবার পরিবেশনের সময় মাথায় নেটের ক্যাপ পরে নিতে হয় যেন খাবারের মধ্যে কোন চুল না পরে। রেষ্টুরেন্টে কোন প্রকার ইদুর এবং তেলাপোকা থাকতে পারবে না। যদি পাওয়া যায় তাহলে রেষ্টুরেন্ট-এর লাইসেন্স বাদ হয়ে যাবে।

৮০) **মাস্তানদের দৌড়াত্ম ঃ** কোথাও কোন মাস্তান নেই, কেউ বাড়ি করতে গেলে মাস্তানদেরকে টাকা দিতে হয় না। কোন মাস্তান কোন মেয়েকে জোর করে বিয়ের প্রস্তাব দেয় না, বিয়ে করতে না পারলে কোন ক্ষতি করে না।

৮১) **গাড়ির হর্ন এবং কালো ধোয়া ঃ** সাধারণতঃ রাস্তায় কেউ গাড়ির হর্ন বাজায় না। বাংলাদেশের জন্য এটা একটা আশ্চর্য বিষয়। যদি কারো ভুলে স্টিয়ারিংয়ের হর্নে চাপ পরে হর্ন বেজে উঠে তাহলে সে অনুতপ্ত বোধ করে। কোন গাড়ি থেকে কালো বিষাক্ত ধোয়া বের হয় না। এখানকার বাতাসও বিষাক্ত নয়। কোন গাড়ি অন্য গাড়িকে অভারটেক করে না। ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যামে পরে রাস্তায় আটকে থাকতে হয় না।

৮২) **পানি জমে থাকা ঃ** বৃষ্টি হলে কোথাও পানি ওভারফ্লো হয় না, ময়লা, ড্রেনের পানি রাস্তায় চলে আসে না। কোথাও পানি জমে থাকে না।

৮৩) **মশা ফ্রী দেশ ঃ** এটা একটা আশ্চর্যের বিষয়, পুরো দেশটাই মশা ফ্রী, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় কারো মশারী টানানোর ঝামেলা নেই ।

৮৪) **ডাইরিয়া ঃ** কারো ফুড পয়জনিংয়ে ডাইরিয়া হয়েছে এমন দৃশ্য দুর্লভ, সাধারণতঃ লাখেও একটা ঘটে না ।

৮৫) **রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন ঃ** যে দল ভোটে নির্বাচিত হয় এবং যিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তাকে এবং তার দলকে বিরোধী দল অভিনন্দন জানায়। বিরোধী দল তাদের সকল ক্ষমতা নিয়ে সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়ায় । যারা ভোটে হেরে যায় তারা কখনো অভিযোগ করে না যে আমরাই জয়ী হতাম আসলে ভোটে কারচুপি হয়েছে! এই নির্বাচন মানি না!

৮৬) **পরহেজগারী ঃ** কেউ ভোটের আগে আর্টিফিসিয়াল পরহেজগার হন না, যেমন, মাথায় হিজার পরা, ভোটের আগে হাজ্জে যাওয়া, নিয়মিত মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করা, সবসময় টুপি ও পাঞ্জাবী-পায়জামা পড়ে থাকা, দান-খয়রাত করা, রমাদানে ঘনঘন ইফতার পার্টি দেয়া ইত্যাদি ।

৮৭) **পার্ক ঃ** জনগণের রিক্রিয়েশনের জন্য প্রত্যেক এলাকাতে রয়েছে একটি করে পার্ক। এই পার্কগুলো সবুজ গাছে শ্যামল ছায়ায় ভরপুর। পার্কে রয়েছে বসার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বেঞ্চ, ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন, পানি খাওয়ার জন্য ওয়াটার ফাউন্টেন, বাচ্চাদের খেলা-ধুলার জন্য দোলনা, স্লাইড ইত্যাদি। এছাড়া কোন কোন পার্কে রয়েছে বারবিকিউ করার জন্য ওভেন। এই পার্কগুলো যার যার বাড়ি থেকে হাঁটার দূরত্বে ।

৮৮) **ব্যবহার ঃ** কথায় কথায় একজন আরেকজনকে ধন্যবাদ দেয়। সামান্য উপকার পেলেই খুবই কৃতজ্ঞ হয় এবং অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। অল্পে তুষ্ট থাকে। সবসময় হাসি মুখে একে অপরের সাথে কথা বলে। অফিসের বসও তার নিম্ন কর্মচারী থেকে কিছু চাইলে অনুরোধ করে চেয়ে থাকেন। বড়রা সবসময় ছোটদের সম্মান করে থাকে। কেউ রং নাম্বারে ফোন করলে সরি বলেই রেখে দেন, অপরপক্ষ মিষ্টি গলা হলে গল্প করার চেষ্টা করেন না ।

৮৯) **হিংসা ঃ** পরিচিত একজন একটি সুন্দর বাড়ি কিনলো বা দশ তলা বিল্ডিং করলো বা কোন বন্ধু একটা ভাল গাড়ি কিনলো বা কোন আত্মীয়ের ভাল চাকুরী হলো এতে কেউ কোন মনে কষ্ট পায় না বা হিংসাবোধ করে না ।

৯০) **ইয়াতিম স্পন্‌সর্‌শিপ ঃ** আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ইয়াতিমদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং যারা করবে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা মুসলিমরা প্রতি বছর কতজন ইয়াতিমকে স্পনসর করে থাকি? পৃথিবীর গরীব দেশগুলোতে যতো ইয়াতিমখানা আছে তাদের বেশীরভাগই আমেরিকা-ক্যানাডার-ইউরোপের মতো উন্নত দেশের অমুসলিমরা স্পনসর করে থাকে। আমাদের দেশেও এরকম অনেক এন.জিও রয়েছে।

৯১) **নামের বিকৃতি করা ঃ** কেউ কারো নামের বিকৃতি করে না। যেমন আমাদের দেশে জলিলকে বিকৃত করে ডাকা হয় 'এই জইল্ল্যা বা কুদ্দসকে এই কুদ্দুইস্‌সা'। আমরা জানি নামের বিকৃতি করা কুরআনে নিষেধ।

৯২) **বাক স্বাধীনতা ঃ** এটিও একটি আশ্চর্যের বিষয়। যে কেউ চাইলেই সরকার সম্পর্কে সত্য কথা বলতে পারেন। পত্রিকায় তুলে ধরতে পারেন। পত্রিকাওয়ালাদের লিখার স্বাধীনতা আছে। টিভি চ্যনেলগুলোর স্বাধীনতা আছে সত্য প্রচার করার।

৯৩) **ফার্মাসী এবং ডাক্তার ঃ** পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তিরই একজন করে ফ্যামিলি ডাক্তার রয়েছে। কারো কোন প্রয়োজন হলেই সে যে কোন সময় তার ফ্যামিলি ডাক্তারের কাছে চলে যায়। ডাক্তার তাকে দেখে যতো পরীক্ষা করেন তার রিপোর্ট এবং যা যা ঔষুধ-পত্রের প্রেসক্রিপশন দেন তার সমস্ত রেকর্ড রোগীর কাছে থাকে না, থাকে ডাক্তারের ফাইলে। যে কোন রোগীর ৫০ বছর আগের সমস্ত হিস্ট্রি যেমন, ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি সবই তার ফ্যামিলি ডাক্তারের অফিসে পাওয়া যাবে। রোগীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার ফ্যামিলি ডাক্তারের। রোগীকে যদি কোন স্পেশ্যালিস্টের নিকট পাঠাতে হয় তাহলেও তা ফ্যামিলি ডাক্তার পাঠাবেন। প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন রোগী ফার্মাসী থেকে কোন ঔষুধ কিনতে পারেন না।

৯৪) **Toys Lending Centre ঃ** বাচ্চারা অনেক সময় বাসায় তার নিজস্ব খেলনা দিয়ে সবসময় খেলতে খেলতে বড়িং হয়ে যায়। তখন সে এই সেন্টার থেকে অন্যান্য রকমের নানা খেলনা লাইব্রেরীর বইয়ের মতো নিয়ে আসতে পারে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর আবার ফেরত দিয়ে নতুন নতুন আরো খেলনা আনতে পারে। আবার যে সকল বাচ্চারা দামী খেলনা কিনতে পারে না তারাও এখান থেকে খেলনা এনে খেলতে পারে।

REFERENCES

- তাফসীরে ইবনে কাসীর - ইবনে কাসীর
- ইসলামে হালাল হারামের বিধান - ডঃ ইউসু আল কারজাভী
- সফল প্রবাস জীবন - মোঃ সারওয়ার কবির শামীম
- সলাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে - ডাঃ মতিয়ার রহমান
- পরিবার ও পারিবারিক জীবন - মাঃ আব্দুর রহীম
- ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা - আধুনিক প্রকাশনি
- আল্লাহর হক ও বান্দার হক - খন্দকার আবুল খায়ের
- দ্বীন ইসলামের সঠিক পথ - হাফেজ জাহিদ হোছাইন
- সংগ্রহ, সংকলন ও লেখনী - হায়াতুন্নবী চৌধুরী
- ইসলামি জিন্দেগীর মৌলিক উপাদান - মোঃ সারওয়ার কবির শামীম
- এই দেশ - শমসের আলী হেলাল
- মাওয়ায়েযে আশরাফিয়া - ১ম খন্ড
- হাদীস শরীফ ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড - মাঃ আব্দুর রহীম
- আদর্শ পরিবার গঠনে ইসলাম - জাবেদ মুহাম্মাদ
- সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা - জাবেদ মুহাম্মাদ
- আল্লাহর হক মানুষের হক - জাবেদ মুহাম্মাদ
- অর্থবহ জীবনের সন্ধানে - সাইদুল হোসেন
- আদর্শ মুসলিম নারী - আবদুল হামীদ ফাইযী
- স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য - হাফেয হোসাইন বিন সোহরাব
- ইসলামের জীবন পদ্ধতি - সৈয়েদ আবুল আলা
- সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম
- যাকাত, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব - সারওয়ার কবীর শামীম
- কুর'আন ও সুন্নাহ্য় সুদ নিষিদ্ধকরণ - ইমরান নযর হোসেন
- ইসলামী ব্যাংকিং - ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী
- ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ - এম. উমর চাপরা
- ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ - আবুল আলা
- সুদমুক্ত অর্থনীতি - মা. আব্দুর রহীম
- ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা - ফজলুর রহমান
- ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং - ইকবাল কবীর মোহন
- ইসলাম ও অর্থনীতি - আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহ.)
- ইসলামের অর্থনীতি - মা. আব্দুর রহীম
- ইসলামী ব্যাংকিং - এ. এ. এম হাবীবুর রহমান
- Tahira Khalid MSW- The Message International USA- 2008
- aj-jawaab as-saheeh (vol.4 pg. 306-307) - shaykhul islam ibn taymiyyah (d-728ah/1328ce)
- Real deal – Dr. Tawfique Chowdhury
- www.islamonline.net/livefatwa/english
- Fiqh of Love - Shaykh Waleed Basyouni (Al Maghrib Institute)

হাজ্জ জীবনে একবার ফরয।

আসুন আল্লাহর রসূল ﷺ যেভাবে হাজ্জ করেছেন
ঠিক সেভাবে আমরাও সহীহভাবে হাজ্জ পালন করি।

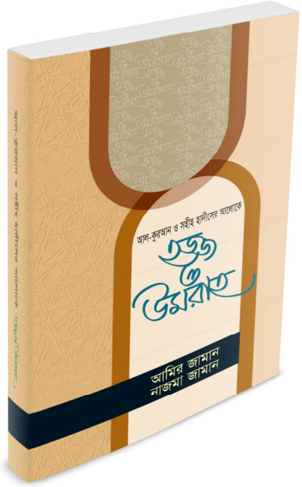

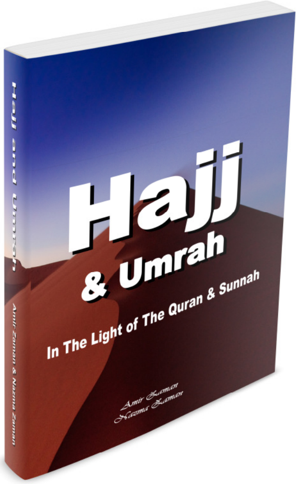

হাই স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক গাইডলাইন

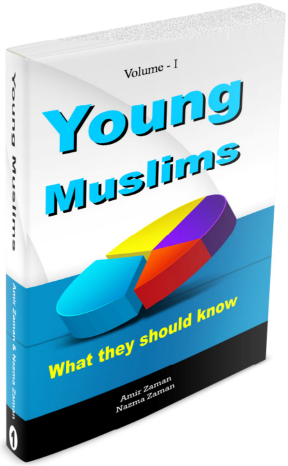

Children Education Series (English)
Book 1 to 12